হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ঃ
ইতিহাস ও সাহিত্য বিচার

শ্রী উদয়শংকর বর্মা

উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

২০০৬

Ref
80·95
উদয়/মাতৃ

189629

26 FEB 2007

STOCK TAKING - 2011

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
	ক. ভূমিকা	ক-খ
প্রথম পর্ব ঃ	(ইতিহাস পর্ব)	
	১. প্রথম অধ্যায়	
	সাহিত্যে আন্দোলন অভিধাটির তাৎপর্য নির্ণয়	১-৭
	২. দ্বিতীয় অধ্যায়	
	বাংলা ভাষায় সাহিত্য আন্দোলনের পূর্বসূত্র	৮-২৪
	৩. তৃতীয় অধ্যায়	
	হাংরি জেনারেশন অভিধাটির উৎপত্তি, আন্দোলনের প্রস্তুতি ও তত্ত্ব নির্মাণ পর্ব	২৫-৬৮
	৪. চতুর্থ অধ্যায়	
	আন্দোলনের বিস্তার পর্ব	৬৯-৭৭
	৫. পঞ্চম অধ্যায়	
	আন্দোলনের পরিণতি পর্ব	৭৮-৮৬
	৬. ষষ্ঠ অধ্যায়	
	আন্দোলনের উত্তর প্রভাব	৮৭-৯১
দ্বিতীয় পর্ব ঃ	(সাহিত্য বিচার পর্ব)	
	১. প্রথম অধ্যায়	
	কবি ও কবিতা	৯২-১৪৩
	(ক) মলয় রায় চৌধুরী	৯২
	(খ) শৈলেশ্বর ঘোষ	১০৩
	(গ) প্রদীপ চৌধুরী	১১৮
	(ঘ) ফাল্গুনী রায়	১২৫
	(ঙ) সুবো আচার্য	১৩২
	(চ) দেবী রায়	১৩৭
	(ছ) সমীর রায়চৌধুরী	১৩৮
	(জ) উৎপল কুমার বসু	১৩৮
	(ঝ) সুবিমল বসাক	১৩৯
	(ঞ) ত্রিদিব মিত্র	১৩৯
	(ট) রবিউল হুসাইন	১৪০

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

কথা সাহিত্য ১৪৪-১৮৩

(ক) বাসুদেব দাশগুপ্ত ১৪৪

(খ) সুভাষ ঘোষ ১৫৮

(গ) সুবিমল বসাক ১৬৮

৩. তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যকৃতি ১৮৪-২২৫

(ক) মলয় রায় চৌধুরী ১৮৪

(খ) ফাল্গুনী রায় ২০০

৪. চতুর্থ অধ্যায়

সার্বিক মূল্যায়ন ও উত্তরকালের উপর প্রভাব ২২৬-২৪৯

উপসংহার ২৫০-২৫৮

পরিশিষ্ট ২৫৯-২৬৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৬৯-২৮১

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল হাংরি জেনারেশন আন্দোলন। বিশ শতকের ছয়ের দশকের একেবারে গোড়ায় এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বাংলা কবিতার আধুনিক ঘরানার মধ্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকরীরা প্রথম আবির্ভাবে নৈরাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। প্রধানত রাষ্ট্র, সমাজ, প্রেম, যৌনতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে এঁদের ক্রোধ, ক্ষোভ ও আক্রমণ প্রকাশ পেয়েছিল। শব্দ ব্যবহারে এঁরা যেমন নিষিদ্ধ, অপশব্দ গুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই যৌন প্রসঙ্গকে অত্যন্ত রুক্ষভাবে প্রচুর পরিমাণে তাঁদের লেখায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে এই আন্দোলনের কয়েকজন পুরোধা কবিকে, যেমন - মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী সমীর রায় চৌধুরী প্রমুখকে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অশ্লীল রচনা'র অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ফলে সারা দেশে, এমনকি বিদেশেও এই আন্দোলন নিয়ে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। পুলিশী অভিযান অবশ্য হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারে নি। যদিও আন্দোলনটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তবুও বিশ শতকের আট দশকের শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ফসল ফলে চলেছে। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন প্রধানত কবিতার আন্দোলন হলেও কথাসাহিত্য, বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তার আবেদন উপেক্ষণীয় নয়। এ ছাড়া কিছু নাটক ও প্রবন্ধও এঁরা রচনা করেছেন। দুঃখের বিষয়, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পর চারটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এই সাহিত্য আন্দোলন নিয়ে যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। শুধু নৈরাজ্যবাদী ও অশ্লীল বলে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠিত অনেক কবি সাহিত্যিকদের চেয়েও এঁদের সাহিত্য নিষ্ঠা, ব্যক্তিপ্রতিভা বা শিল্পদক্ষতা কোনো অংশে ন্যূন নয়। উপরন্তু আদর্শগত কারণেও এঁদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। যেহেতু একমাত্র হাংরি আন্দেলনকারীরাই সাহিত্যকে জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠান নির্ভরতা থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। সব সাহিত্য আন্দোলনই সাধারণভাবে একদিন প্রতিষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করে; হাংরি জেনারেশন সচেতনভাবেই তা করেনি। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশনের কিছু অবদান আছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। সেই জন্যই এই আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন বোধ করেছি। এই গবেষণা কর্মে দুটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। এক, ইতিহাস; দুই সাহিত্যবিচার। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন বিভক্ত হয়ে যাবার ফলে এর ইতিহাসও কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে। দুটি শিবিরের দুটি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একটি শিবিরের নেতা মলয় রায় চৌধুরী লিখেছেন, 'হাংরি কিংবদন্তী', অন্য শিবিরের নেতা শৈলেশ্বর লিখেছেন, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'। দুটি গ্রন্থই স্বাভাবিকভাবে একদেশদর্শী। আমরা নিরপেক্ষ বিচার করার

জানাই।

চেষ্টা করেছি। সাহিত্য বিচার করার ক্ষেত্রেও আমরা কোনো রকম সংকীর্ণ দৃষ্টি বা বোধ দ্বারা প্রভাবিত হইনি। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন তৈরী হবার কারণ যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনই এঁদের সাহিত্যের শিল্প গুণ ও আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতটিও পর্যালোচিত হয়েছে। এখানে যেমন তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে, তার বিচারও করা হয়েছে। আন্দোলনকারী লেখকদের বক্তব্য ও দাবির যুক্তিবত্তা নির্ণয় করা হয়েছে। সমকালীন দেশি বিদেশি সাহিত্যের আন্দোলন ও প্রকৃতির সঙ্গেও এঁদের তুলনা করে দেখা হয়েছে।

একদিক থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের চারিত্র্যে আণ্ডার গ্রাউন্ডের চরিত্র আছে। হয়তো সেই কারণে এবং জনপ্রিয় সাহিত্য না হবার জন্যে হাংরি কবি লেখকদের রচনা এখন দুর্লভ বললেও কম বলা হয়। এ জন্য এঁদের রচনাপত্র নানাভাবে সংগ্রহ করেছি। কিছু কিছু সংগ্রহ করে দিয়েছেন কবি শৈলেশ্বর ঘোষ, মলয় রায় চৌধুরী বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবিমল বসাক, অরুণেশ ঘোষ। আবার কিছু পেয়েছি কোচবিহার জেলার বাণেশ্বরের 'সুরেশ স্মৃতি পাঠাগার' নামে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে। কলেজ ষ্ট্রীটের পুরনো বইয়ের দোকান থেকেও কিছু নথি সংগ্রহ করা গেছে। শিলিগুড়ি থেকে কিছু পত্রিকা দিয়েছেন শ্রী অমল কান্তি রায়। এছাড়া 'কবিতীর্থ' পত্রিকার সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি অবাধে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। অন্যান্য গ্রন্থগুলি আমি কোচবিহার এ. বি. এন শীল কলেজ লাইব্রেরি এবং চন্দননগর সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার থেকে নিয়েছি। বিধাননগর সরকারি কলেজ থেকে ড. বিমল কুমার সাহা কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দিল্লি থেকে কিছু বই আনিয়ে দিয়েছিলেন ড. রূপকুমার বর্মন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

আমি এই গবেষণা - কর্মটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ, প্রফেসর ড. অঙ্কুশ কুমার ভট্টের অধীনে শুরু করি। গবেষণার প্রথম স্তর থেকেই তাঁর উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি। তাঁর অবিরত উৎসাহ, স্নেহ ও প্রশ্রয় আমার জীবনের পাথেয় হয়ে রইল। তাঁকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমার গবেষণা পরিচালক মাষ্টার মশাইয়ের নির্দেশে হাংরি কবিতা ও সাহিত্যের কিছু কিছু তথ্য জানবার জন্য এবং তত্ত্বের জটিলতা নিরসনের জন্য অনেক সময় শৈলেশ্বর ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্তের কাছে গিয়েছি। শৈলেশ্বর ও বাসুদেব দিনের পর দিন আমাকে সময় দিয়েছেন। আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। যাই হোক, এঁদেরও আমি শ্রদ্ধা জানাই।

উদয় শংকর বর্মা

প্রথম পর্ব ঃ

(ইতিহাস পর্ব)

।। প্রথম পর্ব ।।

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যে 'আন্দোলন' অভিধাটির তাৎপর্য নির্ণয়

পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের ইতিহাস ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 'আন্দোলন' অভিধাটিকে অনবরত নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে 'আন্দোলন' শব্দটি খুবই ব্যাপক। রাষ্ট্র ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই, শিল্প সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। 'আন্দোলন' শব্দটি এখন বিপ্লব, বিক্ষোভ, সংগ্রাম, রীতি, ধারা ইত্যাদি নানা শব্দের সঙ্গে একাত্ম ও একার্থক হয়ে গেছে। মুখ্যতঃ ইংরেজীর 'movement' শব্দের অনুসরণে আন্দোলন কথাটির প্রয়োগ হচ্ছে। movement, কথাটির যে অর্থ এখানে মুখ্য, তার মূল কথা কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটানোর জন্য জনজাগরণ বা তার সমবেত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ প্রতিবাদ ও পরিবর্তন দুই-ই আন্দোলনের শর্ত। এই প্রতিবাদ বহু লোকের সম্মিলিত ক্রিয়া। সমষ্টিগত জিগির। সেক্ষেত্রে অস্থিরতা, বা উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সঙ্গে যুক্ত থাকে প্রেরণা। প্রেরণার দুটি দিক ঃ স্বতস্ফূর্ততা এবং স্বতস্ফূর্ততার সংঘটন। অনেক সময় যুগমানসের মধ্যে প্রতিবাদের বীজ থেকে যায়। তাকে সংগঠিত রূপ দিতে হয় কোনো সংগঠককে। সংগঠকই নতুন ভাবনা নিয়ে যুগমানসকে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। এভাবে আন্দোলন ব্যাপারটি ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ঐতিহাসিক কালের প্রক্রিয়াকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। শুধু রাজনীতির দিক থেকে নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি আধ্যাত্মিক দিক থেকেও তা ঘটতে পারে। আসলে, কোনো একটি ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে চলতে মানুষের কাছে উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষের মনে হয় যে, উক্ত ব্যবস্থা আর উপযুক্ত নয়, তাকে পাল্টানো প্রয়োজন। তবে প্রচলিত ব্যবস্থার পক্ষেও বহু লোক থেকে যায়। যেহেতু সব ব্যবস্থাই একটা প্রতিষ্ঠান, তাই যে কোনো ব্যবস্থার পক্ষেই লোকবলের অভাব হয় না। প্রতিষ্ঠান সর্বদাই একটা শক্তি। স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তনশীল ও স্থিতাবস্থার সমর্থকদের মধ্যে একটা সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংঘাতের শুরু থেকে পরিণতি পর্যন্ত অবস্থাটাকেই আন্দোলনের চেহারায় দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার যে কোনো অংশকেই আন্দোলন বলা যায়। পরিবর্তনকামীরা প্রথমে করেন প্রতিবাদ। প্রতিবাদের এই স্তরে থাকতে পারে যুক্তি ও তত্ত্ব; থাকতে পারে শুধুই হৈ চৈ, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। যাই থাকুক, এটি হচ্ছে প্রচারধর্মিতার স্তর। দ্বিতীয় স্তরে পাই, আলোচনার স্তর। সাহিত্য শিল্পের ব্যাপার হলে, সৃষ্টিকর্মের নমুনা পেশ হতে থাকে। তৃতীয় স্তরে ক্ষমতা দখল। সৃজনক্রিয়ার ব্যাপার হলে, পুরনো ধারাকে সরিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। রসগ্রহীতাদের স্বীকৃতি অর্জনের প্রয়াস। সুতরাং যে কোনো আন্দোলনই

একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া বিশেষ। তা দ্বন্দ্ব, রূপান্তর ও সৃজনশীলতার এক সামগ্রিক নির্মাণ। লক্ষ করবার যে, একটি বিশেষ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা পেল, তারও ভবিতব্য পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিকতার মতই; যেহেতু আবার নতুন কোনো আন্দোলনের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা তাকেও একদিন অপ্রাসঙ্গিক করে দেবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের আন্দোলনের কিছু গুণগত ও মাত্রাগত প্রভেদ রয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধারার মধ্যে রক্তক্ষয়ী ব্যাপার ঘটতে পারে, নন্দনক্ষেত্রের আন্দোলনে তা অকল্পনীয়। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলন আর এখন বিশুদ্ধ তত্ত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত হচ্ছে না। সেদিন অবলুপ্ত। যে কোনো দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে এখন একাধিক বিদেশী রাষ্ট্রের সরাসরি অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থন নির্ভরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও একটা দায়সারা ভাব। ভারতের মতো দেশে অনেকগুলো ভিন্ন মতাদর্শী রাজনৈতিক দল একটি যুক্ত ফোরামের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে আন্দোলন ব্যাপারটি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বস্তুত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আজ প্রতিষ্ঠান এমন সর্বগ্রাসী ও সূক্ষ্ম যে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা তিরোহিত। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে একটা ব্যবস্থা পাল্টে গেলে পুরানো কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেমন, রাশিয়ায়। পূর্বে ছিল জারের আমল, তারপরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় পুরানো সামাজিক কাঠামোই সেখানে পাল্টে গেছে। সাহিত্য আন্দোলনের উপর এই সব রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব থেকে যায়; কিন্তু দুইয়ের প্রকৃতি আলাদা। একমাত্র সাহিত্য বা শিল্পের আন্দোলনের ধারাগুলির মধ্যেই পূর্ববর্তী ধারণাগুলির কিছু কিছু পরবর্তী যুগের আন্দোলনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে যায়। একমাত্র সাহিত্য শিল্পের আন্দোলনই দ্রুত আন্তর্জাতিক আন্দোলনের চেহারা লাভ করতে পারে। তাই সাহিত্যের আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বের নানাদেশ ও নানাযুগের রচনাকর্মের একটি বিশেষ ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে।

সেদিক থেকে, নানা দেশের, নানা যুগের সাহিত্য আন্দোলনগুলিকে নিয়ে আলোচনা করলে 'সাহিত্য আন্দোলনের' সীমারেখা ও গুরুত্বটিকে বোঝা যায়। কিন্তু পৃথিবীতে নানা দেশে এত ধরনের সাহিত্য আন্দোলন হয়েছে যে, তার সবগুলির আলোচনা সম্ভব নয়। আলোচনার পরিসর ও প্রাসঙ্গিকতা স্মরণে রেখে তাই এখানে প্রধান প্রধান ক'টি ধারাকে নির্বাচিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে, আন্দোলনগুলির বৈভিন্ন্য কোথাও বিষয়ের, কোথাও মতাদর্শের, কোথাও বা রূপকল্পের। যদিও সমস্ত, আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সাহিত্যকে

এগিয়ে নিয়ে গেছে। ঐশ্বর্যশালী করেছে। কখনও কবি-লেখকেরা নিজেরাই তাঁদের অভিনব সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে আন্দোলন নামে অভিহিত করেছেন; কখনও বা সমালোচকেরা, ঐতিহাসিকেরা নব্যরীতির সাহিত্য চর্চাকে আন্দোলন নামে স্বীকার করেছেন। সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে 'আন্দোলন' অভিধাটি কে প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন জানা যায়নি। এও বলা সম্ভব নয় যে, প্রকৃতই প্রথম সাহিত্য আন্দোলন কোনটি ?

প্রাথমিকভাবে একথা বলা যায় যে, পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-সাহিত্যকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল অবশ্যই রেনেশাঁসের অভিঘাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনষ্টানটিনোপলের পতনের পর ইতালিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও মনীষার যে মহা অভ্যুত্থান ঘটেছিল — তার প্রভাব প্রায় সমগ্র বিশ্বে পড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের অবসানে মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তের নবীন আলো জেগে উঠেছিল। এর আগে, প্রাচীন ভারতে, গ্রীসে অনেকগুলি উন্নতমানের সাহিত্যকীর্তি লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালের বিশ্বসাহিত্যে এগুলির গভীর প্রভাব কার্যকর হয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বের ঐ সমস্ত সাহিত্যের, প্রকাশভঙ্গীই পরে ধ্রুপদীরীতির সাহিত্য বলে পরিগণিত হয়েছে। ক্লাসিসিজম' - এর তত্ত্বটি ধীরে ধীরে সাহিত্য আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। ক্লাসিসিজম, রেনেশাঁস এগুলিকে সাহিত্য আন্দোলন না বলা গেলেও, সাহিত্যের রূপান্তর ও পরিণতির দিক থেকে সাহিত্য আন্দোলনের সমানধর্মা বলেই মনে হয়। লক্ষণীয়, ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের প্রসার সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে লক্ষ করা গেছে। যদিও তাকে 'ক্লাসিক' বলা হয় নি। বলা হয়েছে, নিও ক্লাসিক। তাও উনিশ শতকে গিয়ে। Hugh Honour অবশ্য 'নিও ক্লাসিসিজম'কে বলেছেন, true style ; তাকে আন্দোলন বলেন নি।[১]

তবে নিও ক্লাসিসিজমের পর যখন তাত্ত্বিকভাবে রোম্যান্টিসিজমের আবির্ভাব ঘটল তখন 'আন্দোলন' অভিধাটি সাহিত্য প্রসঙ্গে যেন স্পষ্টতা লাভ করল। রোম্যান্টিসিজম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে যে ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল ও প্রভাবিত করেছিল তাতে এটিকে আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করতে আর কোনো অসুবিধে রইল না। সাধারণভাবে ১৭৯৮ সালকেই এই আন্দোলনের সূচনা হিসাবে ধরা হয়। তবে আঠারো শতকের জীবনাদর্শ, আঙ্গিকবিন্যাস, পরিমিতিবোধ, যুক্তি ও শৃঙ্খলানুগত শিল্প সাহিত্যের বিরুদ্ধে কবিতায় টমসন, গ্রে, বার্নস, ব্লেক; উপন্যাসে ওয়ালপোল, র‍্যাডক্লিফ, লিউস তাঁদের প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন। রোম্যান্সের আভাস তাঁদের রচনাতেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। আঠারো শতকেই সত্তরের দশকে জার্মানীতে হার্ডার, শিলার ও গ্যাটের নেতৃত্বে যে storm and stress আন্দোলন হয়েছিল তাতে রোম্যান্টিক আন্দোলনের ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল। এছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ও মধ্যযুগের রোম্যান্সের প্রভাবও

রোম্যান্টিক আন্দোলনের উপর ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, বায়রণ ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আবাহন মন্ত্র দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগের রোম্যান্স কোলরিজের 'Kubla Khan', কীটসের 'The Eve of St. Agnes', স্কটের উপন্যাসবলীতে স্পষ্টতই অনুভব করা যায়। যাই হোক, রোম্যান্টিক আন্দোলন ইংল্যান্ডে শুধু জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করেনি, ইংরেজী সাহিত্যকেই একটা নবজীবন দান করেছে। বাংলাভাষায় রোম্যান্টিকতা আন্দোলন হিসেবে গড়ে না উঠলেও - রবীন্দ্রনাথ একাই তাঁর সহস্রদ্যুতি রোম্যান্টিক কল্পনায় একটি যুগান্তর আনয়ন করেছেন।

সাহিত্য-তাত্ত্বিকেরা রোম্যান্টিক আন্দোলনকে ক্লাসিক ঐতিহ্যের বিপরীত রূপে চিহ্নিত করেছেন। একই ভঙ্গীতে বাস্তববাদী আন্দোলনকে রোম্যান্টিক আন্দোলনের বিপ্রতীপ রূপে লক্ষ্য করেছেন। ব্যাসদেবের মহাভারত বা চৌদ্দ শতকের চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেলস্' নয়; বালজাকের 'La comedie Humaine' (১৮৩০), ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' (১৮৫৭), জর্জ ইলিয়টের 'মিডলমার্চ' (১৮৭১-৭২) ইত্যাদিকেই বাস্তববাদী আন্দোলনের সূচনাফসল হিসেবে ধরা হয়। ১৮৫৭ সালে champflenry র 'Le Realism' প্রকাশ পেলে এই আন্দোলন তাত্ত্বিক ভূমিটি লাভ করে। আবার ১৯৪০ এবং ১৯৫০'র দিকে ইতালির উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে 'নিও রিয়ালিষ্ট' নামে আরেকটি সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল।

বাস্তববাদী আন্দোলনের পরিণতি লাভ ঘটে 'ন্যাচারালিজম' ও 'সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজমে।' প্রথমটিতে বলা হয় যে, মানুষ প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির বাইরে তার কোনো অধ্যাত্ম সত্তা নেই। মানুষ নামক উন্নত জীবটির চরিত্র ও ভাগ্য বংশগতি ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এডমন্ড ও জুলে গঁকুর, জোলা,মোঁপাসা, ষ্ট্রিন্ডবার্গ - এই ধারার বিখ্যাত লেখক। বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লখনীয়। 'সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজমের' আদর্শ হল সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দান। মার্কসীয় দর্শনকে এই সাহিত্যাদর্শ আত্মস্থ করতে চায়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার ম্যাকসিম গর্কি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সাহিত্য ও শিল্পের সব ক্ষেত্রে এক সময় এই আন্দোলন সারা বিশ্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাবে গড়ে উঠেছিল প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন। 'সোস্যালিষ্ট রিয়ালিজম' বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আন্দোলনটি 'কলাকৈবল্যবাদে'র বিরোধিতা করেছিল। ১৮৩৫ সালে গঁতিয়ে শিল্পের উপযোগিতাবিহীনতার কথা বলেছিলেন। সেই থেকে কলাকৈবল্যবাদের শুরু। এই 'কলাকৈবল্যবাদ' থেকেই অবক্ষয়বাদে'র জন্ম যার ফসল বোদলেয়ার এবং র‍্যাঁবো। উনিশ শতকের অবক্ষয়বাদী আন্দোলন বিশ শতকের ইংল্যান্ডে অ্যাংরি ইয়ংম্যান মুভমেন্ট' এবং আমেরিকায় 'বিট জেনারেশন মুভমেন্টে রূপ পায়। আমাদের আলোচ্য হাংরি জেনারেশন আন্দোলনেও যাদের কিছু প্রভাব রয়েছে।

স্মর্তব্য যে, বোদলেয়ার শুধু অবক্ষয়বাদী আন্দোলনের সূচনা করেন নি, কবিতায় তিনিই প্রথম প্রতীকবাদের ইশারা দিয়েছিলেন। ২. জ মরেস অবক্ষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে নিজের মত মিশিয়ে যে প্রতীকবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন তাতে ভের্লেন, মালার্মে, র‍্যাঁবো, লাফার্গ থেকে ভালেরি, রিলকে, ইয়েটস, মেটারলিঙ্ক এলিয়ট এমনকি রবীন্দ্রনাথও বহু অবদান রেখেছেন। একালে বাংলাভাষায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও প্রতীকবাদী আন্দোলনের ঋণ গ্রহণ করেছেন।

রিয়ালিষ্ট ও ন্যাচারালিষ্ট আন্দোলনের প্রকরণে অনীহা এবং প্রতীকবাদী প্রবণতার বহিরাবরণকে অস্বীকার করে একশপ্রেশনিষ্ট আন্দোলনের প্রকাশ। বের্গসঁ এবং ফ্রয়েড এ আন্দোলনের দার্শনিক প্রেক্ষিকাটির জনক। ১৯১০ থেকে ১৯২৫'র বছরগুলিতে জার্মান ছাড়াও ইউরোপের নানা স্থানে এ আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল। গেয়র্গ, ব্রেশট, কাফকা, এলিয়ট এই ধারার উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জাঁ পল সার্ত্রে অস্তিত্ববাদী দর্শন ও আন্দোলনকে সারা বিশ্বে তীব্রতা দান করেন। যদিও কিয়ের্কগার্দের 'Either' গ্রন্থে ১৮৪৩ সালেই এর সূচনা হয়েছিল। সার্ত্রের উপন্যাস, নাটক ছাড়াও, দস্তেয়ভস্কি, কাম্যু, কাফকা, বেকেট ও হ্যেল্ডরলিন রচনাবলীতে এই দর্শনের প্রভাব রয়েছে। বাংলাভাষায় জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য ও কবিতায় প্রথম সার্থকভাবে অস্তিত্ববাদের রূপায়ণ চোখে পড়ে।

অ্যাবসার্ড আন্দোলনটিকে একদিক থেকে অস্তিত্ববাদী আন্দোলনেরই শাখা বলা যায়। অস্তিত্ববাদের আত্মানুসন্ধানের ব্যাপারটি এখানে নেই, আছে অস্তিত্বের নিরর্থকতার বোধ। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বিখ্যাত ফসল স্যামুয়েল বেকেটের "ওয়েটিং ফর গোডো।" এছাড়াও হ্যারণ্ড পিন্টার, জাঁ জেনে, আয়েনেস্কো প্রভৃতি নাট্যকারেরা বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় এই ধারায় বাদল সরকার অগ্রগণ্য। তাছাড়া বার্ণিক রায়েরও কিছু নাটক আছে।

ইমেজিষ্ট আন্দোলনও একটি আধুনিকবাদী আন্দোলন। একদিক থেকে তা ফরাসী প্রতীকবাদী আন্দোলনেরই সম্প্রসারণ। ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত এই আন্দোলনের মুখ্য বিস্তার। T. E. Hulme এ আন্দোলনের পুরোধা। পাউন্ড ও এলিয়ট অনেকদিন পর্যন্ত এই আন্দোলনে ছিলেন। (পরে পাউন্ড vorticism আন্দোলনে যোগ দেন।) বাংলা কবিতার ত্রিশের দশক এই আন্দোলন থেকে গভীর প্রেরণা পেয়েছিল।

ইমপ্রেশনিষ্ট আন্দোলন একদিক থেকে, একসপ্রেশনিষ্ট আন্দোলনের বিপরীত, প্রথমটি 'বস্তুজগতের রূপ, দ্বিতীয়টি 'বস্তুজগতের উপর শিল্পীর মানসিক চিন্তাভাবনার রূপ। অন্যদিকে এই আন্দোলন ইমেজিষ্ট আন্দোলনেরও উল্টো। ইমেজিষ্টরা চিত্রকল্প নির্মাণকে গুরুত্ব দেন। ইমপ্রেশনিষ্টরা গুরুত্ব দেন প্রকৃতির যথাথথ প্রতিভাসকে। সুতরাং পরিহার করেন প্রতীকী তির্যকতা। ইয়েটস, এলিয়টের কবিতায় এ আন্দোলনের ছাপ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ ও বিনয় মজুমদারের কবিতায় এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়।

সানাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় ডাডা আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতা রুমাণীয় কবি ত্রিস্তান জারা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জার্মান কবি হুগো বল, হ্যানস আর্প প্রমুখ। প্রথাগত যা কিছু তাকে ধ্বংস করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ। শুধু প্রচলিত জীবন ও শিল্পবোধ নয়, বুদ্ধি ও অন্বয়নির্ভর প্রকাশরীতিকেও তাঁরা ভাঙতে চেয়েছিলেন। অবচেতনের স্বৈরাচারের প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। এই আন্দোলনের তাপ প্যরিস থেকে নিউ ইয়র্কে পৌছে গিয়েছিল। ১৯২২ সালে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় পরাবাস্তববাদী আন্দোলন। ডাডাবাদী ব্রেতঁ, লুই আরাগঁ ছাড়া পল এলুয়ারও এই আন্দোলনের হোতা। এই দুটি আন্দোলনের অন্তর্বিরোধকে অরুণ মিত্র ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে ঃ "দাদা'র দৃষ্টিতে শুধু ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এবং সমাজিপতিদের শঠতা ও দুর্বৃত্ততা। কিন্তু স্যুররেয়ালিষ্ট দৃষ্টিসীমায় আসে লেনিন অনুপ্রাণিত রুশ বিপ্লব, ফ্রয়েডের মনঃ সমীক্ষণতত্ত্ব, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এইসব ইতিবাচক দিক।"[৪]. কিছুটা হলেও একথা সত্য যে, ডাডাবাদী আন্দোলনের মধ্যে সাহিত্য শিল্পের অনেকগুলি ধারা এসে মিশে গিয়েছে। বাংলাসাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যার কিছু লেখায় পরাবাস্তববাদের ছাপ মুদ্রিত।

বিশ্বের এই সব সাহিত্য আন্দোলনগুলির এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা থেকে একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, সাহিত্যে আন্দোলনের ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের তরঙ্গ ও উত্তাপ ব্যতীত বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারটি বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণই হয়তো হতে পারত না। গতানুগতিক সাহিত্যের বিবর্ণতা-ই প্রাপ্তি হত মানুষের। যেমন বাংলাভাষার মধ্যযুগে ঘটেছে। মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের পৌনঃপৌণিকতা শত শত বৎসর ধরে চলেছে। এটা ঠিক যে, ব্যক্তিপ্রতিভার অসামান্যতাও সাহিত্যের অভিনবত্ব সূচনা করে। কিন্তু ব্যক্তিপ্রতিভা আকস্মিক বলে - তার জন্যে কোনো ভাষাকে বহু কাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়। অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অগ্রগতিতে সে সাহিতের ভাষা পিছিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া, বড় প্রতিভাও যে কোনো ভাবেই সাহিত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতি। বিশেষত আধুনিক যুগে। শেকসপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথের কথা এ

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেননা, শেকসপীয়ার কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি ইউরোপের নবজাগরণ আন্দোলনেরই সন্তান। রিভাইভাল যুগের টমাস মুর থেকে স্পেনসার, এলিজাবেথান যুগের মার্লো, লিলি সবাই শেকসপীয়ারের পূর্ণতা লাভের সহায়ক ছিলেন। একই ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। ইংরেজী সাহিত্যে যদি রোম্যান্টিক আন্দোলনের ঐ রকম ব্যাপ্তি ও সিদ্ধি না ঘটত তাহলে আমরা কোন রবীন্দ্রনাথকে পেতাম ? রবীন্দ্রনাথ শুধু ইউরোপীয় রোম্যান্টিক আন্দোলনের ফসল নন, তিনি বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনেরও কারণ। বাঙালী নবীন সাহিত্যিকদের তিনি যেমন আরাধ্য ছিলেন, তেমনই ছিলেন আক্রমণেরও স্থল। তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যই বাংলাসাহিত্যে নানা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

সাহিত্য আন্দোলনের আরও একটি বড় তাৎপর্য এই যে, প্রায় প্রতিটি আন্দোলন, প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। একটি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার যেমন অন্য আন্দোলনের জন্ম, তেমনই একটি আন্দোলন অন্যটির পরিপূরক। অধিকাংশ আন্দোলনই সাহিত্যের একটি শাখারূপকেই আশ্রয় করে জাত হলেও অন্য শাখাকেও সম পরিমাণে প্রভাবিত করে। এমনকি সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিকেও। সুতরাং সাহিত্যে 'আন্দোলন' ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী।

তথ্যসূত্র

১. Hugh, Honour, Neo classicism, Penguin Books, Britain, 1981, Introduction, P. 14

২. Baudelaire, Penguin Books, Britain 1980, correspondences, Page - 43.

৩. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, সাহিত্যের রূপরীতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা -১৪৬

৪. অরুণ মিত্র, আরাগঁ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯১, ভূমিকা, পৃ ঃ ২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষায় সাহিত্য আন্দোলনের পূর্বসূত্র

পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য আন্দোলন কোনটি তার যেমন নির্দিষ্ট কোনো উত্তর নেই, তেমনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আন্দোলনের নির্ধারণও বিতর্কের অবকাশ সূচিত করতে পারে। এমনিতে বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছরের। তার মধ্যে আধুনিকতার আবির্ভাব কিঞ্চিদধিক একশ বছর। প্রধানত মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব থেকে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জন্ম পশ্চিমী সাহিত্যের অনেক পরে এবং ঐ সব সাহিত্যের প্রভাবে। মধুসূদন বঙ্কিমের হাতে আমাদের সাহিত্যের ভিত যখন গড়ে উঠল, তখন এ দেশে একদিকে প্রাচীন পন্থীদের সঙ্গে এই আধুনিকমনা নবীনদের বিরোধ ঘটে, অন্যদিকে এঁদের প্রভাবে এক একটা ধারার প্রবর্তন হয়। মধুসূদনের ধারায় হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সাহিত্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। তবে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে গোষ্ঠীগত সৃজন প্রক্রিয়ায় সাহিত্যের অভ্যস্ত পথকে অস্বীকার করে নতুন দিশার সন্ধান দেবার মধ্যে। কিন্তু মধুসূদন, বঙ্কিম যেমন আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব, তাঁদের অনুসারকেরাও তাই। যৌথ ভিত্তিতে কেউই সাহিত্য রচনা করেননি, দলও গড়েননি। তবু একটা প্রশ্ন থাকে। ক্লাসিসিজমের মধ্যে যেমন সাহিত্য আন্দোলনের কিছু গুণাবলী নিহিত থেকে যায়, তেমনই যে কোনো সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসের পিছনে যুগের অন্যান্য উপাদানও অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। আজ যখন বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিককার আন্দোলন হিসবে 'সবুজ পত্র' আন্দোলন বা 'কল্লোল' আন্দোলনকে' চিহ্নিত করা হয় তখন বুঝতে হয় এদেরও একটা হয়ে ওঠার ইতিহাস আছে।

ইতালীর রেনেশাঁস যেমন ইউরোপে শিল্প-সংস্কৃতিতে একটা প্রবল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, উনিশ শতকের নবজাগ্রত বঙ্গদেশেও তেমনই একটা উত্থান ঘটেছিল। সে সময় এদেশে একটি নবীন শিক্ষিত বাঙালী সমাজ জেগে উঠেছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ সবাই তারই ফসল। প্রতিবাদ, অসহিষ্ণুতা, সংস্কারমুক্তি, বিজ্ঞানমনস্কতা, অনুসন্ধিৎসা, বিচারশীলতা, আবেগ, যুক্তিপ্রবণতা, জাতীয়তাবোধ, পাশ্চাত্যমুখিতা সবই একসঙ্গে প্রবল হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানের পঠন পাঠনই হল এর মূল কারণ। এই নতুন জিজ্ঞাসাবোধ ছাড়া বাঙালীর এই নতুন সাহিত্য গড়ে উঠতে পারত না। এই নব জিজ্ঞাসা ও নবজাগরণই আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার প্রেরণা। ধর্মীয়, সামাজিক ও

রাজনৈতিক আন্দোলন বাঙালী-মনে নানা ধরণের যুক্তিবোধ, জাগিয়ে দিয়েছিল; আর তা থেকে শুধু প্রচারমূলক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ মাত্র নয়, রসসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছিল। তার মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চিন্তক ও ভাবুক লোকদের প্রতিবাদী চেতনা কাজ করেছিল। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনে শুধু ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী আন্দোলনগুলি নয়, দেশজ এই সামাজিক আন্দোলনগুলিরও প্রভাব ছিল। মধুসূদনের কাব্যে ও প্রহসনে, রামনারায়ণ তর্করত্ন ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে, বঙ্কিমের উপন্যাস ও প্রবন্ধে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনগুলি'র বাহক হয়েছিল নানা পত্র পত্রিকা। আর পত্র পত্রিকার এই বিতর্কপ্রবণ স্বভাব, সাহসী ভূমিকা উনিশ শতকের শুরুতেই দেখা গিয়েছিল। ১৮১৮ সালের 'দিগদর্শন' থেকে ১৮৪৩ সালের 'তত্ত্ববোধিনী' সকলের ক্ষেত্রেরই এ কথা সত্য। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

> এই সময়ে মধ্যে বাংলা সাময়িক পত্র (সাপ্তাহিক, বারত্রয়িক, দ্বিসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও দৈনিক) এমন একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে যে, শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, বাঙালীর সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষাক্রম, ধর্ম ও উপধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' প্রভৃতি ইয়ংবেঙ্গল পরিচালিত পত্রিকায় রাজনৈতিক সমালোচনা ও আন্দোলন ক্রমে দানা বেঁধে উঠলেও সাধারণ বাঙালী এ ব্যাপারে আকর্ষণ বোধ করেনি।[২]।

এগুলির কোনোটাই সাহিত্য আন্দোলন নয় ঠিকই, কিন্তু উনিশ শতকের কবিতা, প্রহসন ও প্রবন্ধসাহিত্যের উপর এগুলির গভীর প্রভাব আছে। উপরন্তু বাঙালির পত্র পত্রিকা যে সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে পারে - সেই ইশারাও তারা রেখে গিয়েছিল। ১৮৩১'র 'সংবাদপ্রভাকর' এবং ১৮৭২'র 'বঙ্গদর্শন' দু'জন সাহিত্যিক দ্বারা সম্পাদিত হলেও সেখানেও সমাজ ও ধর্মবিশ্বাস প্রাধান্য পায়। আরও পরে - 'সবুজপত্রে'র পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল সে গুলি সবই ছিল নিস্তরঙ্গ। তাই যে রোম্যান্টিসিজম্ ইংরেজী সাহিত্যে আন্দোলন হিসেবে প্রকাশলাভ করে, বাংলাসাহিত্য তার আগমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতাবলীর প্রকাশ 'পূর্ণিমা, 'অবোধবন্ধু', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি সাধারণ পত্রিকায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বপ্লাবী সাহিত্যিকের প্রকাশ যেসব পত্রিকায় যথা 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'সাধনা' 'হিতবাদী' 'ভারতী' ইত্যাদি সেগুলিও কোনোটাই সে অর্থে অভিনব ধারার নয়। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাময়িক পত্র

পত্রিকাগুলি যেমন নানাবিধ আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল ঐ শতকের বা পরের শতকেরও অনেক সাহিত্য পত্রিকা সেরূপ ভাবে সাহিত্য আন্দোলনের বাহক হয়ে উঠতে পারেনি। তাই উনিশ ও বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে বিপুল উত্থান রবীন্দ্রনাথের হাতে ঘটেছিল, তা এদেশের কোনো সাহিত্য আন্দোলনজাত নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রোম্যান্টিক আন্দোলনেরই উত্তর সাধক কিন্তু তাঁর মধ্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনাও বড় কম নেই। যাই হোক, রবীন্দ্র প্রতিভার বিশালতা ও ঔজ্জ্বল্য বাঙালী কবি সাহিত্যিকদের কিছুদিন মোহমুগ্ধ রাখলেও, কেউ কেউ তা থেকে মুক্ত হবারও চেষ্টা করলেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যের বিচারে দেখা যায় যে, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে মধুসূদনই প্রথম আঘাত করেছিলেন। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের চরিত্রগুলির নব মূল্যায়নে সেদিন তিনি নৈরাজ্যবাদী বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রোহ ছিল সামন্ত ভূমিব্যবস্থা, প্রাচীন প্রজন্মের দুরাচার ও নবীন প্রজন্মের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধেও। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহ্যের প্রতি পক্ষপাত দেখালেও বাঙালী সমাজ ও জাতির সমালোচনা করেছিলেন নানা প্রবন্ধে ও নকসায়। রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশ সরকারের সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। এই ব্যাপারগুলোও বাঙালীর মনকে সেদিন গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সুতরাং একটা আন্দোলনের জন্য (তা সাহিত্য বা রাজনীতি যারই হোক না কেন) যে মানসিকতার দরকার, উনিশ শতকের শুরু থেকেই তার নির্মাণের প্রক্রিয়া নানাভাবে শুরু হয়েছিল। তাই ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' পত্রিকা ইতিহাসের এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। স্মরণীয় যে, 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পিছনে রবীন্দ্রনাথের প্রণোদনা থাকলেও 'সবুজ পত্র' প্রমথ চৌধুরীর ভাবাদর্শকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কারণ তিনিই ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। এমনকি 'সবুজ পত্র' রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতিকেও পাল্টে দিয়েছে। তিনি চলিত ভাষাকে 'সবুজ পত্র' থেকেই সাহিত্যের বাহন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, যে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কিছুদিন আগে লিখেছিলেন,

> আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজ পত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথ নাথ যে এই পত্রকে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নূতন প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীয় মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। 'সবুজ পত্রে' সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা করা প্রমথর কৃতিত্ব।[৩]

'সবুজ পত্রে'র নতুন ভূমিকা অবশ্য ছিল বহুবিধ। যার ফলে বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম সুনির্দিষ্ট মাইলস্টোন হিসেবে তাকে ধার উচিত। 'সবুজ পত্র'ই প্রথম বাংলাভাষার সাহিত্য

পত্রিকা যা তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধী পত্রিকা গোষ্ঠীর মোকাবিলা করতে পেরেছে। বিশেষ করে 'নারায়ণ' পত্রিকার কথা বলতেই হয়। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র স্নেহধন্য হলেও তাঁর অন্ধ স্তাবকতা করেনি 'সবুজ পত্র'। আবার 'ভারতী'র মতো পত্রিকাও অনেকখানি পাল্টে গেছে 'সবুজ পত্র'র প্রভাবে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগী হিসেবে 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠী' সাহিত্যে যে মুক্তি চেতনা ও গতিধর্মের প্রয়োগ সাধনায় একান্ত আগ্রহী হয়েছিলেন, ভারতীগোষ্ঠীর... লেখকেরা সেই প্রয়াসকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে আনুকূল্য করলেন। প্রাচীনপন্থী সমাজ ও পরিবারের একঘেঁয়ে নীতি নিয়ম সম্মত কাহিনীর ধারা বর্জন করে এঁরা গল্প উপন্যাসে নূতনত্ব আনার চেষ্টা করলেন।"[৪] কিন্তু 'সবুজপত্র'র ভাবাদর্শটি কী যার জন্য সে একটা ভাষার সাহিত্য আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হলো। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তারুণ্যের জয়গান এবং চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি। যুক্তি ও বুদ্ধি, মননের নেশা ও তার্কিকতা, জড়তা ও মেদবর্জিত ভাষা এবং আধুনিক রুচির প্রতিষ্ঠা পত্রিকাটিকে এক অনন্যতা দান করল। এই একটি পত্রিকা যেখানে ছবি বাদ দেওয়া হল, বিজ্ঞাপন বাদ দেওয়া হল, কিন্তু তাতে পত্রিকার আকর্ষণ, এতটুকু কমল না। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে প্রমথবাবু পত্রিকাটির আবির্ভাব ঘটালেন। এর আগে অন্য কোনো বাংলা সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটেনি। 'সবুজ পত্রে'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'মুখপত্র' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে প্রথমবাবু লিখেছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'একটা নতুন কিছু করো।' সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা, একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না।"[৫] অর্থাৎ নতুনত্বের ব্যাপারটি রয়েছে কিন্তু তা একমাত্র নয়। এর পরে প্রমথবাবু সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হবে সম-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। এখানে একটা জোটবদ্ধতার ব্যাপার এসেই যাচ্ছে। আরও বলেছেন, "মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্‌ছল।"[৬] যে জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্যের বিকাশ তা "মানুষের দৈনন্দিন জীবন নয়।" মানুষের প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করার কথা বলেছেন প্রমথবাবু। হয়তো সে জন্যেই মুখপত্রের নীচে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' শ্লোকটি মুদ্রিত হত। প্রাণকে জাগানোর ব্রতে প্রমথবাবু ইউরোপকে বরণ করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, —

> ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, ধাক্কা মারে। ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি। অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে - সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি।[৭]

প্রমথবাবু আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সাহিত্যকে সখের বিলাস থেকে মুক্ত করে ব্যবসা বাণিজ্যের অঙ্গ করতে হবে। তাঁর মতে, "অব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোনো কাজই যে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না একথা সর্বলোক বিদিত।' আর অব্যবসায়িকতার কারণেই আগাছার মতো সাহিত্য রচিত হয়। তিনি আত্মসংযমের কথা বলেছিলেন, লেখক মনকে সংহত ও স্বচ্ছ করতে বলেছেন। দেশজ চেতনা ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করতে বলেছেন। তাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চেয়ে 'ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কে প্রমথবাবু অধিক পক্ষপাত দেখিয়েছেন। ইউরোপীয় চেতনাকে এভাবে স্বাজাত্যবোধের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন।

'সবুজ পত্রে'র আদর্শের মধ্যে বাঙালীত্ব ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনা বাঙালীত্ব ও বাঙালীর প্রাণাবেগ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> আমরা তাই দেশী কি বিলাতী পাথরে গড়া সরস্বতীর মূতির পরিবর্তে, বাঙ্গালোর কাব্য মন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরে কোনও গর্ভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই।[৮]

প্রমথবাবুই প্রথম জানান যে, সাহিত্যকর্ম শুধু ব্যক্তির একটি সৃজনশীল কর্ম নয়, তা ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক অনিবার্যতাও। তাই 'সবুজ পত্রে'র প্রকাশ "একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করবার জন্য।"[৯] ইংরেজী শিক্ষার কারণেই বাঙালীর জীবনে এই নতুনত্ব এসে পড়েছিল। প্রমথচৌধুরীই প্রথম সাহিত্যকে ভাবাতিশয্য ও 'চুটকি' থেকে মননশীল শিল্পরূপে উত্তীর্ণ করবার কথা বললেন। 'সবুজ পত্রে'র প্রথম সংখ্যার 'মুখপত্রটি তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া চলিত গদ্যকে 'সবুজ পত্রের' মুখ্য বাহন করায় এবং রবীন্দ্রনাথ এখানে চলিত গদ্য অবলম্বনে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনা করায় বাংলা সাহিত্যে একটি যুগান্তরের সূচনা হল। প্রমথ চৌধুরী যে ভাবে 'সবুজ পত্র' পত্রিকার পরিকল্পনা ও লক্ষগুলিকে 'মুখপত্রে' বিন্যস্ত করেছেন - সেই পদ্ধতিই প্রমাণ করে যে, 'সবুজ পত্র' বাংলাভাষা ও সাহিত্যে একটি আন্দোলনের স্রষ্টা। ডঃ বিজিতকুমার দত্ত বলেছেন, "সবুজপত্র এমন আকারে প্রকাশিত হল যা ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন নেই। সবুজ মলাটের মাঝখানে সবৃন্ত তালপাতার গাঢ় ছায়াছবি। সুকুমার সেনের ভাষায় এই মলাট 'উদ্ধত, অদম্য, চিরহরিৎ, বাঙ্গালোদেশের চিরপরিচিত, চিরকালীন প্রাণের সরল সবল উদ্দণ্ড ঊর্ধ্বাভিমুখিতার চিহ্ন এই অভিনব তালধ্বজ।' সবুজপত্রে ছবি নেই। সাইজ অর্ধ ফুলসক্যাপ। সবুজপত্র যথার্থ লিটল ম্যাগাজিন।'[১০]

'সবুজপত্রে'র নিজের গুণ ও ক্ষমতা যেমন তাকে একটি সৃজনশীল আন্দোলনের পথে নিয়ে গেছে তেমনই সমকালীন বিশ্বের নানা ঘটনা ধারাও তার সঙ্গী হয়েছে। যেমন, ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্রে'র আত্মপ্রকাশ তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও শুরু। এর অব্যবহিত আগে ১৯০৫ সালে সংগঠিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯১৭ সালে ঘটল রুশ বিপ্লব। ১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি।[১১] সুতরাং 'সবুজ পত্র' পত্রিকার প্রকাশ ও সমৃদ্ধির কাল প্রবাহও পত্রিকার আন্দোলনের সহযোগী ছিল। যেহেতু লেখকদের মনকে নাড়া দেবার পক্ষে ঘটনাগুলি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরীর অনেক লেখায় ঐ সব ঘটনার বিশেষ করে যুদ্ধের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে আছে। যেমন, 'নানা কথা' গ্রন্থের 'ইউরোপে কুরুক্ষেত্র' (১৩২১) ও বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ (১৩২১) প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যে কোনো সাহিত্য আন্দোলনের একটি বড় কাজ হল একটি নিজস্ব লেখক গোষ্ঠী গড়ে তোলা। 'সবুজ পত্র' সে ব্যাপারে খুবই সার্থক। এঁদের মধ্যে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবীচৌধুরী ও অতুল চন্দ্র গুপ্ত খুবই নাম করেছিলেন। এছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যয়, বিশ্বপতি চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকেও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'সবুজপত্র' পত্রিকার পর বাংলা সাহিত্যে যে পত্রিকাটি সর্বাপেক্ষা আলোড়ন তুলেছিল তার নাম 'কল্লোল'। সাহিত্য আন্দোলনের গুণ ঐ পত্রিকাটিতে 'সবুজ পত্র'র চেয়েও ছিল বেশী। ১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব। প্রথম আর্বিভাবে তাকে গল্পের পত্রিকা হিসাবে আখ্যাত করা হয়েছিল। কিন্তু অচিরেই তা সবধরণের লেখকের মুখপত্র হয়ে উঠল। 'সবুজ পত্র' বলেছিল মুক্তির কথা, আর 'কল্লোল' নিয়ে এলো উদ্দামতা। 'সবুজ পত্র' রবীন্দ্রনাথের আশিস্ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, 'কল্লোল' এগোতে চাইল রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে, তাঁকে আক্রমণ করে। 'সবুজ পত্র' আশ্রয় নিয়েছিল বুদ্ধির, 'কল্লোল' নিল প্যাশনের। তাই সমকালীন ঘটনাবলীর উত্তেজনা 'সবুজ পত্র' প্রতিফলিত হয়নি, কিন্তু 'কল্লোলে' তার প্রত্যক্ষ ছায়া পড়েছে। যুগের সার্বিক সংকট 'কল্লোল' সাহিত্যের আকাশ আবিল করে দিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় এক দশকের মাথায় 'কল্লোল' এর আবির্ভাব। কারণ ১৯১৪ থেকে ১৯২৩'র কাল ব্যবধান নয় বছর। ফলে যুদ্ধোত্তর কালের সংশয় পীড়িত মূল্যবোধ কোনো নির্মাণ নয় এক ভাঙনেরই চিহ্ন রেখে গেল কল্লোলের পাতায় পাতায়। উনিশ শতকের যে মূল্যবোধকে আশ্রয় করে প্রমথ চৌধুরীরা বুদ্ধিবাদের জাগরণ চেয়েছিলেন তা কল্লোলের কালে গুরুত্বহীন হয়ে গেল। একদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা (১৯০৫-১১), ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মজফরপুর হত্যাকান্ড উপলক্ষে প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ও ক্ষুদিরামের মৃত্যুদন্ড যেমন বিদ্রোহের সংবেদনা জাগাল,

তেমনই অন্যদিকে মহাযুদ্ধের ক্লিন্নতা ও ১৯১৫'র সহিংস আন্দোলনে বাঘাযতীনের পরাজয় দেশের যুবসমাজের চিত্তে এক গভীর হতাশার জন্ম দিল। যুদ্ধজনিত আর্থিক সংকট খাদ্যাভাব, বেকারসমস্যা প্রভৃতিকে আরও বাড়িয়ে তুলল। 'কল্লোল'এর লেখকেরা প্রায় সবাই এই সময়ের ফসল। সুতরাং অস্থিরতা, নৈরাশ্য, ক্ষোভ এবং অবিশ্বাস 'কল্লোল'-এর লেখকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু মানসিকতায় কল্লোলীয়রা যেহেতু রোম্যান্টিক, তাই বাস্তবের রূঢ়তাকে অস্বীকার করে তাঁরা এক নতুন মূল্যবোধ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। 'কল্লোল' ধারার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোম্যান্টিসিজমের মোহ মাখানো।' বাংলা ভাষার সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে 'কল্লোল'কে যে অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিতে হয় তার আরও একটা বড় কারণ তাঁদের সংগঠন শক্তি। 'কল্লোল'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রিকা যা অন্যান্য পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখকদেরও তাঁদের ছত্রছায়ায় এনেছিল। এমনকি অন্য পত্রিকার সম্পাদকদেরও। ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ। ১৯২৬ সালে কলকাতায় 'কালিকলম' এবং ১৯২৭ সালে ঢাকায় 'প্রগতি' পত্রিকা বার হয়। সুকুমার সেন 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'কে ''কল্লোলের কচিশাখা''[১২] বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, কল্লোলেরই তিন ভাগ হওয়ার কথা। এরকম বলার কারণ, 'কল্লোলে'র নিম্নবিত্ত ও ধূলিমলিন জীবনচিত্রণ 'কালিকলমের'র শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনালেখ্য রচনা থেকে পৃথক নয়। অথবা অজিত দও ও বুদ্ধদেব বসুর রোম্যান্টিকতা ও যৌবধর্ম 'প্রগতি'র পাতায় যে ভাবে রূপায়িত - তাও 'কল্লোলেরই একটি প্রবণতা বিশেষ। শুধু তাই নয়, 'কালিকলমে'র সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র বা 'প্রগতি'র সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু পরেও তাঁদের অনেক ভালো লেখা 'কল্লোলে' দিয়েছেন। সেকালের সব নবীন লেখকই তাঁদের সেরা লেখাটি 'কল্লোল' পত্রিকায় দিতেন। যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' উপন্যাসটি ১৩৩৫ সালের অষ্টমসংখ্যা 'কল্লোল' থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বেরিয়েছে বুদ্ধদেব বসুর একাধিক গল্প। 'কল্লোল' যত বিচিত্রধরণের দিকপাল আধুনিক লেখককে তার ছত্রছায়ায় আনতে পেরেছিল, তেমনটি আর কোনো পত্রিকাই পারেনি। দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, মনীন্দ্রলাল বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, মনীঘটক (যুবনাশ্ব), বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, নৃপেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অজিত কুমার দত্ত প্রমুখ। এঁদের অনেকেই হয়তো 'কল্লোল'এ খুব কম লিখেছেন, বা পরে অন্যত্র সরে গেছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা 'কল্লোল'-এর জন্যই হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন,

"সে আড্ডায় (কল্লোলে'র আড্ডায়) সকলেই আসতেন - নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রবোধ সান্যাল, হেমেন্দ্রকুমার, মনীন্দ্রলাল, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) ধূর্জটিপ্রসাদ, কালিদাস নাগ নলিনী সরকার (গায়ক), জসীমুদ্দিন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে ও আরো অনেক। ... উপরে যাঁদের নামকরলুম তাঁরা প্রায় সকলেই অবশ্য 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং বেশির ভাগেরই খ্যাতির প্রথম সোপানও 'কল্লোল'। তাছাড়া আমাদের আড্ডায় যাঁদের কখনো দেখিনি, কিংবা কমই দেখেছি, এমন অনেকের লেখাও প্রথম 'কল্লোল'এ বেরোয়, এবং 'কল্লোলে'র সূত্রেই তাঁদের নাম বাইরে ছড়ায় - যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ। প্রবীনদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বাগচী, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নরেন্দ্র দেবের রচনা 'কল্লোল' এ প্রায় বেরুতো - রাধারাণী দেবীও নিয়মিত লিখতেন - এবং এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, তৎকালীন তরুণ লেখকসমাজে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলালের প্রতিপত্তির জন্য 'কল্লোল'-ই প্রধানত দায়ী। ... নজরুলের গজল গানগুলি 'কল্লোলে'ই প্রথম বেরোয়, আর 'কল্লোল' আপিসের তক্তাপোষে বসে নজরুল যখন ওসব গান গেয়েছেন তখনও তা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। বস্তুত, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে কটি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো 'কল্লোল'।"[১৩]

অবশ্যই তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর, জীবনানন্দ, বা যতীন্দ্রনাথকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক বলা যাবে না। কারণ 'কল্লোলের দৃষ্টিভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা সাহিত্যের আদর্শ বলে মনে নেননি। কিন্তু 'কল্লোলে'র প্রভাব তাঁদের উপর অবশ্যই কমবেশী পড়েছিল।

আসলে, 'কল্লোল' পত্রিকা যে বাংলা সাহিত্যে একটি আন্দোলনের সূচনা করতে পেরেছিল তার মূলে তাঁদের একটা বিশেষ জীবনবোধ ও প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সূচনা ও 'সবুজ পত্রে'র ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে তারই অবচেতনিক গূঢ়তা সেখানে ধূলিধূসর জীবনের সংরক্ততা নেই। 'কল্লোল' সেই অভাব দূর করতে চেয়েছে। প্রেমেন্দ্র ও

অচিন্ত্যের গল্প ও উপন্যাসে কলকাতা নগরীর যে ক্লেদ ও নিষ্ঠুরতা কিংবা শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে প্রান্তিক শ্রমিক জীবনের যে আলেখ্য নির্মাণ তা এ কথাই স্মরণ করায়। যৌনমনস্তত্ত্ব ও দারিদ্রের অভিজ্ঞতা দুটোকেই মেলাতে চাইলেন কল্লোলীয়রা। লক্ষণীয় যে, ১৯১৩-১৪ সালের মধ্যে ফ্রয়েড়ের' "The interpretation of Dreams" "The psychology of Everyday life," "on Dreams" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বার হয়ে মনোবিকলন তত্ত্বের সাড়া সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ফেলেছে। ভারতে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কারণ, রাশিয়ায় লেলিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ইতিমধ্যে সাকার করে তুলেছেন। সুতরাং কল্লোলীয়রা সাহিত্যে এই দুটি ব্যাপারকেই উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল', সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[১৪] অচিন্ত্যকুমারের এরূপ বলার পিছনে, 'কল্লোলে'র বিষয় ও বিন্যাসটি চিহ্নিত হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লেদ ও সৌন্দর্যের বিনষ্টি 'কল্লোলে' প্রতিফলিত। এমনকি সমাজের ভিন্ন শ্রেণীরও ছবি চলে আসছে। উল্লেখ করা যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাখনি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের জীবন ভিত্তিক গল্প 'মা', 'মরণ বরণ', ঝমরু প্রভৃতি গল্প। পতিতাদের দারিদ্র্য ও ক্লিন্নতা নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দাসের 'মরুর বাতাস', 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', সুবোধ দাশগুপ্তের 'মহামানব' প্রভৃতি গল্প। জগদীশ গুপ্ত প্রান্ত-বাসিনীর জীবন তুলে ধরেছেন 'যে যার কাজে' গল্পে বা যুবনাশ্ব বস্তিজীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'তে। এগুলি সবই 'কল্লোলে' মুদ্রিত। বাস্তবতার এই নতুন ধরণে অনেক সময় 'কল্লোল' এর লেখকরা বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। তাই গোর্কি এবং ন্যুট হামসুনকে মেলানোর কথাও তাঁদের মাথায় এসেছিল। ফরাসী প্রতীকীবাদীদেরও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন তাঁরা।[১৪] লক্ষণীয়, একদিকে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট, অন্যদিকে বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনসম্পর্ক এবং বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি টান যুগপৎ 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে। এসব কারণেই দেশ, জাতি, সমাজ, প্রথা সব কিছুকে প্রবলভাবে অস্বীকারের প্রবণতা তাঁদের লেখায় মেলে। তাই যেন হয়ে ওঠে প্রতিবাদ, আঘাত ও বিদ্রোহ। এই দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে নিহিত সীমাবদ্ধতা হয়তো সমালোচনা যোগ্য কিন্তু তাঁরা যে বাংলা সাহিত্যকে সেকালে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলেন — তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধ্যাপক গোপিকানাথ চৌধুরী দেখিয়েছেন, কল্লোলগোষ্ঠী সাধরণভাবে ন'টি গুণ আমাদের সাহিত্যে সঞ্চার করেছে।[১৫] যথা ১. নবীনতার সাধনা ২. প্রচলিত সমাজের ধর্ম, নীতি ও প্রেমের আদর্শবাদী ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৩. কথা সাহিত্যের বিষয়সীমার প্রসার ৪. বাস্তবতার নতুন মাত্রা দান - যৌনতা ও প্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা ৫. বাস্তবতার সঙ্গে রোম্যান্টিকতার সংমিশ্রণ ৬.

কথাসাহিত্য গণচেতনার প্রসার — পথের ভিখারী থেকে বস্তিবাসী, কুলিকামিন মধ্যবিত্ত বেকার যুবক, সবাই। ৭. পঙ্কিল নগর চেতনা প্রধানত কলকাতার ক্লিন্ন নগরজীবন ৮. আঞ্চলিক জীবন বোধ -কয়লাকুঠির জীবন। ৯. প্রকাশভঙ্গীর ভিন্নতা। ১০. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, "কল্লোলে'র বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে, ভঙ্গী ও আঙ্গিকের চেহারায়।"[১৬]. প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প ও উপন্যাস, অচিন্ত্য, প্রবোধ ও বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলি তার বড় প্রমাণ। যাইহোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা সাহিত্য 'কল্লোল' পত্রিকা ও ঐ গোষ্ঠীর লেখকেরাই প্রথম স্পষ্টরেখ আন্দোলনটির সূচনা করেছিলেন। এবং 'কল্লোল'এর কাছে প্রেরণা নিয়েই বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী আন্দোলনগুলি জন্ম নিয়েছে। মন এবং মননের সমস্তরকম অচলায়তন 'কল্লোল'-ই প্রথম ভেঙ্গে দিয়েছিল।

'কল্লোল'-এর পর উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'পরিচয়' ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনার প্রকাশ পায়। 'কল্লোল'-এর তীব্র দ্রোহচেতনার পাশে 'পরিচয়' কে প্রথম দেখায় চোখে লাগে না। 'পরিচয়ে'র হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে, নতুন যুগ সৃষ্টির দাবি 'পরিচয়' কোনোদিন করেনি।"[১৭] আসলে, 'পরিচয়' মননশীলতা ও প্রগতির আরেক বার্তা নিয়ে এসেছিল আমাদের সাহিত্যে। তার প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচীর মধ্যে বিষয় গাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্য দুইই ছিল। বিষয়সূচী এরকম ঃ

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ	-	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
বৌদ্ধধর্মের দান	-	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী
কাব্যের মুক্তি	-	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা	-	শ্রীসুশোভন সরকার
বিজ্ঞানের সংকট	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
শিল্পীর ব্যথা	-	শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রেমপত্র	-	শ্রীধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্থানী ও বাংলাগান	-	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়
কবিতাগুচ্ছ	-	শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী
		শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
		শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীবুদ্ধদেব বসু
		বিচ্ছেদ (মারসেল প্রুস্ত) শ্রীবিষ্ণু দে
		বীরবলের পত্র - বীরবল

189629
26 FEB 2007

NBU DARJEELING

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅশোক নাথ বেদান্ততীর্থ, শ্রীধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যয়, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, শ্রীমনীন্দ্র লাল বসু - ইত্যাদি।

১৫৪ পাতার ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটিতে ৩৬ পাতা বরাদ্দ হয়েছিল 'পুস্তক পরিচয় বিভাগের জন্য। সে যুগে তা ছিল বিরল ঘটনা। 'পরিচয়' প্রথম সমকালীন সাহিত্য সমালোচনাকে এত গুরুত্ব দিয়েছিল। সুতরাং পরিচয়ের সাহসের ধাত ছিল অন্যরকম। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর নীরেন্দ্রনাথ রায় সেকালে তাঁর মার্কসবাদী সমালোচনারীতি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বহু বাঙালী লেখককেই আক্রমণ করে সোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। 'পরিচয়' বাংলা সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার যে একটি নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেছিল তা স্বীকার করতে হয়। এই একটি পত্রিকা প্রোপাগান্ডা ও দলাদলি ছাড়াই একটি প্রগতিশীল অথচ মুক্ত মননের সাহিত্যাদর্শ নির্মাণ করেছিল। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হিরণকুমার সান্যাল, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা, সুশোভন সরকার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সরোজ আচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রথমে 'কল্লোলে' লিখলেও বিষ্ণু দে'কে 'পরিচয়' গোষ্ঠীরই অন্তর্গত করতে হবে। কারণ, এখানে এসেই তিনি পাল্টে যান, পরিণত হন। সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষ যেহেতু শুধু হৈ চৈ করা নয়, বরং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা তাই স্বভাবে স্থিতধী 'পরিচয়' অবশ্যই একটি আন্দোলনের স্রষ্টা। আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনে 'পরিচয়'-এর পুরোধা ভূমিকাকে স্বীকার করতে হবে। মার্কসবাদী সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার ধারাটিও পরিচয়'-ই আমাদের ভাষার প্রবর্তন করেছে। 'সবুজ পত্র' থেকে 'পরিচয়' পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে আন্দোলন তাতে একক ব্যক্তি নয়, আন্দোলন সংগঠিত করার পিছনে গোষ্ঠীবদ্ধ প্রয়াস-ই লক্ষ্য করা যায়।

'পরিচয়'-এর পরে 'কবিতা' পত্রিকার আবির্ভাবে এই ঐতিহ্যটি পাল্টে গেল। ১৯৩৫ 'এর অক্টোবরে কবি বুদ্ধদেব বসু একক প্রচেষ্টায় ছয় আনা মূল্যের যে কবিতা ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বার করলেন, সেখানে কবিতা মনোনয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণে অন্য কারুর কোনো ভূমিকা রইল না। সুতরাং সাহিত্য আন্দোলন পরিচালনায় একক ব্যক্তি প্রাধান্যের যুগ সূচিত হল। 'কল্লোল'-এর উদ্দীপনা, 'প্রগতি' সম্পাদনার অভিজ্ঞতা - দুই-ই 'কবিতা' পত্রিকার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। 'সবুজ পত্র' সাহায্য করেছিল গদ্য সাহিত্যের, বিশেষত কথাসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে, 'কল্লোল' কথা সাহিত্য এবং কবিতা উভয়কেই, 'পরিচয়' প্রধানত কবিতা ও সমালোচনা সাহিত্যকে; আর 'কবিতা' শুধু কবিতার জন্য আন্দোলন। যদিও এ আন্দোলনের অর্থাৎ আধুনিক কবিতার আন্দোলনের ভূমিকাটি 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় আগেই নির্মিত হয়ে গিয়েছিল তবুও তাকে স্বাধীনভাবে স্বতস্ফূর্ততা ও

গতিবেগ দিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা। আন্দোলনের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ ভাবাদর্শ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে 'কবিতা' পত্রিকা প্রচার করেনি। 'সাহিত্য পত্রে' বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,

> শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিতা ছাপা হবে - নামজাদা বা অনামজাদা যার লেখাই হোক না কেন - প্রসাধন বৈশিষ্ট্য থাকবে - এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য এইটুকুর বেশী আমার ছিল না। ... আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিল কবিতার পত্রিকা রূপে নয়, কবিদের পত্রিকারূপে। অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা - এমনকি কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না; সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম।[১৮]

ঐ একই নিবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন,

> সমিতি করে, মন্ত্রণাসভা ডেকে, কিংবা লিমিটেড কোম্পানি স্থাপন করে কখনো সত্যিকার লিটল ম্যাগাজিন সম্ভব হয় না। এর আসল কথা স্বতঃস্ফূর্তি, বাইরে থেকে বানিয়ে তোলা যাবেনা একে, ভেতর থেকে হয়ে ওঠা চাই। এই হয়ে ওঠার প্রেরণা রূপে থাকে কখনো কখনো একজন মানুষের ব্যক্তিত্বের বল, কখনো কোনো লেখক গোষ্ঠীর মিলিত প্রভাব।[১৯]

'কবিতা' পত্রিকা অবশ্য একক ব্যক্তির বলেই আধুনিক বাংলা কাব্যের আন্দোলনের অন্যতম শরিক হয়ে উঠতে পেরেছিল। পত্রিকাটির আবির্ভাব লগ্নে এডওয়ার্ড টমসন 'দ্য টাইম লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট-এ" এর প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখে মন্তব্য করেছিলেন, 'They represent a movement which will change the thought of Bengal, and through Bengal that of India."[২০] 'বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে' কবিতা'র প্রথম প্রকাশকে কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিগ্‌বিজয়ের অভিযান' বলে উল্লেখ করেছেন।'[২১] কবিতা পত্রিকা তার অঘোষিত আন্দোলনে আরও যে একটি বড় কাজ করেছিল তা হল 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র একটি সংকলন প্রকাশ। এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হল এমন দু'জন ব্যক্তিকে যাঁরা কবি নন এবং যাঁদের দু'জনের মধ্যে আদর্শ ও রুচির বিস্তর পার্থক্য শুধু নয় বুদ্ধদেবের সঙ্গেও তাঁদের সম্মিলিত পার্থক্য একই। অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন যে, "আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পাদনের ভার সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শের দুইজনের উপর ন্যস্ত হওয়াতে সমগ্রভাবে 'কবিতা'র আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে।"[২২] অবশ্য

পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব স্বয়ং সংকলনটির রূপান্তর করেছিলেন। 'কবিতা' - আন্দোলনের প্রভাব এমন হয়েছিল যে, তিরিশের দশকের এমন কোনো কবিকে পাওয়া যায়নি যিনি কখনও 'কবিতা'য় লেখেন নি। এমনকি জীবনানন্দ, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তীর যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা তার পিছনে 'কবিতা'-রই অবদান সর্বাধিক। 'কবিতা' - পত্রিকার আর একটি বিশিষ্টতা হচ্ছে সে কখনও রবীন্দ্র দ্রোহিতার আশ্রয় নেয়নি। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত কাব্য সংকলনের যে সমালোচনা বুদ্ধদেব করেছিলেন তাতে কবি নির্বাচন নিয়ে আপত্তি থাকলেও রবীন্দ্রকাব্য বা সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কোনো বিরূপতা দেখা যায় নি। 'কবিতা' পত্রিকা শুধু আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে ওঠেনি, তা একই সঙ্গে আধুনিক কবিতার পাঠককেও তৈরী করেছে। শুধু সমকালের সব ধরণের কবিতার মুদ্রণ নয়, সে সম্পর্কে নতুন ধরণের আলোচনাও সুন্দরভাবে 'কবিতা' - পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল। পত্রিকার প্রথম বর্ষেই প্রকাশ পেয়েছিল বুদ্ধদেবের দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কবিতার দুর্বোধ্যতা' ও 'কবিতার পাঠক'। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেও আধুনিকের দৃষ্টি দিয়ে এ পত্রিকায় আলোচনা করা হত। 'কবিতা' পত্রিকাই বোধ হয় একমাত্র প্রথম যা মনে রেখেছিল হুইটম্যানের ধারণা "To have great poets there must be great audiences too "।[২৩] এসব কারণেই পচিশ বছর ধরে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে একটি যুগান্তকারী ব্যাপার। বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছিলেন, "বাংলা ভাষার কবিতা লেখার কাজটি হয়ে উঠছে শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের উপায় নয়, রীতিমতো একটি 'আন্দোলন', যার মুখপাত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে 'কবিতা' পত্রিকা"।[২৪]

'কবিতা' - আন্দোলনের পর বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী যে দিক পরিবর্তনের প্রয়াসটি দেখা যায় তা আবর্তিত হয়েছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। মাঝখানে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' ও দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, তরুণ মিত্র এবং আলোক সরকারের সম্পাদনায় 'শতভিষা' (১৯৫১) কিছুটা কবিতার আন্দোলন সংগঠিত করেছিল ঠিকই কিন্তু তার প্রভাব অচিরেই ক্ষীণতা পেয়েছে। বিশেষ করে 'শতভিষা' বিশুদ্ধ কবিতার আন্দোলন বলে যা চালাতে চেয়েছিল তাকে বৃহত্তর পাঠকসমাজ বর্জন করেছিল। তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সময়ের উল্টো স্রোতে নিজেদের বাইবার চেষ্টা। 'শতভিষা'র তেত্রিশতম সংকলনে 'সম্পাদকীয়'তে জানানো হয়েছে, "তিরিশের দশকের কবিদের যৌনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাত লক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয় এ সত্য অভ্রান্ত জেনে কবিতার মুক্তির জন্য 'শতভিষা' প্রয়োজন অনুভব করেছিল নতুন পথ সন্ধানের।"[২৫] দেখা গেল ১৯৫৩ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'কৃত্তিবাস' নামে যে পত্রিকাটি বাংলা কবিতার ধারাটিকে আমূল পাল্টে দিল তা ত্রিশের কবিদেরই অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যকে তীব্রতা দিয়েছে। শুধু 'শতভিষা' কথিত

সমাজভাবনার ব্যাপারটিই অনুপস্থিত। 'কৃত্তিবাস' কে ঘোষণা করা হয়েছিল 'বাঙলা দেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র' বলে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, ''আসল কথা হল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা।''[২৬] 'কবিতা' আন্দোলনের লক্ষ ছিল আধুনিক কবিতাকে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া। কবিতার একটি রুচিশীল পরিশীলিত আঙ্গিক দান করা। 'কৃত্তিবাস' - আন্দোলনের লক্ষ হল কবিতাকে জনপ্রিয় করা, তাকে বাণিজ্যের সামগ্রীতে পরিণত করা। আবেগ, সৌন্দর্য ও স্বতস্ফূর্তির মেলবন্ধন ঘটানো। যৌবনের সমস্তরকম স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়েই। 'এই দশকের কবিতা'র ভূমিকায় 'কৃত্তিবাসে'র শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তাই লিখেছিলেন, 'আধুনিক কালের পৃথিবীর তাবৎ কাব্যাদর্শকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে কেবলমাত্র কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ও সকল সময় কবিতার মধ্যে অবস্থানের সংকল্প বুঝি বা নূতন।' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার জন্য কিছু খেলা, শুধু ... / কবিতার জন্য এত রক্তপাত।''[২৭] কবিতা লিখে তিনি পনটিয়াক গাড়ি, স্কচ, সাদা ঘোড়া ইত্যাদি সবই চেয়েছিলেন।[২৮] সমস্ত রকম মূল্যবোধকে সজোড়ে ভাঙার রোম্যান্টিক আহ্বান 'কৃত্তিবাসী'দের মধ্যে দেখা গেল। এঁরা শুধু কবিতার মধ্যেই যে ঐ সব আঘাত ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ রাখলেন তাই নয়, এঁদের ব্যক্তিগত জীবনাচারণেও বহুবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ ঘটল। মদ্যপান ও হল্লা করার অভিযোগে তাই 'কৃত্তিবাসে'র শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বহুবার গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনের আর একটা ব্যাপার হল কবিতাকে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনপদে ছড়িয়ে দেওয়া। গ্রাম গ্রামান্তরের কবি যশোপ্রার্থীদের কবিতা তাঁদের পত্রিকায় ছাপানো এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে তাঁদের ভ্রমন, মদ্যপান, কবিতা পাঠের আসর 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীকে ব্যাপক পরিচিত দান করল। পরিশ্রমী মনন চর্চার যে ঐতিহ্য ত্রিশের কবিদের ছিল কৃত্তিবাসী আন্দোলন তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রত্যক্ষ শারীরিক অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া, আত্মজৈবনিকতা এগুলিকেই মুখ্য করে তুললো। এঁরা বললেন, কবিতা বানানো সিগারেট ধরাবার মতো সোজা। যাই হোক, কৃত্তিবাস আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নৈরাজ্যমুখী আন্দোলন, 'কল্লোল' এবং 'কবিতা'-আন্দোলনের অনেক গুণ আয়ত্ত করলেও 'কৃত্তিবাস'-ই প্রথম বাংলা সাহিত্য-চর্চা কে গুরুগম্ভীর বিষয় থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং কবিতা ও সাহিত্যের বাণিজ্যকরণের কথা ভাবে। সাহিত্য শিল্পের প্রতি আত্মোৎসর্গের যে উদাহরণ, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের ব্যক্তিজীবনে পাই; কৃত্তিবাস-এর সম্পাদকদের মধ্যে তার অভাব লক্ষ করা যায়। 'কৃত্তিবাস'-ই সেই পত্রিকা ও আন্দোলন যার নায়করা সবাই শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে একই সংবাদপত্রের অফিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। তবু কৃত্তিবাস আন্দোলনের সার্থকতা এই যে, এখানকার বেশ কয়েকজন কবি লেখক পরবর্তীকালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, তারাপদ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় উৎপল কুমার বসু, বিনয় মজুমদার প্রমুখ। তাছাড়া, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'কৃত্তিবাস' জড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনের ইতিবৃত্তে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আগে শেষ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন বলতে 'কৃত্তিবাস' আন্দোলনকেই ধরতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. শিবনারায়ণ রায়, জিজ্ঞাসা, কার্ত্তিক পৌষ ১৩৯১, কলকাতা।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ষষ্ঠখন্ড, ১ম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৪।

৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪।

৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কথা সাহিত্য, দেজ পাবলিশার্স, ১৯৮৬ কলকাতা, পৃঃ ১১০।

৫. সবুজ পত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২১, বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০০ পৃ ঃ ১।

৬. তদেব পৃঃ ১।

৭. তদেব পৃঃ ৩।

৮. বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, সেরা সবুজ পত্র, মিত্র ও ঘোষ, ২০০০, পৃঃ ৪-৫।

৯ বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০০ পৃঃ ৩।

১০. বিজিতকুমার দত্ত, সম্পাদকীয় ভূমিকা, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ২০০০, পৃঃ সাত।

১১. Haithcox, John Patrik, Communism and Nationalism in India, Oxford University Press, Calcutta, 1971, Page 20.

১২. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬।

১৩. বুদ্ধদেব বসু, (কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ) - কবিতা সংকলন, প্যাপিরাস, কলিকাতা ১৯৮৭ পৃ ঃ ১৩৬।

১৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ ২৯, দ্রষ্টব্যঃ "মনে আছে, - মাদার-পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কী করে? ..... ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?

১৫. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কথা সাহিত্য, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৬।

১৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, ডি. এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ৮২।

১৭. হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃঃ ২১।

১৮. বুদ্ধদেব বসু, 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধ, 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৬০ পৃঃ ১১০।

১৯. তদেব পৃঃ ১১১।

২০. সুবীর রায়চৌধুরী; 'বুদ্ধদেব বসু, প্রগতি থেকে প্রগতি লেখক সংঘ প্রবন্ধ, কলকাতা ২০০০ পত্রিকা ৮-৯ সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ - ৫৬ পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬২।

২১. প্রভাত কুমার দাস, 'সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু প্রগতি থেকে কবিতা' প্রবন্ধ তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে' গ্রন্থভুক্ত; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৬২।

২২. সুবীর রায় চৌধুরী, কবিতার সাময়িকী ও আধুনিকতা প্রবন্ধ, 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ ভুক্ত, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ২৯৯।

২৩. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কাব্য পাঠক / আধুনিক কবিতার ইতিহাস (নব সং), ভারতবুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ঃ ২৭৯।

২৪. সুবীর রায় চৌধুরী, (বাংলা কবিতা পত্রের ইতিহাস), আধুনিক কবিতার ইতিহাস, নব সং, ভারত বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩ পৃ ঃ ৪০৯।

২৫. আলোক সরকার, 'শতভিষা' প্রবন্ধ, 'জিগীষা' পত্রিকা, রাণা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৮, প ৃঃ ২১।

২৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, (কৃত্তিবাস, প্রথম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৬০), কৃত্তিবাস সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ ঃ ১।

২৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠকবিতা (শুধু কবিতার জন্য), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০ পৃ ঃ ১৮।

২৮. তদেব, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং কলকাতা, পৃ ঃ ৩৪।

তৃতীয় অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন অভিধাটির উৎপত্তি, আন্দোলনের প্রস্তুতি ও তত্ত্বনির্মাণ পর্ব

বাংলা সাহিত্যে 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলনই প্রথম ইংরেজী শব্দগুচ্ছ দিয়ে চিহ্নায়িত হয়। এর নেপথ্য ইতিহাস জানিয়েছেন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা মলয় রায়চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার মধ্যে তিনি একটি সাহিত্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন - যা তাঁরই প্রভাবে 'হাংরি জেনারেশন' নামে চিহ্নিত হয়। যথা —

> ১৯৬১ সন। ... আমার বয়স বাইশ। কবিতা এবং মার্কসবাদে আক্রান্ত। একদিন আচমকা চুরমার হয়ে গেলুম কবি জিওফ্রে চসারের এই বাক্যবন্ধে - "In the sowre hungry time". মগজে চেপে গেল হাংরি কথাটা।[১]

সুতরাং 'হাংরি' অভিধাটি মলয় চসার থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে, ১৩৯১ সালে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কার্তিক পৌষ সংখ্যায় অতিধাটির একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি, এই সময়ে,

> মার্কসবাদের উত্তরাধিকার গ্রন্থটির জন্যে নোটস সংগ্রহ করা কালে, আমি অসওয়াল্ড স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিশ পাই। ওই বয়সে স্পেংলারে যে আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় ঃ আরোহণ, রেণেশাঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোনো প্রভাব গ্রহণ করে না। রেণেশাঁসে অকল্পনীয় উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং অবক্ষয়ে তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে ১৯৬১ সনে অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়।[২]

যাইহোক, মলয় কথিত ১৯৬১ সালে যে প্রথম হাংরি মেনিফেষ্টোটি বার হয় সেখানে 'হাংরি জেনারেশন' শব্দবন্ধ প্রযুক্ত হয়। প্রথম ইস্তাহার দুটির দু'রকম রূপ পাওয়া যায় ঃ বাংলা ও ইংরেজী। কিন্তু কোনোটিতেই সাল ছাপানো নেই। উপরন্তু মলয়ের 'ইস্তাহার সংকলন' এর

প্রকাশক - কবি ও প্রাবন্ধিক ডক্টর উত্তম দাশ জানিয়েছেন যে, প্রথম ইস্তাহারটি ১৯৬২-এর এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।[৩] অথচ মলয় তাঁর 'হাংরি কিংবদন্তী' (১৯৯৪) গ্রন্থে, 'হাংরি সাক্ষাৎকার মালা'য় (১৯৯১); 'কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন ঃ বাংলা কবিতার পালাবাদল' (১৪১০) - প্রবন্ধে[৪], হাওয়া ৪৯' সংকলনে (১৪১২) প্রথম ইংরেজী বুলেটিনটির প্রকাশ কাল ১৯৬১ সাল বলেছেন। তবে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার ১৩৯১ - কার্তিক পৌষ সংখ্যায় 'হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা প্রবন্ধে, মলয় স্বীকার করেন -

> প্রথম বুলেটিন থেকেই তারিখ দেবার চল গড়ে ওঠেনি এবং শেষ অব্দি এভাবেই চলে। যতদূর মনে পড়ে, শক্তি পাটনায় এসেছিলেন ১৯৬১ কালী পুজোর পর। তাই প্রথম হাংরি বুলেটিনের প্রকাশ কাল নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৬১ ধরে নেওয়া যায়।[৫]

অতএব প্রথম বুলেটিনের প্রকাশ কাল নিয়ে এখন নিঃসংশয়িত হবার উপায় নেই। হয়তো এ কারণেই 'হাংরি জেনারেশন' অভিধাটি মলয়ের দেওয়া বলে শৈলেশ্বর ঘোষ মানতে চাননি। তাঁর মতে, 'হাংরি অভিধাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া।[৬] তিনি বলেছেন, 'হাংরি জেনারেশনের প্রথম লিফলেটে বলা হয়েছিল, Led rebelliously by Sakti Chattopadhya'।[৭] সমস্যা এখানেও। কারণ, এ লিফলেটের ফটোকপিও শৈলেশ্বর কোথাও দিতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, শৈলেশ্বর বলেছেন যে, সতীন্দ্র ভৌমিকের 'এষণা' পত্রিকায় (১৯৬২) বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো চাকা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত' বলেছিলেন। শৈলেশ্বরের মতে, "এই লেখা থেকেই 'হাংরি জেনারেশন' নামের সূত্রপাত হয়।'[৮] যুক্তিসঙ্গত বিচারে দেখা যায় যে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনটির সূচনা বর্ষ হিসেবে ১৯৬২ সনেরই প্রামাণিকতা বেশী। আবার, ইংরেজী লিফলেট গুলোর নিরিখে 'হাংরি জেনারেশন' এই অভিধার স্রষ্টা হিসেবে মলয়ের দাবী-ই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। হাংরি জেনারেশন এই পদগুচ্ছই ইংরেজী।

মলয় রায় চৌধুরীর প্রথম বাংলা বুলেটিনে 'ক্ষুধা' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে কবিতা একঘেঁয়ে ও আকর্ষণহীন হতে বাধ্য।[৯] এই বক্তব্যের সঙ্গে শক্তির বক্তব্যের খুবই সাদৃশ্য - "আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধাসংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব ... আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত।

যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনা রূপ কোন রস-ই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।"[১০] যে কোনো রূপ বা রসের ক্ষুধার সঙ্গে অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধা'র কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং তত্ত্বে একটি মৌলগত সাদৃশ্য আলাদাভাবেই দু'জনের চিত্তে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তবে শক্তি 'ক্ষুধার্ত' তত্ত্ব নিয়ে আর এগোন নি। তা যে শুধু মামলা জনিত বা আদর্শগত কারণে তা নয়। শক্তি তাত্ত্বিক ধরণের কবি নন। তাঁর কবি মানসই হচ্ছে সহজিয়া পন্থী এবং লিরিকমুখী যা হাংরি কবিতার ধাঁতের সঙ্গে মিলতে পারে না। এছাড়া কবিতা নিয়ে কখনই তাত্ত্বিকতার দিকে শক্তি পরবর্তীকালে আর উৎসাহ দেখাননি। মলয় প্রথম ইস্তাহারেই কবিতার একটি উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞায়ন ঘটিয়েছিলেন,

> কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তি গ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোন অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরু বিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্য সিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে! মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়[১১]

১৩৯১ সালে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কার্ত্তিক পৌষ সংখ্যায় 'হাংরি' অভিধার স্বীয় তত্ত্বটিকে গুছিয়ে বলেন মলয় -

> "এই সময়ে, মার্কসবাদের উত্তরাধিকার গ্রন্থটির জন্যে নোটস সংগ্রহ করা কালে, আমি অসওয়াল্ড স্পেংলার বর্ণিত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হদিশ পাই। ওই বয়েসে, স্পেংলারএ যে আকর্ষণ আমি খুঁজে পাই, তা হলো এই উপাপাদ্য যে, একটি সংস্কৃতি তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যায় ঃ আরোহণ, রেনেশাঁস ও অবক্ষয়। প্রথম ধাপে তা সৃজনশীল এবং বাইরে থেকে কোনো প্রভাব গ্রহণ করে না, রেনেশাঁসে অকল্পনীয়

উদ্ভাবনক্ষমতা এবং অবক্ষয়ে তা বহিরাগত সংস্কৃতির মুখাপেক্ষী। সেই সময়ে, ১৯৬১ সনে, অবক্ষয়ের এই কনসেপ্ট বঙ্গসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত লাগসই মনে হয়। সংস্কৃতিক অবক্ষয় ওরফে সর্বগ্রাস এই দার্শনিক সর্বগ্রাসে আরোপ হল চসার কথিত হাংরি। অবক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য হাংরি কথাটা। হাংরি শব্দের কোনো যুৎসই বাংলা আমি তখন খুঁজে পাইনি। ক্ষুধিত, ক্ষুৎকাতর, ক্ষুধার্ত'র মধ্যে হাংরির সামগ্রিক নির্ণয় পাইনি। পরে ১৯৬৪ নাগাদ, আলোচকদের বিদেশী এই চেঁচামেচিকে ঠেকনো দেবার জন্যে কখনও ক্ষুধিত বা ক্ষুৎকাতর ব্যবহার করেছিলুম।"[১২]

লক্ষণীয়, এখানে হাংরি কথাটির দুটি বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট ঃ (ক) অর্থনৈতিক ক্লিন্নতা। (না হলে মার্কর্সবাদের অনুষঙ্গটি থাকত না।) (খ) সার্বিক অবক্ষয়। স্পেংলারের 'ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট' তাই মলয়কে প্রভাবিত করে। একদিক থেকে মনে হয়, প্রাগুক্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ১৯৬২ সনে লেখা 'ফিরে এসো চাকা'র সমালোচনাটি থেকেই 'সর্বগ্রাস' পদটি মলয় গ্রহণ করেছিলেন। শৈলেশ্বরও তাই মনে করেন। বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা' গ্রন্থের আলোচনায় শৈলেশ্বর লেখেন, "ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ক্ষুধা এইভাবে তৃপ্তি খুঁজছে। সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের আত্মার প্রতিটি কোষে আজ বিরাজ করছে। বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' গল্পে সেই সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে।"[১৩] উপরন্তু লেখেন, "বস্তু সমূহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ই হাংরি জেনারেশন আন্দোলন।"[১৪] প্রদীপ চৌধুরীর মতে, "Keats, বলেছিলেন, No Hungry generation Can tread thee, immortal Bird! একজন লেখক এই অর্থেই হাংরি হতে পারেন। ব্যবহারিক জীবনের বা বুর্জোয়া জীবনের ক্ষুধা নয়, প্রতিটি লেখকই এই ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির, এই ক্ষুধা থেকেই যাবতীয় শিল্পের সৃষ্টি। Keats' এর এই immortal bird (শিল্প, শিল্পাদর্শ)-এর পিছনে ছুটতে ছুটতেই একজন লেখকের জীবন শেষ হয়ে যায়।"[১৫] প্রদীপ সম্ভবতঃ সৌন্দর্য ও শিল্পাদর্শের ক্ষুধার কথা বলেছেন। তবে তার সঙ্গে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যাদর্শকে মেলানো যায় না। বরং এর বিপরীত ব্যাপারটিই এখানে সত্য। তাই, মলয় এবং শৈলেশ্বরের বয়ান থেকে 'হাংরি জেনারেশন' পদগুচ্ছের যে, স্বাভাবিক বিশিষ্টতাগুলো স্পষ্টতা পায় তা অনেকটা এরকম ঃ

১) হাংরি হচ্ছে সার্বিক অবক্ষয়ের নির্বিচার বিস্তার প্রক্রিয়া। মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির এক অবক্ষয়ী সর্বগ্রাসিতা।

২) সামাজিক অসচ্ছলতার পটভূমিকায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। তা যে কোনো রূপের বা রসেরও ক্ষুধা।

৩) ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা। ভারত-আত্মার প্রতিটি কোষে তা বিরাজমান।

'হাংরি' অভিধাটির উৎপত্তি নিয়ে যেমন, মলয়, শৈলেশ্বর ও শক্তি প্রমুখদের মতানৈক্য তেমনই কে এই আন্দোলনটি শুরু করেছিলেন তা নিয়েও এঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। মলয় তাঁর নানা প্রবন্ধে, বিশেষ করে 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থে একরকম ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। শৈলেশ্বর ঘোষ তারই প্রতিবাদে 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন' নামে আর একখানি গ্রন্থ লিখেছেন। উত্তম দাশের 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' নামে গ্রন্থ বার হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন লেখক নানা পত্র পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ লিখেছেন। বার হয়েছে সমীর চৌধুরীর 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন'। কিন্তু এ সব গ্রন্থের প্রতিটিতেই একটি করে নির্দিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও মলয়ের দেওয়া তথ্য ও বিবৃতিকে নির্বিচারে মান্য করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা, কোথাও বা শৈলেশ্বরের বিবৃতি ও বিচারকে। সুতরাং বিষয়টিকে আমাদের পুনর্বিচার করতেই হবে। প্রথমে মলয়ের বক্তব্য —

> "হাংরি আন্দোলনের পরিকল্পনা আমিই করেছিলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে হাতে অফুরন্ত সময়। ..... ১৯৬১সন। ..... আমার চারপাশের বাস্তবের সঙ্গে দেখি বাংলা কবিতার কোনও সম্পর্ক নেই। পড়ে ফেলেছি ততদিনে পশ্চিমের ইমেজিষ্ট সিমবলিষ্ট স্যুররিয়ালিষ্ট ডাডাইষ্ট ফিউচারিষ্ট আন্দোলনের খবরাখবর। বাংলাভাষায় খোলস ঝেড়ে ফেলার জন্যে আন্দোলন দরকার। কিন্তু পাটনায় থেকে তা তো সম্ভব নয়। লালমোহন দাস সম্পাদিত 'ছোটগল্প' লিটল ম্যাগাজিনে একটা আনকোরা নাম আর ঠিকানা খুঁজে পেলুম ঃ হারাধন ধাড়া। আন্দোলনের জন্যে মনে হল এই নামটার ইমপ্যাক্ট হবে একেবারে নতুন।"[১৬]

নতুন কেন? মলয় পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, বর্ণহিন্দুর একাধিপত্যে এ ধরনের একটি প্রান্তিক নাম ও মানুষ একটি নতুন প্রবণতার সূচনা করবে। যদিও দেখা গেল যে, হারাধন ধাড়া ইতিমধ্যেই এফিডেফিট করে নিজের নাম করেছেন দেবী রায়। কারণ, হারাধন ধাড়া নামটা ভালো না। মন্বন্তরের দেবী সিংহ আর সীতাংশু রায়-এর পটভূমিতে তিনি নিজেকে তৈরী করেছেন — দেবী রায়। যাহোক, নিজের আন্দোলনের কথা মলয় দেবীকে বললেন। ঠিক হলো পাটনায় লিফ্‌লটের আকারে তাঁদের মুখপত্র ছাপানো হবে, ম্যাগাজিনের মতো করে নয়। ঠিকানা দেওয়া হবে দেবীর। শুরু থেকেই "সবরকম এলিটিষ্ট ব্যপার জলাঞ্জলি দিয়ে" এগোনো হবে। ইতিমধ্যে দাদা সমীর রায়চৌধুরীর সহায়তাও নিলেন মলয়। পাটনার তপন প্রিন্টিং প্রেস হাংরি শিরোনাম দেখে বুলেটিন ছাপতে রাজী হল না নানা আশংকায়। এবার 'জব প্রেস' থেকে হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিন ছাপানো হল। মলয় বলেছেন, 'হাংরি আন্দোলনের প্রথম আওয়াজ, কেন হাংরি শব্দের প্রয়োজন, আমরা কী করতে চাই, কেন হাংরি সময়।"[১৭] এই বুলেটিনের - বাঁ দিকে লেখা আছে

স্রষ্টা ঃ মলয় রায়চৌধুরী

লেখক ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ দেবী রায়

উপরে শিরোনাম — হাংরি জেনারেশন। ডানদিকে শুরু হয়েছে — "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্য কারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তি গ্রন্থন নয়। এখন এই সময়ে অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজনে এমনভাবে আর্বিভূত যে, জীবনের কোন অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন মেরু বিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্য সিদ্ধি।"[১৮] ইত্যাদি। দিনকতক পরেই, সেটা নভেম্বর ১৯৬১' ধুতি-শার্ট পরা দাড়ি-ওয়ালা চশমা পরা এক রুক্ষ্ম চুলের যুবককে সঙ্গে করে সমীর রায় চৌধুরী মলয়ের কাছে উপস্থিত। এই যুবকটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এঁর সঙ্গে মলয় হাংরি আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা বললেন। উৎসাহিত শক্তির সঙ্গে কিছু স্ট্রাটেজিও ঠিক হল। মলয় দেবীকে লিখলেন শক্তির কথা। টাকাও পাঠালেন লেখাপত্র ছাপাবার জন্যে। এবার ইংরেজিতে বুলেটিন ছাপলেন মলয়। তাতে লেখা হল, Creator - Maloy Roy Chowdhury, Leader - Sakti Chattopadhyay, Editor, Devi Roy. Published by Haradhon Dhara from 269 Netaji Subhas

Road, Howrah, West Bengal, India.[১৯] শক্তি তখন পাটনায় মলয়ের কাছে। কলকাতায় ফিরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'সম্প্রতি' পত্রিকায় ১৯৬২ সালে লিখলেন, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব।' হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা সেটি। যদিও বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো ঢাকা' বইয়ের আলোচনা-ই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটি গ্রন্থ-আলোচনা হাংরি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে ফেললো। শক্তি লিখলেন,

> "বিদেশে সাহিত্যকেন্দ্রে যে সব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে, কোনটি বীট জেনারেশন, কোনটি এ্যাংরি বা সোবিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলা দেশেও কোন অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে ক্ষুধা সংক্রান্ত আন্দোলন হওয়াই সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক পরিবেশ এ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বীট বা এ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোন রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস।' অর্থাৎ ভাত ডাল চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে এই আন্দোলন বীট জেনারেশন সমেত মেখে লঙ্কা ও নিমকের টাকনা দিয়ে গ্রাস করতে চায়। বদহজম সংক্রান্ত কথা উত্থাপিত হবে না আশা করি। কারণ বদহজমই হল শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য তার বমনই হল গদ্য পদ্য ছবি ইত্যাদি। গু গোবরের সামিল।"[২০]

পাটনায় বসে মলয় রায়চৌধুরী দেবী রায়ের পোষ্টকার্ড মারফৎ কলকাতায় ঐ সব লিফলেট, গ্রন্থ আলোচনা নিয়ে উত্তেজনার খবরগুলি পেতে লাগলেন। মলয় অবশ্য এটাকে আন্দোলন বলেছেন, যদিও সৃষ্টিশীল রচনার এখনও কোনো দেখা নেই। সেই সম্ভাবনা এবার দেখা দিতে শুরু করল। ঐ পোষ্টকার্ডেরই খবর - "সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপল কুমার বসু যোগ দিয়েছেন। বাসুদেব দাশগুপ্ত ফোন করেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে প্রদীপ চৌধুরী কবিতা ছাপাতে চান।"[২১] পাটনার আরেক তরুণ সুবিমল বসাক মলয়ের কাছে তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যকর্মে অংশভাক্ হতে চাইলে তিনি তাকে দেবী রায়ের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ করতে বললেন। তাছাড়া তখন সুবিমল চাকরিতে বদলি হয়েছেন কলকাতায়। এবার সুবিমলও কলকাতা থেকে

মলয় রায় চৌধুরীকে উত্তেজনার খবর পাঠাতে শুরু করলেন। কী সেই খবরগুলো? যথা, বুলেটিন দেওয়া মাত্রই কফি হাউসে অনেকে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেলেন। দেবীকে দলবদ্ধ প্রহারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সুবিমলকে শাসানো হচ্ছে নখে আলপিন ফোটানোর। কিন্তু কেন? তাঁদের কি সাহিত্যকর্ম ছাড়া অন্য কোনো দৌরাত্ম্য ছিল? তাঁরা বহিরাগত বলে? কেননা তাঁদের কোনো লেখা তখনও পাওয়া যায় নি। লিফলেটের মধ্যে প্রচারিত বক্তব্যগুলোই কি এই উত্তেজনার কারণ? মলয় জানিয়েছেন, ১৯৬১, সালে তিনি অন্য ধরণের, নিজস্ব ধরণের কবিতা খুঁজছেন। অর্থাৎ সাহিত্য আন্দোলন বলতে তো শুধু ইস্তাহার ও কর্মসূচী নিরূপণ নয়, নতুন ধরণের সাহিত্যকর্মও বটে। এবার সেইদিকে যাত্রা।

শৈলেশ্বর ঘোষ 'হাংরি' অভিধা ও হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতির কিছুটা ভিন্ন ইতিহাস জানিয়েছেন। তাঁর মতে 'হাংরি' অভিধাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া। কারণ হাংরি জেনারেশনের প্রথম লিফ্লেটে বলা হয়েছিল, 'Led rebelliously by Sakti Chattopadhay'.[২২] তাছাড়াও হাংরি আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে শক্তির সপক্ষে তিনি প্রাগুক্ত বিনয় মজুমদারের গ্রন্থসমালোচনাটির উল্লেখ করেছেন।[২৩] এ কথা ঠিক যে, হাংরি জেনারেশন প্রথম লিফলেট কোনটি এবং তা কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে ঐকমত্য সম্ভব নয়। মলয় যেমন বলেছেন, প্রথম বুলেটিন নভেম্বর ১৯৬১ সালে বার হয়েছে[২৪] ঠিক তেমনই উত্তম দাশ জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে হাওড়া থেকে তা বেরিয়েছিল।[২৫] ঐ সংখ্যা তিনি নিজে দেখেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তম দাশ মলয় রায় চৌধুরীর, 'ইস্তাহার সংকলনে'র প্রকাশক। এরকম হবার কারণ লিফলেট সংগ্রহ যোগ্য নয়, একাধিক লিফলেট ছেপে অন্যটিকে পরিবর্তন করা সহজ এবং লিফলেট ছাপানোও খুব সহজ। এ কারণেই 'উৎপল কুমার বসু ১৯৯৪ সালে একটি সাক্ষাৎকারে 'যোগসূত্র' পত্রিকায় বলেছিলেন - 'হয়তো ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুল, নাম দিয়ে দিল হাংরি জেনারেশন' বুলেটিন নম্বর ১২, হয়তো তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।[২৬] শৈলেশ্বর এই আন্দোলনের প্রস্তুতি ইতিহাসও অন্যভাবে লিখেছেন। তাঁর মতে, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর সূত্রপাত করেছিলেন খামখেয়ালের বশে। কোনো আদর্শগত বোধ ও সাহিত্য চর্চার লক্ষ নিজের দেওয়া সূত্রের মধ্যে তিনি করেননি। সংগঠিতও করেননি কাউকে। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুবান্ধব যেমন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, বিনয় মজুমদার, সৈয়দ সুস্তাফা সিরাজ হাংরি আন্দোলনের সূচনা অংশে কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছিলেন। মলয় লিখেছেন, "প্রথম দিকের বেশির ভাগ বুলেটিনে শক্তির কবিতা প্রকাশিত হয়, কিছু কবিতা তিনি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। সন্দীপন

আর বিনয়ের বেশি লেখা বেরোয়নি। উৎপলের বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।"[২৭] কিন্তু তাঁদের এই কবিতাগুলো ইতিপূর্বে প্রকাশিত অন্যান্য রচনার স্বগোত্র। কিংবা বাঁ হাতের রচনা। কোনো নতুন কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদের তীব্রতা - যা হাংরিদের বৈশিষ্ট্য তা এখানে মেলে না। শক্তি তো ইতিমধ্যেই বিখ্যাত, 'দেশ' পত্রিকার নামী কবি। সুতরাং হাংরি ধ্যান ধারণাকে কাব্যরূপ দেবার দায় তাঁর ছিল না। তাছাড়া ওঁরা ছিলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর। তাৎক্ষণিক খেয়ালে হাংরি বুলেটিনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় 'কৃত্তিবাসে' ভাঙন ধরেছিল। আসলে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু সমীর রায় চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক সূত্রেই মলয়ের সঙ্গে ওঁদের যোগাযোগ ঘটে। শৈলেশ্বর লিখেছেন যে, শক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এদিক থেকে হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে মলয়ের সংগঠনী ক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না। যাই হোক, হাংরি জেনারেশন 'কৃত্তিবাসে' ভাঙন ধরিয়েছিল। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ('কৃত্তিবাস' এর অন্যতম নেতা) তা স্বীকার করেছেন, "আসলে ভাঙন শুরু হয়েছিল দু' তিন বছর আগেই, যখন শক্তি, উৎপল আর সন্দীপন তথাকথিত হাংরি আন্দেলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।"[২৮] এ জন্যই পরে 'কৃত্তিবাস' কে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে, হাংরিদের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারও আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে হাংরি আন্দোলনের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছিল। ২১.১১.৬২-এই তারিখের হাংরি জেনারেশন বুলেটিনে তাঁর S.C এই ছদ্মনামে একটি ইংরেজি কবিতা প্রকাশ পেয়েছিল। কবিতাটির প্রথম লাইগুলি এরূপ ঃ

'Stop Hungry movement boys ...
Stop writing libidieous apocalptic
Stop symbolism, stop stop surrealism
stop stop stop stop, what, BOMB.'

কবিতাটির একদম শেষে লেখা ছিল - 'your faithful - anti Hungry poet'. 'এষণা' - পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৭০ সংকলনে সন্দীপন লিখেছিলেন, 'হাংরি জেনারেশন আমার cause নয়, আমি মনে করি সিক জেনারেশন, যদিও ৫ নং বুলেটিনে আমার একটি ছোট গদ্য বেরিয়েছিল।'[২৯] 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ২০ সংখ্যায় লেখা হয়েছিল,"... আমরা লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলুম যে হাংরি জেনারেশন নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। ... হাংরি নামে অভিহিত কোনো কোনো কবি কৃত্তিবাসে লেখেন, বা ভবিষ্যতে

অনেকে লিখবেন, কিন্তু অন্যান্য কবিদের মতোই ব্যক্তিগত ভাবে, কোনো দলের মুখপত্র হিসেবে নয়।"[৬] আবার 'কৃত্তিবাস' - সংকলন. ২'এর মুখবন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন "... কৃত্তিবাস লেখক গোষ্ঠীরই একটি অংশ হাংরি জেনারেশন নামে একটি আন্দোলন শুরু করে। প্রায় একই লেখক গোষ্ঠী হলেও কৃত্তিবাস পত্রিকা ঘোষিত ভাবে হাংরিদের সঙ্গে সম্পর্ক বিযুক্ত থাকে।"[৭] এই সব রচনা ও বয়ানের মধ্যে এত স্ববিরোধিতা যে, সত্যই বুঝতে অসুবিধা হয় হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে কে বা কারা নিয়ামক শক্তি? মলয় রায় চৌধুরী, দেবী রায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষিত ত্রয়ী? নাকি মলয় একাই? নাকি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তৎকালীন পরিচিতি? নাকি শক্তি, উৎপল কুমার বসু ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নাম মহিমা? লক্ষণীয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো এখানে অমিতাভ চৌধুরীও বলেছেন, "কৃত্তিবাস'-এর কয়েকজন লেখকের নেতৃত্বে যে 'হাংরি সাহিত্য'। সেটি শুধুমাত্রই ব্যর্থ অনুকরণ প্রচেষ্টায় দুর্বল বলেই আমার মনে হয় ..." ইত্যাদি।[৮] ১৯৭৪ সালে আদিল জুস্সাওয়ালা সম্পাদিত পেঙ্গুইনের 'New writings in India' গ্রন্থেও সন্দীপন সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "He was also responsible for starting the Hungryalist movement in Bengali along with Shakti Chattopadhya, the poet and Utpal basu, now in London."

সানফ্রানসিসকো থেকে প্রকাশিত City lights Journal পত্রিকার ৩নং সংখ্যায় 'Hungry Generation' নিবন্ধে Debi Roy and others' লিখেছেন যে, এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মলয় রায় চৌধুরী, দেবী রায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত ও উৎপল কুমার বসু। মলয় নিজে সর্বত্র চারজনের নাম করেছেন - শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায় ও মলয় রায় চৌধুরী।[৯] এ সব থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সাংগঠনিক অব্যবস্থার ছবিটি আমরা পাই। উৎপল কুমার বসু বলেওছেন,

> হাংরি জেনারেশন সে ভাবে কোনো সংগঠিত আন্দোলন ছিল না। যার খুশি, যেখান থেকে পারে হাংরি জেনারেশন নাম দিয়ে বুলেটিন বের কর বাজারে ছেড়ে দিত। এই আন্দোলন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। কতকগুলো ফতোয়া মলয়, সমীর শক্তি লিখেছিল। ... হয়তো ত্রিপুরা থেকে একটা কাগজ বেরুলো, নাম দিয়ে দিল হাংরি জেনারেশন বুলেটিন নম্বর ১২। হয়তো তার ১০ বা ১১ বেরোয়নি।[১০]

এ সব কারণে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ১৯৬১-৬৩ পর্বটিকে বলা যায় সলতে পাকানোর কাল। হাংরি জেনারেশন এই সলতে পাকানোর কালে কিছু তাত্ত্বিক সূত্র মলয় রায় চৌধুরী ১৯৬১ সাল থেকে রচনা শুরু করেন। কেন একটি সাহিত্য আন্দোলন দরকার, সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্যই বা কী, করণীয় কী এ সব নিয়ে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অনেকগুলি ইস্তেহার বা প্রচারপত্র বিলি করেন তিনি। এগুলিরই কিছু অংশ পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে 'ইস্তাহার সংকলন' নামে 'মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা' থেকে বার হয়। আবার এগুলিরই সূত্রসমবায়ে মধ্যবর্তী সময়ে, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে পাটনা থেকে আর একটি পুস্তিকা বার হয়েছিল। তার নাম "মৃত্যু মেধী শাস্ত্র ঃ প্রথম ইনষ্টলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন।" প্রকাশক ছিলেন মলয় স্বয়ং।

ঐ পুস্তিকায় মলয় তাঁদের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষকে সুনির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তবে আন্দোলনের বিষয়-ভূমি হিসেবে কবিতাই কেবল ধর্তব্য ছিল। কবিতার অমোঘতা বা অনিবার্যতার কথা সেখানে তিনি সজোরে বলেছিলেন। এত কাল ধরে বাংলাভাষায় কোন কোন ধরণের কী কী কবিতা লেখা হয়েছে, যুগ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেগুলির কতটুকু সার্থকতা বা ব্যর্থতা তা নিজস্ব যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে মলয় বিশ্লেষণ করেছেন। পুস্তিকাটির প্রথম পংক্তিটি শুরু হয়েছে ইতিহাস ও তত্ত্বের একটি আপাত মোড়কে। যে তত্ত্বটি প্রথম পংক্তিতে মলয় উপস্থাপিত করেছেন তা সম্পূর্ণ রূপে আত্মস্থ করতে পাঠককে পৌছতে হবে গ্রন্থের অতিসংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পরিচ্ছদে। প্রথম পংক্তিটিতে মলয়ের বক্তব্য এরূপ ঃ "র‍্যাশনালিজম ও রোম্যান্টিসিজমের যুদ্ধ বাংলার শিল্প সাহিত্যকে রেখে গেছে এক শূন্য প্রান্তরে, রক্তের দাগটা আরম্ভ হয়েছে সেখানে থেকে, সেখান থেকে প্যারেনথেসস।"[৩৫] এরপর র‍্যাশনালিষ্ট ও রোম্যান্টিকরা কী কী করেছেন তা আধাবিমূর্ত্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন প্রবন্ধকার। বলেছেন যে র‍্যাশনালিষ্টরা অগ্রবর্তী, রোম্যান্টিকরা উত্তরকালীন। প্রথমোক্তরা কবিতায় মস্তিষ্ক এবং দ্বিতীয়েরা কবিতায় হৃদয়ের ব্যবহার করেছিলেন। এই দুটো প্রবণতাকেই মলয় বলেছেন "কাটা হাতের যাত্রা সঙের টানা হ্যাঁচড়া।"[৩৬] তাই 'ইতিহাসের মাঠ পড়ে রইল শেষে তার শূন্য জঠর নিয়ে। দু একটা মস্তিষ্কবাহী অথবা হৃদয়ধারী লাশকে দেখা গিয়েছিল এক আধবার নড়ে উঠতে।"[৩৭] এসব দ্বারা মলয় বলতে চান যে, বাংলা ভাষায় এ কালে যথার্থ সৃজনশীল কবিতার আবির্ভাব ঘটেনি; 'শূন্যপ্রান্তর', 'শূন্য জঠর' প্রভৃতি শব্দাবলী প্রবন্ধকারের এই মানসিকতার দ্যোতক। র‍্যাশনালিষ্ট ও রোম্যান্টিকদের যুদ্ধের কাল পর্ব হিসেবে

তিনি যে উত্তর রবীন্দ্রপর্বের আধুনিক কালকেই বুঝিয়েছেন এটা গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্পষ্টীকৃত হয়েছে।

মলয় বাংলা কবিতার মূল্যায়নে মধুসূদনকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, "র‍্যাশনালিষ্ট ও রোম্যান্টিকদের যুদ্ধের আগে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে একজন বাঙালী কবির আবির্ভাব হয়েছিল, আজ পর্যন্ত যাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নি, সেই কবি, বহুকাল আগেই, ফেলে দিতে চেয়েছিলেন মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে।"[৩৮] মলয় বলতে চান যে, মধুসূদন র‍্যাশনালিষ্ট বা রোম্যান্টিক কোনো প্রকোষ্ঠের মধ্যেই পড়েন না। মস্তিষ্ক বা হৃদয়েরও চেয়ে মধুসূদনের প্রবল ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা তাঁর কাব্যাবলীতে প্রতিফলিত। তাঁর প্রাণশক্তি তাঁর কবিতারও প্রাণশক্তি। বাংলা ভাষা থেকে কবিতার এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গিয়েছিল। বাঙালী কবিরা মধুসূদনের এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন নি। অতঃপর মলয় লিখেছেন - 'মধুসূদনের পর আরেকজন কবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম জীবনানন্দ"[৩৯] এই স্তর বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। বিদ্রোহ পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথ নেই। তবে তাঁকে একটি যুগ হিসেবে দেখা হয়েছে। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের কাঁধের উপর দিয়ে দিগন্তে একবার তাকানো উচিত ছিল এঁদের, দু'চোখ খুলে।"[৪০] এঁদের বলতে জীবনানন্দ ব্যতীত অন্যান্য রবীন্দ্রোত্তর কবিদের বোঝানো হয়েছে। মলয় এসব কবিদের মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় এবং বুদ্ধি ও আবেগের দোলাচলতা লক্ষ করেন। বাংলা কবিতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা, বিশ্লেষণের এটাই পদ্ধতি মলয়ের। তাঁর মতে প্রথাগত, ইতিহাস বিচার অর্থহীন, কারণ তা ধারা বিবরণী মাত্র। তিনি সাহিত্যের অর্জনকেই (achievement) বলেন, 'ইতিহাসের সীমানাচিহ্ন।' বলেন, "অনেকেই তো ধারাবিবরণী আর ইতিহাসের পার্থক্য জানেনা।"[৪১] মলয় কথা বলেন এ কালের জমিতে দাঁড়িয়ে। তাঁর মতে, কবিতা এখন বিশাল নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে। অ্যারিষ্টটলের বাস্তবতা এখন অচল। লখিন্দরের ট্রাজিক লোকায়ত উপাখ্যান বা রবীন্দ্রনাথের দুঃখের শান্তিমূল্য আর লেখা হতে পারে না। তিনি জানান - 'শিল্প এখন পবিত্র সন্ত্রাসে স্নিগ্ধ।' শুধু বিষয় বা মেজাজের দিক থেকে নয়, কবিতার আঙ্গিকেও আর চলতি নিয়মে থাকবে না। তাঁর ভাষায় —

> কবিতা মার্বেল নয় - কবিতা রসটসের ব্যাপার নয়। কবিতা কবিতা। শিল্পীর কাছে যা বিষয়বস্তু সেটাকেই ফর্ম বলে মনে করে থাকেন তাঁরা যাঁরা নিজের রক্তে হাত ডুবিয়ে শিল্পকে পান নি। সে জন্যই এখন শব্দ ও অর্থের ধাক্কাধাক্কি ফাটাফাটি ও টানাপোড়েনে একটি কথার

আবির্ভাব হয়, নিখুঁত কথা, পথ চলতি অর্থের ঢাকনি খুলে অপূর্ব কৌটোর মধ্যে থেকে বের করে আনা গূঢ় হায়ারোগ্লীফ।[৪৩]

বোঝাই যায়, আদিমতার দিকে কবিতার ভাষা ও বিষয়কে নিয়ে যেতে চাইছেন মলয়। পুরনো আন্দোলনগুলি থেকে মুক্তি চাইছেন কবিতার। তাই বলেন, বাস্তববাদ, চেতনাপ্রবাহ, পরাবাস্তববাদ আর এদের কোনো ক্ষমতা নেই কবিতাকে নিয়ন্ত্রণ করার, এরা বড্ড বেশী বুড়ো হয়ে গেছে।[৪৪] আর কবিতা হচ্ছে সত্যের প্রতিরূপ। তবে তা রবীন্দ্রনাথের 'সত্য' নয়। অনিয়ন্ত্রিত এই সত্য আকাঁড়া বাস্তব। মলয় বলেন, "সত্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কখনও যায়নি। কবিতা তাই এখন এতো স্ট্রেটফরোর্য়াড।"[৪৫] সৌন্দর্য চর্চাও কবিতায় এখন বাহুল্য ছাড়া কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চাশ ও ষাট দশকের অন্য কবিদের আঘাত করেছেন। বলেছেন, "প্রেম, দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ সংযম এগুলি, ওই যুদ্ধের পর, কেমন যেন ন্যাকামি আর ছেনালীতে বদলে দিয়ে গেল ঐ সময়কার কবিতা।"[৪৬] এরপর মলয় এসেছেন কবিতার মানবিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গে। মূল্যবোধের চেয়েও আমাদের দৈনন্দিন ভয়াবহ অস্তিত্ব-যন্ত্রনাই কবিতার উপজীব্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন -

> "দিনের পর দিন, আমাদের চোখের সামনেই টানটান হয়ে বেড়ে যাচ্ছে কলকাতা। অথচ অস্তিত্ব যে ইহকালীন। যা হয়নি, বাস্তবে যা নেই তাকেই কি মূল্যবোধ বলা হয়ে থাকে? তবু মানুষ একা একা অপেক্ষা করে, একটা মেটাফিজিক্যাল ভ্যাকুয়ামের শরীর নিয়ে পড়ে থাকে, পড়ে থাকে চুপটি করে বিশাল পাইথনের মতন। মৃত্যু পর্যন্ত সে হাঁ করে থাকে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত।"[৪৭]

গ্রন্থটিতে পরের দিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, হাংরি কবিতা এই তথাকথিত মানবজীবন পর্বের উপাখ্যান।

র‍্যাশনালিজম ও রোম্যান্টিসিজমের যে যুদ্ধের কথা মলয় গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন - যার প্রেক্ষিত এবং সময় উল্লেখ করেননি - তা শেষ পর্যন্ত ছোট্ট চারটি লাইনে সূত্রায়িত করেছেন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। ঐ চারটি লাইনেই একটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ : "বিহারীলালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে আমি র‍্যাশনালিজমে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। বিহারীলাল থেকে কল্লোল কালের পূর্ব পর্যন্ত র‍্যোম্যান্টিসিজম। তারপর কল্লোল কাল থেকে ওদের যুদ্ধ ঠিক আমাদের আগেকার সিনটুকু

পর্যন্ত। আমাদের কাল ১৯৬২ থেকে।" মলয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী থেকে ১৮৬২ র‍্যাশনালিজম পর্ব, ১৮৬২ থেকে ১৯২৩ রোম্যান্টিসজিম, পর্ব। ১৯২৩ থেকে ১৯৬১ র‍্যাশনালিজম ও রোম্যান্টিসিজমের যুদ্ধ।[৪৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৬২ সালেই 'সংগীত শতক' কাব্যগীতি নিয়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তাঁর গদ্য গ্রন্থটিকে কাব্য আলোচনায় ধরা হচ্ছে না যেটি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব। রোম্যান্টিসিজম ও ন্যাশনালিজমের যুদ্ধের পর্বে ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ এবং ষাটের কিছু নামী প্রতিষ্ঠিত কবিদের তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দকে পৃথক করা হয়েছে। রোম্যান্টিসিজম পর্বে একইভাবে রবীন্দ্রনাথকেও আলাদা করা হয়েছে। বাকী কবিদের মলয় তত গুরুত্ব দিতে চান নি। পুস্তিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবিতা কী, বিশেষ করে হাংরিদের কবিতার বিষয়বস্তু কী মলয় তাই ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন,

> কবিতা মানুষের সম্পূর্ণ একলার জিনিস ... জীবনের সমস্ত পুঁজ রক্ত, লালা, কফ, শ্লেষ্মা এই সমস্ত নিয়েই কবিতা ... কবিতা মানুষর অনিয়ন্ত্রিত বোধের সংযমহীন আত্ম উপস্থাপন বলে, অকবিরা পয়ারের লুব্ধ নপুংসকতায় কর্তিত পৌরুষ নিয়ে হামাগুঁড়ি দিতে চায়। আমি কী? আমি কে? আমি কেন? আমি কেমন করে? আমি কোথায়? এই সকল প্রশ্নের চোট ও বিস্ফোরণ ছাড়া কবিতার আর কিছু করার নেই। অস্তিত্বের সমস্ত অসম্ভবকে চিরে তার অন্তরমহল দেখার নিদারুন অপ্রতিহত চেষ্টা থেকে কবিতা। আমিই আমার থিম।[৪৯]

অর্থাৎ ব্যক্তির সত্তা সন্ধান এবং সেই অর্থে আত্ম সত্তা নির্মাণই কবির কাজ। এ কথা স্বীকার্য, কিন্তু নতুন কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ একেই একসময় বলেছিলেন 'আত্মপ্রকাশ'। 'আত্মপ্রকাশ' নিয়ে বিরোধ হয়েছিল লোকেন পালিতের সঙ্গে,[৫০] কেননা তা হলে সমস্ত বস্তুগত কবিতা বাদ পড়ে। এখানেও সেই সমস্যা। যাইহোক, এরপর মলয় বলেন যে, মানুষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান একটা প্রাণী। তারই জন্য মুখ হাঁ করে তার অপেক্ষা - এটাই ক্ষুধা। তাঁর ভাষায় —

> হাঁয়ের ভেতর গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য, খাদ্য, অখাদ্য, সমস্ত কিছুকে টুপটাপ ফেলে দিতে হবে, দিলে টোটালিটি নিজের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, পরিষ্কার

> হয় মেটাফিজিক্যাল সর্বগ্রাস। ... বেঁচে থাকার কোনো কজ নেই জানার পরেও মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকে, মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর জন্যে জীবনপাতী শ্রম করে যায়, বেঁচে থাকে, কারণ, ব্যক্তিজীবনের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যে ভ্যাকুয়াম, যে ক্ষুধা, যে ওয়েটিং নাথিংনেস, যে অজানা অপেক্ষা, যে যাত্রা, যে ক্ষুধা তা তাকে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে বলেই কবিতার প্রয়োজন হয়।[৫১]

শুধু শূন্যতা বোধ নয়, আতঙ্কের কথাও বলেছেন তিনি। এসব দিক থেকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'সত্য' নিয়েও মলয়ের ব্যাখ্যা আছে। তাঁর মতে সত্য হল 'স্ট্রেট ফরোয়ার্ড চিত্ত বিকার' এবং ভণ্ডামীর উন্মোচক। কেননা, "প্রেমহীন আকস্মিক অনাচারের আচারকে তাই বলা হয় বিবাহ; আর অবিবাহিতা প্রেমিকাকে রক্ষিতা বলা হয়ে থাকে সভ্য সমাজে কৃত্রিম নিয়ম কানুনের ভাঁওতার উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই আধুনিক সভ্যতায়।"[৫২]

মলয়ের মতে কবিতার মধ্যে এক ধরনের সদর্থকতা আছে। 'অস্তিত্বের অ্যাবসার্ড অসুস্থতা' বা শূন্যতার নঞর্থকতা সত্ত্বেও কবিতাসৃষ্টি কালে "সমস্ত শব্দাবলী নতুন ও ভিন্নতর হয়ে ওঠে। পুরাতন পচা ব্যবহৃত চট ওঠা ক্ষয়ে যাওয়া, শব্দ দিয়ে আর কবিতা সম্ভব নয়।"[৫৩] এই যে হয়ে ওঠা, এই যে নতুনত্ব - তা সদর্থক বটে। তাঁর মতে, হাংরি এইসব প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে বা করার চেষ্টায় নিয়োজিত। যখন তিনি বলেন

> আমাদের কবিতা, লিরিক, ওড, ব্যালাড, সনেট পয়ার অনুগত ভাঁড়ামো নয়। আমাদের কবিতা মানে হাংরি কবিতা, স্ট্রেট ফরোযার্ড সত্য, কেননা, প্রতিটি রিপুকে চেতনায় একত্রিত করে তাদের একযোগে বিস্ফোরণ ঘটানোই হল শিল্প। .....কাগজের ওপর পেতে দেওয়া নিজের ছেঁড়া জিভকে আমি হাংরি কবিতার সিনট্যাকস বলি।[৫৪]

তখন অনেকখানি র‍্যাঁবোকে মনে পড়িয়ে দেয়। ১৮৭১ সালে পল দেমিনিকে র‍্যাঁবো পত্রে লিখেছিলেন, From Ennius to Theroldus, from Theroldus to Casimir Delavigue, its all rhymed prose, a game, the enfeeblement and glory of countless idiotic generations এবং

This (new) Language would be of the soul, for the soul containing everything, smells, sounds, colours, thought latching on to thought and pulling.[৫৫]

মলয়ও বলেন, "ঘরের দেয়ালে বসানো পঁচিশটা আয়নার প্রতিফলিত নিজের পঁচিশটা অবয়বের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে হয় এর মধ্যে কোনটা প্রকৃত আমি। ... শিল্প আত্মীয়তার ব্যাপার, অনুকরণের নয়।"[৫৬] মানে কৃত্রিমতা থেকে স্বতস্ফূর্ততার দিকে যাত্রা। আধুনিকতার একটা ধরণকে অস্বীকার করা। অন্তরাত্মার বহিঃপ্রকাশকে উপজীব্য করা। তাই এযুগে কবিতার প্রয়োজন বেশি করে অনুভব করেছেন তিনি। বলেছেন, "কবিতা বিহীন হয়ে শিল্পবিহীন হয়ে বেঁচে থেকে লাভ?"[৫৭] এতক্ষণ ধরে নিজের আলোচিত বিশ্লেষণকে তিনি পরে একটি দীর্ঘায়িত সংজ্ঞার্থে বিন্যস্ত করেন,

> কবিতা এখন আমাদের পূর্বজদের জীবনের বৈপরীত্যে, আত্মস্থ; সে আর জীবন হতে বিচ্ছিন্ন কমলকামিনীদল চর্চা নয়, অতিপ্রজ অন্ধবল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে অভিভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। জীবনের কোনো মানে নেই। কোনো ষ্টাইল নেই। তাই, এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্যসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা পৃথিবী বিরোধিতার নয় কেবল, তা মানসিক, দৈহিক, শারীরিক এবং মেটাফিজিক্যাল। এ ক্ষুধার লালনকর্ত্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কি আছে আর জীবনে! মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা ছাড়া মানুষের আর কেউ নেই আজ, কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়"[৫৮]

আবার এই কবিতায় মলয় খুঁজেছেন সমস্ত রকম নিষিদ্ধতার মধ্যে অন্তর্জগতের গুপ্তধন, কবিতায় দেখতে চেয়েছেন "বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার মেটাফিজিক্যাল সর্বগ্রাস,"[৫৯] চেয়েছেন "নৈরাত্ম্যসিদ্ধি।" একক ব্যক্তিসত্তার অতল শূন্যতাকে দৃপ্তভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন কবিতায়। বলেছেন কবিতার চিত্রকল্প হবে যেন বলাৎকারের দৃশ্যপরম্পরা। এই কবিতাকে তিনি আধুনিক বলতে নারাজ। ঐ শব্দকে তাঁর মনে হয় পুরনো এবং সেকেলে। বলেন, 'আধুনিকোত্তর'

শব্দের প্রতিশব্দে এখানে হাংরি। কবিতা, ব্যক্তির তীব্র অসহ খামখেয়ালের সংযমহীন স্টাইল।"[৬০] কবিতার কাব্যময়তা ও মনন বিলাস উভয়কেই বর্জনীয় মনে করেছেন মলয়। ঈশ্বরভাবনাকে তিনি নস্যাৎ করেছেন, ধর্মকে করেছেন পরিত্যাগ। তাঁর ভাষায় "মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, নৈঃশব্দ্যকে আড়াল করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর 'মেঘনাদ বধ'-এ তাঁর পূর্বজদের সমস্ত মূল্যবোধের নব মূল্যায়ন সূচিত ... একালে, সিডাকশান ছাড়া চার্চে অথবা মন্দিরে মানুষ, যায় না।"[৬১] এই পরিস্থিতিতে মলয়দের আবির্ভাব, তাঁদের হাংরি কবিতার আবির্ভাব। ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে মলয় ব্যাখ্যা করেছেন এ ভাবে "ধর্মকে টেনে হিঁচড়ে প্রথমে আলাদা করে দিয়ে গেল, র‍্যাশনালিজম, এবং তারপর, রোম্যান্টিসিজম্ ছিঁড়ে পৃথক করে রেখে গেল চেতনাকে। সব শেষ, রাবীন্দ্রিক আইডিয়ালিজমের হাতে মার খেয়ে খেয়ে যার ধকল এখনও চলেছে - কবিতা ক্রমশঃ একটা টোটকায় পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।"[৬২] এমনকি তৃতীয় পর্বে যখন উক্ত দুটি পর্বের দ্বন্দ্বের কাল, যখন সেই কালের একজন অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা বুদ্ধদেব বসু বলেন, "শিল্পমাত্রই রচিত এবং সেই অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু আধুনিক কবিতা অন্তত পক্ষে স্বাভাবিকের অভিনয় করে, আর সংস্কৃত কবিতা সদম্ভে ও নির্লজ্জভাবে কৃত্রিমতাকে অঙ্গীকার করে নেয়।"[৬৩] তখন মলয় সেখানে প্রতিবাদ করেন যে বুদ্ধদেবদের কবিতাতেও যথেষ্ট কৃত্রিমতা আছে। আর যে জন্যেই নতুন ধরণের কবিতা, হাংরি কবিতার প্রয়োজনীয়তা। মলয়ের বর্ণনাভঙ্গী এরকম ঃ "এখন এ সময়ে, আমাদের কালে, মানুষ যখন মস্তিষ্ক ও হৃদয় ফেলে দিয়েছে, দিয়ে, নিজের অ্যাবসল্যুট টোটালিটি নিয়ে দাঁড়িয়েছে বিশাল এক নগ্নমূর্তির মতো দিগন্তের ওপার দু-পা ফাঁক করে, দাঁড়িয়ে গোরিলার মতো দুই হাতে গুম্ গুম্ গুম্ শব্দে চাপড়ে যাচ্ছে তার যন্ত্রণা-দগদগে বুক, শিল্পে আর কৃত্রিমতা সম্ভব নয়, উঁহু। আর সম্ভব নয়।"[৬৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে এসে মলয় তাঁদের প্রজন্মের কবিতায় কী কী চাইছেন তার একটি ১৪ দফা তালিকা পেশ করেছেন। যথাক্রমে তা এরকম ঃ

১। আমার সম্পূর্ণ আমিত্বের বর্বর আবিষ্কার।

২। কবিতা চলাকালীন আমার সম্মুখে আমাকে এবং আমার সমস্ত কিছুকে যত রকম ভাবে পারা যায় উপস্থাপিত করা।

৩। কবিতায় আমাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আটক করে করে দেওয়া যখন আমি কোনো না কোনো কারণে ফেটে পড়েছে আর আমার ভেতর দিকটা বেরিয়ে পড়েছে।

৪। নিজস্ব আমিত্ব দিয়ে প্রতিটি মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ, তারপর স্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যান।

৫। সমস্ত কিছুকে বস্তু মনে করে আরম্ভ এবং প্রত্যেকটিকে নাড়িয়ে দেখে নেওয়া প্রাণবন্ত কিনা।

৬। সামনে এসে পড়া ব্যাপারকে অ্যাজ ইট ইজ গ্রহণ না করে তার প্রত্যেকটি দিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা।

৭। পদ্যচ্ছদ ও গদ্যছন্দ উভয়েরই অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটা ষ্ট্রেট-ফরোয়ার্ড নিজস্ব ডিকশনের ব্যবহার।

৮। কথা বলার ধরন হুবহু কবিতায় তুলে ধরা।

৯। কথা বলার সময় শব্দের ভেতরে যে ধরণের ধ্বনি পুরে দেওয়া হয় কবিতাতে সেই ধ্বনিকে আরও চাঁছাছোলা করে রিভিল করা।

১০। পাশাপাশি দুটি শব্দের এতাবৎকালের প্রতিষ্ঠিত আঁতাত ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেওয়া এবং তদ্বারা অসবর্ণ ও অবৈধ শব্দ এবং বাক্য তৈরী।

১১। বহুল প্রচলিত কাব্যিক শব্দাবলী পরিত্যাগ - কবিতাকে নিজেই অরিজিনাল হতে দেওয়া।

১২। কবিতাই মানুষের সর্বশেষ ধর্ম, সে ব্যাপারটা খোলাখুলি স্বীকার করা।

১৩। অসহ্য অস্তিত্বের বিবমিষা ও ডিসগাষ্ট আগা গোড়া কবিতায় সঞ্চারিত করা।

১৪। ব্যক্তিগত আলটিমেটাম।[৬৫]

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মলয় কবিতার ক্ষমতার প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই ক্ষমতা হল ভাঙবার ক্ষমতা। নির্মাণের জন্যেই ভাঙচুরের দরকার ঘটে। সমাজ অবশ্য এতে ভয় পায়। কিন্তু কবির তাতে কিছু করবার নেই। কবিতা সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলনা বলেই তা শিল্প। কবিতা-মলয়ের মতে প্রতিক্রিয়া নয়, ক্রিয়া; একটি বিপ্লবী ক্রিয়া। তবে রাজনৈতিক অর্থে নয়। এক ভয়ংকর সময়ের তা নৈরাজ্যলিপি।

ষষ্ঠ এবং শেষ পরিচ্ছেদে মলয় কবিতাকে নিরাদর্শের উপর স্থাপন করেছেন। বাণীবিহীনতা (messagelessness) যে কবির ধর্ম তা বলেছেন। বলেছেন, "মানুষকে এখন উপদেশ দেবার

মতো কিছু নেই, সমস্তই সে জেনে ফেলেছে, ক্লান্ত হয়ে গেছে ওসবে, উত্তরক্লান্ত।"[৬৬] সমাজ, যূথবদ্ধতা, যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ সব আজ অর্থহীন, নিষ্ক্রিয়। মলয় বলেন, "প্রাগুক্ত সকল যুগ চলে যাবার পর, শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই থাকে না, এক বিরাট ক্ষমাহীন সর্বগ্রাস, যার মধ্যে মানুষ একা একা নিজেকে খুঁজে বেড়ায়।"[৬৭] হাংরি জেনারেশনের কাব্য একক মানুষের এই অন্বেষণের কাহিনী - মলয় এমনটাই বলতে চান।

মলয় তাঁর গ্রন্থে এভাবে তাঁর প্রজন্মের নতুন কাব্য দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নয়, নিজেদের উপর মধুসূদন ও জীবনানন্দের ব্যক্তি প্রতিস্বের উত্তরাধিকার অর্শেছেন। তবে অবশ্যই অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণার পটভূমিকায়। একদিক থেকে মধুসূদন ও জীবনানন্দ ছিলেন আত্মঘাতী, হাংরিরাও তাই। জীবন যেহেতু অনিবার্য মৃত্যুর জন্য ক্ষুধার্ত অপেক্ষা ছাড়া কিছু নয় (মলয়ের তত্তানুযায়ী), তাই হাংরিদের কাব্যদর্শন বা তত্ত্বের তিনি নাম দিয়েছেন মৃত্যু মেধী শাস্ত্র। মৃত্যু যেন যজ্ঞ তবে পৌরাণিক অর্থে নয়, উৎসব অর্থে। শুধু মৃত্যু নয়, নৈরাজ্যেরও উৎসব, ধ্বংসের উৎসব। লক্ষণীয়, আরেক হাংরি কবি শৈলেশ্বর ঘোষের একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থেরও নাম 'উৎসব'। যাই হোক, মলয় রায় চৌধুরীর এই গ্রন্থে এ ভাবে হাংরি জেনারেশনের কাব্যতত্ত্ব ও কবির অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'ইস্তাহার সংকলন' মলয় রায় চৌধুরীর দ্বিতীয় তত্ত্ব গ্রন্থে। আসলে, সাকুল্যে নটি ক্ষুদ্রাকৃতি রচনার সমাহার। এগুলির নাম ও প্রকাশ কাল এরূপ - ১) কবিতা - (১৯৬১) ২) উদ্দেশ্য - (১৯৬২) ৩) ছোট গল্প (১৯৬২) ৪) রাজনীতি - (১৯৬৩) ৫) ধর্ম (১৯৬৩) ৬) জীবন (১৯৬১-৬৪) ৭) অশ্লীলতা - (১৯৬৫) ৮) আন্দোলন - (১৯৬৫) ৯) স্বাধীনতা - (১৯৬৫)। এর মধ্যে 'জীবন','অশ্লীলতা', 'আন্দোলন', এবং 'স্বাধীনতা' কে প্রবন্ধও বলা যায়। বাকীগুলো শুধুই প্রচার পত্র। মলয়ের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মৃত্যু মেধীশাস্ত্রে' ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সালের প্রচারিত ইস্তাহারগুলির একটি সমন্বিত ভাষ্যরূপ পাওয়া যায়। 'জীবন' প্রবন্ধটিকে আবার বলা যায় মলয়ের প্রথম গ্রন্থের একটি সারসংক্ষেপ। কেননা 'জীবন' রচনাটিকেই উক্ত গ্রন্থে মলয় বিশদীকৃত করেছেন। এই রচনায় 'কবিতা' শীর্ষক প্রচারপত্রটিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মলয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থের আলোচ্য হতে পারে বাকী সাতটি রচনা। এদেরও মধ্যে আবার 'উদ্দেশ্য', 'ছোটগল্প', 'রাজনীতি' ও 'ধর্ম' হলো নির্দেশ মূলক। 'উদ্দেশ্য' নামক ইস্তাহারটিতে মলয় নয়টি নির্দেশ দিয়েছেন যার সার কথা হল অ্যারিষ্টটলের বাস্তবতাকে নকল না করে নৈরাজ্যমূলক সক্রিয়তা আনতে হবে, নিজের কথা বলতে হবে। নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে ইত্যাদি। 'ছোটগল্প' শীর্ষক ইস্তাহারে ছোটগল্পের নতুন সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন মলয় - "ছোট গল্প আসলে

বর্ণনাবিরোধী সূক্ষ্ম একরকমের চোট, মানুষের ছোঁকপ্রবৃত্তির প্রসার।"[৬৮] কিংবা "আজকের ঠুনকো জীবনের আচ্ছন্ন সক্রিয় অরাজকতার স্ফটিক হয়ে উঠবে ছোটগল্প ঃ দৃষ্টির অতীত যে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বাসঘাতী অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ উদ্ভাস তার এলোমেলো খাবল; এটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা অস্তিত্বের আঘাত নেবার জন্য নিজেদের ক্ষত তুলে ধরেছেন।"[৬৯] 'রাজনীতি' শীর্ষক ইস্তাহারে মলয় জানাচ্ছেন যে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের আত্মাকে রাজনীতি মুক্ত করা হবে। প্রাতিস্বিক মানুষকে বোঝানো হবে যে অস্তিত্ব প্রাক রাজনৈতিক। কোনো ধরনের রাজনীতিককেই শ্রদ্ধা করা হবে না; তাই বলে রাজনীতি থেকে পালানোও হবে না। রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারাই পাল্টে দেওয়া হবে। 'ধর্ম' শীর্ষক ইস্তেহারে মলয় ঈশ্বরকে জঞ্জাল বলে ঘোষণা করেছেন। ধর্মকে তিনি মস্তিষ্কবিকার ও নেশাও বলেছেন। বলেছেন, 'ধর্ম হচ্ছে বস্তু এবং অবস্তুকে দখলে রাখার মন্তর, তাদের সঙ্গে লেপটে থেকে মানিয়ে নেবার চালাকি।'[৭০] এও বলেছেন যে, নিজের রক্তমাংসে না বেঁচে অন্যের বানানো বিশ্বাসে বেঁচে থাকাই ধর্ম। সুতরাং প্রচলিত এই ধমর্কে মলয় গালিগালাজ করেছেন। পরে, এক নতুন ধর্মের কথা বলেছেন - যা ব্যক্তিবাদী মানবধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, তিনি বলেছেন, "ধর্ম মানে আমার সঙ্গে আমি, আমার আমি, আমার থেকেই আমি, আমার দ্বারা আমি, আমাকে বাদ দিয়ে আমি এবং আমিই আমি।"[৭১] 'অশ্লীলতা' - শীর্ষক ইস্তাহারটিকে পূর্বোক্তগুলোর মত শুধু নির্দেশ বলে একপাশে না রেখে প্রবন্ধরূপেও বিবেচনা করা যায়। এখানে মলয় জানিয়েছেন যে, অশ্লীলতা বলে কিছু নেই। একদল শ্রেণী সচেতন ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিষ্ঠানিক মুরুব্বী তাঁদের শ্রেণীগত সংস্কৃতি ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে বাঁচাতে এই অশ্লীলতার তত্ত্বটি নির্মাণ করেছে। মলয় বলেন, "সমাজের মালিকেরা একটা নুলো ভাষা তৈরী করে, নীচু শ্রেণীর শব্দাবলীকে অস্বীকার করতে চায় যাতে বিভেদ রেখাটা পরিষ্কার থাকে।"[৭২] বলেন, "অশ্লীলতা অভিজাতদের সংস্কার যারা নীচুতলার উন্নত সংস্কৃতির কৃষ্টি আক্রমণকে ভয় পায়। ... অভিজাতের কাছে নীচুতলার ভাষা অশ্লীল। অভিজাতের কাছে তার নিজের ভাষা মানে শিল্প।"[৭৩] মলয় মনে করেন, সমগ্র সমাজের সাধারণভাষার কথা বলা যদি কলুষতা ও বিকারহয়, অশ্লীলতা হয় তাহলে অশ্লীলতাই কাম্য। 'মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থিব দখলী সত্ত্বের ভিত্তিতে কোনো তফাৎ করতে' তিনি দেবেন না। মলয়ের মতে উচ্চবিত্ত বুর্জোয়ারা যৌনতাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখান 'যৌনমাংসের তেলতেলে গন্ধ ছাড়া এই সমাজে কোনো বিজ্ঞাপন সফল নয়। .... প্রতিটি পদক্ষেপে অবশ্যম্ভাবী যৌনজাল কেননা এই সমাজ ব্যবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার তৈরী।"[৭৪] তথাপি যৌনতা নিয়ে কেন অবদমন, কেন নৈতিকতার প্রশ্ন? কারণ যৌনজীবন সরল,

স্বাভাবিক হয়ে উঠলে বুর্জোয়াদের পুঁজিকেন্দ্রিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। যৌনতাকে পুঁজি করতে পারবেন না তারা। তাই যৌনতাকে পুঁজি ছাড়া অন্য কোনোভাবে তাঁরা প্রযুক্ত হতে দেবেন না। তাই অশ্লীলতার ধুয়ো। মলয় এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অশ্লীলতার মিথ্যাচারকে তিনি তাচ্ছিল্য করেছেন। বলেছেন, "আমার যেমন ইচ্ছে সে রকম ভাবে লিখবো এবং সমগ্র মানব সমাজের শব্দভাণ্ডারে আমার ভাবনাকে ডুবিয়ে দেবো।"[৭৫] অশ্লীলতাকে মলয় জীবনের সামগ্রিকতারই একটি অংশ হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন।

'আন্দোলন' রচনায় আমৃত্যু কবিতাপ্রাণতার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কবিতা ব্যক্তির শরীরে আত্মার মত মিশে থাকে। কবিতা সজীব একটি সত্তা। জীবিত লেখাই কবিতার ব্যাপার; জীবিত শিল্প কবিতা মাত্রই আন্দোলনের ব্যাপার। এই প্রবন্ধের কবিতা তত্ত্বের অনেক কথাই মলয় প্রথম গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। সেদিক থেকে প্রবন্ধটি পুনরুক্তিমূলক। যেমন, এখানে কবিতায় আমিত্বের উন্মোচনের কথা বলা হয়েছে। মলয়ের ভাষায়, —

> "ব্যক্তির নিজের জীবনই যথেষ্ট। কল্পনা অর্থাৎ বানানো গালগল্প ঢুকিয়ে কবিতার বাহার খোলবার দরকার আজকের দিনে আর নেই। ... কবিতা জিনিস বা বস্তু দিয়ে লেখা হয় না। যা জিনিস বা বস্তু বা দ্রব্য তা স্থাবর, জড়পদার্থ। 'আমি একা, সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ, ফলে চূড়ান্ত স্বাধীন থাকার জন্যে পরিত্যক্ত, বিতাড়িত এই বোধ থেকেই কবিতা।"[৭৬]

এখানে মলয় কবিতায়, প্রতীক, চিত্রকল্প ব্যবহার তুলে দেবার কথা বলেছেন, বলেছেন নাগরিকতাকে বিসর্জনের কথা। স্বসময়ের আগুনে কবিকে তিনি ঝলসে উঠতে বলেছেন। এখন কবিতা শূন্যতার পরিসরে বাড়বে। জন্মের আগের যে শূন্যতা এবং মৃত্যুর পরের যে শূন্যতা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকটাকে কবি বাড়াবেন। সমাজ চৈতন্য, সমাজ বাস্তবতা বলে কিছু থাকবেনা। শুধু থাকবে ব্যক্তিচৈতন্যের বাস্তবতা। প্রতিটি কবিতা হবে আরেকটির থেকে আলাদা, একই ধরনের কবিতা হতে পারবেনা। প্রতিটি কবিতা-ই নিজেকে আলাদ করে চেনাতে সক্ষম হবে। যেমন, গলার আওয়াজ শুনে, পদশব্দ শুনে আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে চেনা যায়, প্রতিটি কবিতাকেও যেভাবেই সনাক্ত করা যাবে। মলয়ের মতে ত্রিশের দশকের পর থেকে বাংলা কবিতার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ তা আগে থাকতেই তিরিশের কবিদের লেখায় কোনো না কোনোভাবে ছিল। এজন্যেই হাংরি আন্দোলন, কবিতার জন্যে। সামাজিক অভূতপূর্ব হিংস্রতা এবং ইন্দ্রিয়ের

অসংযুতিতে তাঁদের নতুন কবিতা রচনা - চর্চা নয়। কারণ চর্চায় মেধা প্রয়োজন - যার প্রয়োজনীয়তা মলয় অনুভব করেন না। তিনি বলেন, "যে কবি, সে যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রথমে ওঠে ওই ইন্দ্রিয় এবং তারপর ওঠে মেধা। মৃত্যুকালে আগে মরে মেধা এবং ক্রমশ ইন্দ্রিয়।"[৭৭] যাই হোক, এখানে মলয় তাঁর কাব্য দর্শনেরই একটা আদল উপস্থাপিত করেছেন।

গ্রন্থের শেষে ইস্তাহার 'স্বাধীনতা'। এখানে কবি, লেখকের স্বাধীন সত্তাটি কী রকম হবে মলয় তাই বলতে চেয়েছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন লিখতে হবে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে। মানে সামাজিক আইন কানুনের তোয়াক্কা করা চলবে না। অতীতের উত্তরাধিকার এবং চলতি আঙ্গিক দুটোকেই করতে হবে নিশ্চিহ্ন। লেখার মধ্যে থাকবে — "অধর্মাচরণ, অন্তর্ঘাত, প্রতিশোধ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রত্যাখ্যান, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, গ্রন্থিচ্যুতি।"[৭৮] জানোয়ার আর উদ্ভিদের মতন জৈবিক হতে হবে কবিকে।"[৭৯] এখানে হেনরি মিলারের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন মলয় ঃ I do not call poets those who make verses rhymed or unrhymed. I call that poet who is capable of profoundly altering the world.[৮০] উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আঁতোয়া বার্তোর 'The poet is a man who prefers to go mad in the social sense of the word, rather than forfeit a certain higher idea of human order.[৮১] এই যে উন্মাদনা, সমস্ত বিশ্ব বদল করবার তীব্রতা কবিদের মধ্যে সেটাই কবিদের স্বাধীনতা, আর তা কবিতার জন্যে প্রয়োজনীয়। মলয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী হাংরি কবিতার জন্যে বিশেষ করে। তিনি আরও বলেন, "ক্ষুৎকবিতা পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে লেখা থেকে বিষয়কে লোপাট করে দেয়া দরকার।"[৮২]

> এখানে মলয় নিজেদের আন্দোলনকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। প্রতিবাদী ও স্বাধীনচেতা হিসেবে জাহির করতে চান। এঠা খুব জরুরীও বটে, কারণ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতাকে যারা পরোয়া করে না, অথচ বুর্জোয়া আত্মাভিমানে যারা ডগমগ তারাই কেতাবী কবিতার ওস্তাদ আর চেলা - এই সব কেতাবী হেদাহেদিকে নিকেশ করার জন্যে চাই উদ্দেশ্যহীন এক বৈপ্লবিক অবস্থায় নিজের চরিত্রকে তাতিয়ে তোলা। স্বাধীনতা পেতে হলে পাগলামী দরকার। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার নয়। স্বাধীনতার জন্যে বরদাস্ত করতে হয় ধ্বংস অবমাননা প্রতিরোধ। ... গতানুগতিক মানুষের দুর্বলতা, ভয় আর পেটি

হামবড়াই থেকে কবিকে ছিঁড়ে ছন্নছাড়া করে এই স্বাধীনতা, যেমন করে ভাষা, রাষ্ট্র সংস্কৃতি, ইতিহাস, নিয়মের ঐতিহ্য থেকে। এই স্বাধীনতা কব্জা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।"[৮৩]

বিশেষ করে যাঁরা কেতাবী সাহিত্য করেন তাঁরা তো স্বাধীনতাই চান না। তাঁরা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের আনুগত্যে মুচলেকা দিয়ে নিরাপদ জীবন কাটান — আশার বাণী শুনিয়ে যান শুধু। মলয় ঐ সব সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করেন না। কবিতা মানেই স্বাধীনতার চেতনা, কবিতা মানেই আন্দোলন প্রবন্ধকার এ প্রবন্ধে সেটাই বলতে চান ঃ "আমি মনে করি, কবিতা দেশবদল, পৃথিবীবদল জন্মবদল শরীরবদল, সভ্যতাবদল এবং এই সংকল্প ফেরত নেওয়া যায় না। পাঠককে প্রতিকূল করে দিয়ে ভাষার ও মনোভাবের সাহায্যে কলঙ্কিত ও প্ররোচিত না করতে পারলে তার ওপরে ছেয়ে যাওয়া যায় না। কবিতা আসলে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক সৃজনশীলতা। অরাজকতা নয়। অভ্যুত্থান।"[৮৪]

লক্ষণীয়, দুটি বইতেই মলয় কবিতাকেই আলোচনার মুখ্য উপজীব্য করেছেন। ছোটগল্প, রাজনীতি বা সামাজিক প্রসঙ্গগুলি এসেছে যৎকিঞ্চিৎ। এমনকি হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাকার রচনাগুলিকে কোনো তাত্ত্বিক মান্যতা দেবার প্রয়াস পাননি। তার কারণ, সম্ভবতঃ এই যে, হাংরি জেনারেশন মূলত কাব্য আন্দোলন। বিশেষত, কবিতা রচনার জন্যই হাংরিদের কারাবাস করতে হয়েছিল। অথবা বলা যায়, কবি হিসেবেই হাংরিদের পরিচিতি ব্যাপকতা পেয়েছে। সে যাই হোক, মলয়ের এই গ্রন্থ দুটিকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম সূত্রধার বলতে হবে।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আরেক পুরোধা শৈলেশ্বর ঘোষও নিজেদের আন্দোলনের লক্ষ, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিয়ে বক্তব্য বিস্তার করেছেন। ১৯৬৮ সালে প্রথম বেরোয় তাঁর 'মুক্ত কবিতার ইস্তাহার'। ইস্তাহারটি এরূপ —

মুক্ত কবিতার ইস্তাহার

- কবিতা চেতনার সম্প্রসারণ - অজ্ঞাত জগতের আবিষ্কার। কবিতার এছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নাই।
- কবিতা মানুষের শেষ ধর্ম।

বুদ্ধ যীশু রামকৃষ্ণ নয় - কবি / কবিতা পৃথিবীকে স্বাধীন মুক্ত করতে থাকবে

ক্রমশ ঃ

- কবিতা ব্যক্তি মানুষকে পুনরভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যায়।
- কবিতা অপরাধ চেতনা থেকে জেগে ওঠা গ্লানিহীন আত্মার সংগীত — অন্ধকারে ফুটে ওঠা ফুল।

১. সমস্ত ভণ্ডামীর চেহারা মেলে ধরা।

২. প্রকৃতির দাসত্ব না করা।

৩. শিল্প নামক তথাকথিত ভূষিমালে বিশ্বাস না করা।

৪. আপাদমস্তক কেবল নিজেকেই ব্যবহার করা।

৫. এস্টাব্লিসমেন্টের চাকর না হওয়া।

৬. যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই ঘৃণা করা।

৭. মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমা দেখে নেওয়া।

৮. সভ্যতার নোনা পলেস্তারা মুখ থেকে তুলে ফেলা।

৯. সত্যকে সরাসরি বলা।

১০. যুক্তির স্তর পার হয়ে গিয়ে দ্রষ্টা হিসাবে জীবনকে দেখা ও প্রকাশ করা।

১১. সাধারণ কথ্য ভাষাকে ব্যক্তিগত করে দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা।

১২. যা কিছু গড়ে তোলা হয়েছে তাকে সন্দেহ করা।

১৩. অভিজ্ঞতা ছাড়া সত্যকে ধরবার কোন উপায় নাই শুদ্ধু বুদ্ধি জীবন সত্যকে ধরতে পারে না।

১৪. সমাজ যেসব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয় তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য। এ গুলিকে ব্যবহার করা।

১৫. নিজেকে ক্রমাগত ভাঙ্গা এবং মেলে ধরা।

১৬. নিজেকে দেখাই জগৎকে দেখা। দেখাই জ্ঞান।

১৭. অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকান যা কিছু যা ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়, মুখোসের দিকে নিয়ে যায় তাকে প্রকাশ করা।

১৮. জীবনের ভয়ানক রিলেশনগুলি প্রকাশ করা।

১৯. যে জীবন দেওয়া হয়েছে তাকে ত্যাগ করে আবার নিজের স্বরূপের কাছে চলে আসা এবং সৃষ্টির মূল নিয়ম ওগতির সংগে নিজেকে যুক্ত করা।

২০. চেতনাকে অরাজক করে তুলে, বুদ্ধির জগতের বাইরে বোধের জগতে চলে যাওয়া।

২১. নার্ভম মাথা ও সংবেদন শক্তিকে পর্যুদস্ত করে তান্ত্রিকের মত উঠে দাঁড়াতে হবে।

২২. অস্তিত্বের কেন্দ্রগত ভয়ের মূল বিন্দুকে স্পর্শ করা।

২৩. মধ্যবিত্তের রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা।

২৪. সমস্ত বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করতে হবে।

২৫. মৃত্যু আর যৌনতা, যা মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, লেখায় সেই রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া অবসেসনগুলিকে লেখায় মুক্তি দিতে হবে - সেটাই বুর্জোয়ার বিপদ

২৬. পৃথিবীর সংগে এবং নিজের সংগে ভয়ংকর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে - তাকে প্রকাশ করতে হবে নিষ্ঠুরভাবে।

২৭. জীবনকে ত্যাগ করে নয়, জীবনের কাদামাটি অশ্লীলতার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসা।

২৮. জীবন বিরোধী এই সভ্যতায় নিজেকে করে তুলতে হবে প্রতিবাদের মূর্ত্ত প্রতীক।

২৯. বুর্জোয়ার সুখ ও সিকিউরিটির উপর পেচ্ছাপ করে দিতে হবে।[৮৫]

লক্ষণীয়, মলয়ের ইস্তাহারের সঙ্গে শৈলেশ্বরের ইস্তাহারের কিছু বক্তব্য গত সাদৃশ্য আছে। কারণ, মলয়ের মতই তিনি বলেন, কবিতা মানুষের শেষ ধর্ম, কবিতা ব্যক্তিকে পুনরুভ্যুত্থানের দিকে নিয়ে যায়। কবিতায় সত্যকে সরাসরি বলতে হবে, বুর্জোয়া চেতনা ও সমাজকে আঘাত করতে হবে; মানুষের সমস্ত স্বাধীনতার অপহারক মৃত্যু ও যৌনতার রুদ্ধ চেতনাকে মুক্তিদান করে

পুনর্বার স্বাধীনতা ফিরে পেতে হবে ইত্যাদি। বস্তুত মলয় ও শৈলেশ্বরের বক্তব্যে তেমন গুণগত পার্থক্য নেই, শুধু কিছুটা মাত্রাগত ফারাক আছে। মলয় শুধু নৈরাজ্যের কথা বলেছিলেন, শৈলেশ্বর বলেছেন, অপরাধ চেতনারও প্রতিফলন আবশ্যক। মানুষী অভিজ্ঞতার শেষ সীমায় পৌঁছতে চেয়েছেন শৈলেশ্বর। প্রতিধ্বনিকে ঘৃণা করার কথা বলেছেন। জীবনের ভয়ানক সম্পর্কগুলোকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও রুচিকে ভাঙতে চেয়েছেন। প্রকাশভঙ্গীর নির্মমতা ও ভয়ংকরত্ব চেয়েছেন। অপরাধ প্রবণ চিত্তের প্রবণতা ও প্যাশন দিয়ে কবিতায় একটি তীব্র আঘাত করবার কথা বলেছেন। আর যুক্তির স্তর পার হয়ে তিনি কবিকে দ্রষ্টায় পরিণত করতে চেয়েছেন। তবে তিনি এগুলোকে মলয়ের মতো বিলি করেন নি - পত্রিকায় ছেপেছিলেন মাত্র। মলয় যেন একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগোন - তাঁর প্রজন্মের কবিতা তথা সাহিত্যের তত্ত্ব নির্মাণ করবেন বলে। আর শৈলেশ্বর নিজেদের লেখা লেখির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কলম ধরেন। দু'জনেরই গন্তব্য এক কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। তাই শৈলেশ্বরের এই রচনাগুলো বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গে লেখা কিছু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যেন। সেই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে তাঁর মন্তব্য, মতামত গুলোকে আলাদা করে সাজিয়ে নিলে তবেই হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মতাদর্শ হিসেবে সেগুলি স্পষ্টতা পায়। শৈলেশ্বরের এ ধরণের রচনার সংখ্যা ১৪টি। এগুলির শিরোনাম এরূপ ঃ (১) কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/১ (২) কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/২ (৩) কবির বিশ্বরূপে (৪) যে কেউ আমার লেখা পড়বে (৫) শিল্প ও সত্য (৬) চরিত্রহীনতার প্রয়োজন (৭) ভাষার জীবন ও মৃত্যু (৮) কেন লেখা (৯) কবিতার অভিযাত্রা (১০) প্রেত প্রতিরোধ (১১) কবিতা আপনার আতঙ্ক (১২) জীবন প্রতিষ্ঠান (১৩) নিজের আবিষ্কৃত সত্য (১৪) আমাদের অভিজ্ঞতা।

পূর্বোক্ত ইস্তাহারটি এবং এই চৌদ্দটি রচনা ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত যুষ্ট, নিষাদ, ক্ষুধার্ত, জিরাফ, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পত্রিকার নানা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে, ১৯৮৪ সালে গ্রন্থাকারে একসঙ্গে প্রকাশ পায়। গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়, 'প্রতিবাদের সাহিত্য।' প্রকাশ করে শিলিগুড়ি'র 'ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন।'

যাই হোক, এই গ্রন্থে শৈলেশ্বর, কবি ও কবিতা সম্পর্কে, লেখক ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে, বিষয়বস্তু ও ভাষা সম্পর্কে, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবাদ সম্পর্কে, বাস্তবতা ও সত্য সম্পর্কে, সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কে, জীবন ও সৃজনশীলতা সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন মোটামুটি তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে শৈলেশ্বর নির্দেশিত হাংরি

জেনারেশন তত্ত্বাদর্শ।

প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/' - তে পাচ্ছি কবি'র স্বরূপ ঃ

> বিদ্রোহী কবি বলে কোনো পদার্থ আছে কি? নিশ্চিতভাবেই নেই। কেবল কবি আছে, কবি শব্দই বিদ্রোহবাচক, কারণ জীবনের ষড়যন্ত্রময় বস্তুসমূহের মারাত্ম অবস্থানকে যে মেনে নিতে অস্বীকার করে ও বেঁকে বসে সেই কবি।[৮৬]

এরপর পাচ্ছি কবিতা কেন জীবনের একটা সদর্থক শক্তি তার ব্যাখ্যা ঃ

> আমি যখন মনে করি, অমি লিখি - তখন আমি লিখি না। আমার মধ্যে কাজ করে চলেছে হাজার হাজার বছরের অতীত লক্ষ মানুষের সম্মিলিত চিন্তা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জৈব বন্ধনগুলি আমার ধারণাগুলি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে তারাই, আমার অস্পষ্ট অবচেতনার সেই পোকাগুলি কিলবিল করছে - যেগুলি আমাদের পিতৃ-অনুক্রমে বাবা মা'দের মধ্য দিয়ে সকলেরই মগজে ঢুকে পড়ে।[৮৭]

আবার এখানেই বিপদ। নিজেকে, নিজের উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করা, যেটুকু পাওয়া গেছে তাকে ভেঙে ফেলে, অস্বীকার করে, নতুন করে গড়ে তোলবার ক্ষমতা। অথচ কবি মুক্তিকামী। শৈলেশ্বরের মতে, কবি একদিকে প্রচলিত শব্দকে নষ্ট করবে, অন্যদিকে নিজের শরীরকে কবিতায় নতুন ভাবে আবিষ্কার করবে। কারণ, ''ক্ষুন্নিবৃত্তিগত শরীর জৈববিধিগত শরীরের মধ্যেই সমস্ত সত্য লুকিয়ে আছে।''[৮৮] এবং ''বুর্জোয়া শিল্প এমন এক বস্তু যা আমাদের চৈতন্যকে প্রসারিত করে না, অভিজ্ঞতার স্তরের কোনো রূপান্তর ঘটায় না, শরীর থেকে কোনো প্রকৃত শরীরের সূত্রপাত করে না।''[৮৯] অথচ ''এই শরীর থেকেই এক প্রকৃত শরীরের সূত্রপাত হচ্ছে - এবং তাই হল কবিতা।''[৯০] বলেন,

> আমাদের কাছে টলষ্টয়ের চাইতে ডষ্টয়েভস্কি এই জন্যই সত্য, সুধীন দত্তের চাইতে জীবনানন্দ, সত্য মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জাঁ জেনে এবং ব্রেতোর চাইতে আর্তো। তীব্রতম চৈতন্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে

> তারা জীবনের মূলতম সত্যে পৌছাতে চেয়েছেন, নৈরাজ্যের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন পরম শৃঙ্খলা, পাপের মধ্যে ধর্ম এবং কেবল মেধাকে বিশ্বাস না করে সমস্ত শরীরের মধ্যে জগতের সত্য নিয়ম খুঁজে পেয়েছেন।

শৈলেশ্বর তাঁদের কবিতার আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, কবিতা হচ্ছে এক ধরণের সামগ্রিকতার আভ্যন্তরিন শক্তি। সমস্ত শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেকার নিহিত শক্তি। তা সমাজ ও জীবনের কোনো বিশেষ একটি দিকের প্রকাশ বা অনুরণন নয়। তাই বলেন,

> প্লেটো থেকে শুরু করে বাংলাদেশের ইনকুইজিশানবাদীরা সকলেই একই পাপে পাপী, তাঁরা মনে করেছিল রাজনীতি জীবনের একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থ বিষয় ঈশ্বর বা প্রেত খানিকটা, সময় খানিকটা, শিল্প খানিকটা কিন্তু জীবনের সেই সত্য, যা এইসব কিছু আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও এক দুর্জ্ঞেয় শক্তিকে ধরে রাখে যার নাম জীবন এবং যার নাম আমি বলি কবিতা।[৯১]

কবিতার সপক্ষে, বিশেষতঃ হাংরি কবিতাদর্শের পক্ষে এইসব কথা বললেও রচনাটির নাম 'কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ' এই জন্যে যে অকবিতাকেও কবিতা বলে প্রচারের বিরুদ্ধতা রয়েছে এখানে। জীবনানন্দ ব্যতীত ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ যাটের অন্যান্য কবিদের জনপ্রিয় কবিতাবলীকে অগ্রাহ্য করেছেন শৈলেশ্বর। এমনকি জীবনানন্দেরও 'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলী বা 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতাগুলিকেও তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা বলেছেন তিনি। অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যের ভয়াবহতা নেই ঐ সব কবিতায় - এরকম মনে হয়েছে তাঁর। তিনি মনে করেছেন জীবনানন্দের অস্তিত্বের জটিলতা প্রকাশক কবিতাগুলিই একমাত্র গ্রাহ্য। নতুন কবিতাও হবে তারই উত্তরসাধক ঃ "মানুষ রচনা করে মৃত্যুর গান অনুশোচনা ও ভয়কম্পন শিল্প হল সেই অতীত বস্তু যা জীবনের রক্তস্রোত নষ্ট করে মানুষ এখন থেকে রচনা করবে জীবনের গান ও আনন্দের শব্দ প্রবাহ।"[৯২]

'কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ/২' রচনাতেও শৈলেশ্বর এই নতুন কবির স্বরূপকেই কাব্যময়ী ও জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আবেগ ও ইঙ্গিতের নির্মোক সরালে বোঝা যায় - নতুন কবি গোপনতার উদ্ভাসন চান - সেই গোপনতার মধ্যে কামনা বা অপরাধ সব কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে। এই কবি শুধু নাস্তিক নন, তিনি ঈশ্বরের নিন্দাকারী। তিনি আক্রমণকারী, স্বাধীনতাস্পৃহ,

নির্লোভ, নিঃস্বার্থ আবার প্রেমিক। সত্যের জন্য তাঁর অনবরত যুদ্ধ। প্রতিটি শব্দের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কার করবার জন্য উদ্দাম। এখানে প্রবন্ধের একটু ভাষার নমুনা দেওয়া হল : "সত্য আমার কাছে স্বপ্ন, কারণ তোমাদের মিথ্যা পৃথিবীতে তো সত্য নেই - আমি যা রচনা করি তা আমার কাছে স্বপ্ন, আমি যা রচনা করি তা আমার ঘৃণা, আমি যা রচনা করি তা আমার ক্রোধ - আমি যা রচনা করি তা আমার ভালবাসা।"[১৮]

'কবির বিশ্বরূপ' প্রবন্ধটি 'জিরাফ ১৯৮৩' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি কিভাবে বিশ্বের সঙ্গে কবিতার সেতু রচনা করেন এবং বিশ্বের, সমাজের সঙ্গে তার ব্যক্তিসম্পর্কই বা কীরকম তা এক অননুকরণীয় ভাষায় শৈলেশ্বর এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটিতে আধুনিক মানুষের স্ববিরোধকে লেখক স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ঐ স্ববিরোধ থেকে যে কবি-ই বেরোতে পারেন সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। লেখক বলেছেন যে, যতক্ষণ না আমরা হৃদয় খুলে দেখাতে পারব ততক্ষণ আমাদের মুক্তি অসম্ভব। আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, কিন্তু স্বাধীনতাতে ভয়ও পাই। নিজে স্বাধীনতা পেলেও অন্যের স্বাধীনতার প্রয়াসকে সমর্থন করি না। বলেন,

> আমাকে যদি আদর্শ আর আদর্শহীন গতি দুটোর মধ্যে বেছে নিতে হয় বলা হয় তবে আমি দ্বিতীয়টিকেই বেছে নেব ... যদি আমাকে নৈতিকতা এবং আত্মার নৈরাজ্য এ দুটোর মধ্যে বেছে নিতে বলা হয়, তবে অবশ্যই আমি দ্বিতীয়টাকেই বেছে নেব, কারণ সমস্ত নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে আর কোনো তথাকথিত নৈতিকতার মধ্যে ঢুকতে পারি না, যে মুহূর্ত গুলিতে আমি বেঁচে থাকার আনন্দ পাই সেই মুহূর্ত গুলিতেই আমি পরিপূর্ণ এবং শুদ্ধ নৈতিকতা শুদ্ধতার পরিপন্থী। ... ভালবাসা ও ভালবাসাহীন অস্তিত্বের মধ্যে, আমি পেণ্ডুলামের মত চলাচল করি। ভালবাসায় যেমন আমি পূর্ণ হয়ে উঠি তেমনি ভালবাসাহীনতাও আমার অস্তিত্বের এক সত্য কিন্তু ভালবাসাহীনতাই আমার শূন্যতা যাকে পরিপূর্ণ করা অর্থদান করা আমার কাজ।"[১৯]

শৈলেশ্বর বলেন, "ভালবাসা জীবনের স্বাভাবিক এবং নৈসর্গিক পরিস্থিতি নয়, ভালবাসা হল মানুষের শুদ্ধতার আকাঙ্খা।"[২০] বেঁচে থাকার সার্থকতা, ভালবাসা এ সমস্ত কিছু পেতে হলে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে। আর

> নিজেকে ছাড়া কে আমাকে স্বাধীনতা দেবে নিজেকে ছাড়া কে আমাকে বন্দী করবে। রাষ্ট্র, সমাজ এরা কিছু স্বাধীনতা দেয় কিছু কেড়ে নেয় - কিন্তু আমি নিজেকে যে স্বাধীনতা দিই, তা আমি ছাড়া আর কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমি যখন বন্দী হয়ে থাকি তখন আমি ছাড়া বাইরের কোনো শক্তিই আমাকে মুক্তি দিতে পারে না।[৯৬]

সুতরাং কবির প্রথম পরিচয় হল তিনি একজন স্বাধীন মানুষ। আর "কবিতা, এই স্বাধীনতার চেতনা, মানুষের আত্ম আবিষ্কার।"[৯৭] আত্ম-আবিষ্কারের জন্য ব্যক্তিকে সংস্কার ভাঙতে হবে, ইন্দ্রিয় সংকোচ ত্যাগ করতে হবে, শব্দরাজীকে মুক্ত করতে হবে ঘেরাটোপ থেকে। ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

> বস্তুগুলি স্থানচ্যুত করলে তাদের অর্থ ও প্রকৃতি পাল্টে যায় সৃষ্টি হয় নতুন তাৎপর্য; তাদের লুকানো মুখ স্পষ্ট হয় কবি হিসেবে মনে করি এটাই আমার প্রথম ও প্রধান কাজ। আমি যদি পৃথিবীর একটা কণাও তার পূর্ব নির্দিষ্ট জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে না পারি তবে আমি মানুষকে কী জানাব? আমি যদি নতুন অর্থ খুঁজে না পাই তবে আমার চোখ কী দেখল? .... পুরনো আমির খোলসটা ছাড়তে হয় ঠিক সাপের মত আমার লেখায় তাই থাকে ঐ খোলস ছাড়ার সময়ের অভিজ্ঞতা এবং তারপর যে নতুন জগতে প্রবেশ করি শব্দই বহন করে এই চেতনা স্তর চেতন অবচেতনে মেশামশি, এক আলো আঁধারি।[৯৮]

লেখক বলেন যে, কবি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং চেতনাস্বরূপ। কখনও সে পুরোটাই ইন্দ্রিয় যখন সে জগৎকে নিজের ভিতরে গ্রহণ করে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাই রূপান্তরিত হয় চেতনার ইন্দ্রিয় আর চৈতন্য - এই দুই মেরুতে তার অস্তিত্ব ক্রমাগত ধাক্কা খায়। শৈলেশ্বরও তাঁর প্রবন্ধে ইন্দ্রিয়সমূহের সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ে কথা বলেছেন কিন্তু র‍্যাঁবোর অর্থে নয়। র‍্যাঁবো ঐ বিপর্যয় থেকে হ্যালুসিনেশানে গিয়েছিলেন আর শৈলেশ্বর এক নতুন চেতনার কথা বলেছেন। জীবনের চেতনা, নক্ষত্রের মত ব্যাপ্ত ও আলোকোজ্জ্বল। কবির এই চেতনা থাকে বলেই, প্রচলিত সমাজ ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে ভয় পায়। লেখক বলেন, "আমার কাছে কবিতা এক প্রচণ্ড শক্তি যা আমার অভিজ্ঞতা চেতনা থেকে নির্গত হয়ে সমস্ত জগৎকে আক্রমণ করে এবং তাকে বদলাতে

চায়।"[৯৯] যে কবির এই চেতনা আছে, যিনি সভ্যতা ও মানবপ্রকৃতির ষড়যন্ত্র ধরতে পেরেছেন স্বীয় প্রাকৃত অভিজ্ঞতায় তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সার্থক। যে অর্থে তাঁর মতে জীবনানন্দ সার্থক, আর বিষ্ণু দে ব্যর্থ। এ কাজে শব্দ ব্যবহারের ছুঁৎমার্গতাও তিনি ত্যাগ করতে বলেন।

'যে কেউ আমার লেখা পড়বে' প্রবন্ধে শৈলেশ্বর তাঁদের লেখার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। যদিও বলেছেন যে, নিজেদের লেখাকে 'জাষ্টিফাই' করার দরকার হয় না। কিন্তু 'ক্ষুধার্ত - প্রথম সংকলনে কবি নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যেহেতু মোহিতকে কোনো প্রতিষ্ঠানের অংশভাক বা বিচারক বলে তাঁর মনে হয় নি সেজন্যে, একজন পাঠকরে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছেন। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠিত কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকদের দ্বারা হাংরি কবি লেখকরা যে নিন্দা ভর্ৎসনা লাভ করেছিলেন তারও বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ এখানে শৈলেশ্বর করেছেন। মোহিতের প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল, হাংরিরা তাঁদের কবিতার দ্বারা বুর্জোয়া পদ্ধতিকেই স্বীকার করেছেন কিনা। শৈলেশ্বর বলেন যে, যদি তাই হতো তাহলে বুর্জোয়া মিডিয়ায় হাংরিদের কাব্যের আলোচনা, প্রতিষ্ঠানিক কাব্য সংকলনে তাঁদের কবিতার অন্তর্ভুক্তি এগুলোও ঘটত। আত্মার উলঙ্গ অবস্থা, স্বাধীন নির্দেশ বুর্জোয়ারা সহ্য করে না। বুর্জোয়া শিল্পের ইমেজ ব্যবহারের অভিযোগ হাংরিদের সম্পর্কে মোহিত তুললে শৈলেশ্বর বলেন, "বুর্জোয়া যে গ্লাসে সরবত রাখে, আমি সেই গ্লাসে বিষ রাখি।"[১০০] মোহিতের দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা — সোজাসুজি বলা (Direct expression) কী? শৈলেশ্বরের উত্তর, — "আমার ভাষা চেতনার নৈরাজ্য এবং অবচেতনার গাঢ় রাত্রি প্রকাশ করে ... চরম অভিজ্ঞতার ফল হলে সব লেখাই direct আমার কাছে স্বপ্নও direct অভিজ্ঞতা এবং সত্য। Indirect লেখা মাথার লেখা যার মধ্যে রক্ত মাংস নাই, রক্তমাংস ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যে সত্য আছে বলে আমি মনে করি না।"[১০১] হাংরি জেনারেশন একটি আলাদা সমাজ কিনা এর উত্তরে শৈলেশ্বর বলেন যে, তাঁরা কোনো সমাজ গড়ে তোলেন নি, প্রত্যেকে নিজ নিজ মতো স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। এভাবে মোহিতের প্রশ্নগুলির উত্তরে লেখক যা জানান তা এরকম। শুধুমাত্র সামাজিক মূঢ়তাকে আঘাত করা নয়, নিজেকে সঠিকভাবে মেলে ধরতে পারলে তা থেকেও একটা তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়। যৌনতা এবং মৃত্যুই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে। সুতরাং স্বাধীনতা মানে চৈতন্যের ঐ দুটি অবসেসন থেকে মুক্তি। এটাকে মোহিতের মতো ভালবাসা ও স্বাধীনতার জন্যই সব গোলমাল বলে গুলিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি মোহিতকে জানান যে, জাঁ জেনের সমস্যার সঙ্গে তাঁদের সমস্যা ভিন্ন। জেনে জন্ম থেকেই নিজেকে পরিত্যক্ত দেখেছেন - কিন্তু তাঁরা পরিত্যক্ত হয়েছেন

অনেক পরে। রাজনীতিতে হাংরিদের সন্দেহ, অবিশ্বাস। রাজনীতি মানুষের মুক্তি আনতে পারে না। এক ধরণের সমাজ ভেঙে তা আরেকধরণের সমাজ গঠন করে, ব্যক্তি সেখানে গৌণ হয়ে যায়। অথচ শৈলেশ্বর সামাজিক তত্ত্বেই বিশ্বাসী নন। তিনি বিশ্বাস করেন ব্যক্তির ভিতরের দিকে তাকানোয়। আত্মার নিঃশৃঙ্খল মুক্তি চান। রাজনীতিকরা রাজনীতির কাজ করেন,কবি লেখকেরা করেন সৃষ্টিশীলতার কাজ। ফলে সমাজের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ব্যাপারটি থেকে যায়। অশ্লীলতার ধারণাটিকে শৈলেশ্বর গুরুত্ব দেন না। কারণ, তথাকথিত অশ্লীল শব্দের মধ্যেও সামাজিক লক্ষণ নিহিত। সমাজের প্রাকৃত স্তরে অশ্লীল শব্দ দৈনন্দিন বাচনিকতার অন্তর্গত। তাই শৈলেশ্বরের কাছে শ্লীল-অশ্লীল অবান্তর। 'মুক্ত কবিতার ইস্তাহার'-এ তিনি বলেছেন, "সমাজ যে সব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে এবং যে চিন্তাকে দূষণীয় বলে ধিক্কার দেয়, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সমসাময়িক জীবনের অনেক সত্য।"[১০২]

'শিল্প ও সত্য' শীর্ষক রচনায় কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কে শৈলেশ্বর অনীহা ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত সাহিত্য সম্পর্কে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তদের ধ্যানধারণা ব্যখ্যা করে, নিজেদের সাহিত্যাদর্শ নির্দেশ করেছেন। কমলকুমারের ভাষা তাঁর কাছে প্রাণহীন কারুকর্ম, শোলার দুর্গা প্রতিমা মাত্র। উনিশ শতকের পর থেকে বাংলাভাষা একঘেঁয়ে ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে বলে তাকে আক্রমন করা উচিত মনে করেছেন। কিন্তু সে আক্রমণই শুধু ভাষাকে বাঁচাবে না। কমলবাবু সেটাই করেছেন। শুধু ভাষাকে আক্রমণ করেছেন; কিন্তু প্রচল জীবনকে আক্রমণ করেননি। শৈলেশ্বর ভাষা ও জীবন দুইকেই আক্রমণ করার কথা বলেন। বিষয় অতিরিক্ত ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। লেখেন,

> কমলবাবু আমাদের আত্মার কেউ নন। তিনি অতীত বিশ্বাস, তিনি শুধু সংস্কারগুলিই নন, কুসংস্কারগুলিও। তাঁর ঈশ্বর জীর্ণ, তাঁর ঈশ্বরের পচা শবের দুর্গন্ধ - আমাদের মুগ্ধ করতে পারেনি। এটা হয়ত আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু যে শবদেহ তিনি গন্ধে, বর্ণে সাজিয়ে চলেছেন তাতে আর একটি কুসুম অর্পন করা আমাদের মতো হতভাগ্য অবিশ্বাসীর পক্ষে অসম্ভব। ... আমার মর অভিজ্ঞতা এ কথা বলে-যাবতীয় ইতিহাস, সমাজ, মূল্যবোধ, রাজনীতি, ধর্ম সবকিছুকে সন্দেহ করতে, অস্বীকার করতে প্ররোচনা পাই আমি - আমি হয়ে পুনরায় ফিরতে চাই আমার

আবিষ্কৃত নিজস্ব সত্যে - সৃষ্টির মূল চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনার যোগসূত্র স্থাপিত হলেই আমার উদ্ধার আমি জানি।[১০১]

তাই ভাষাই হোক অথবা জীবন - সেখানে আত্ম-আবিষ্কারই মূল কথা। কমল কুমারের রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, ঈশ্বর, অধ্যাত্মদর্শন শৈলেশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত আদর্শ। শৈলেশ্বর কমলকুমারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের শেষ পংক্তি - 'ফলত কোথাও মায়া রহিয়া গেল' কে পাল্টে লিখতে চান 'ফলত কোথাও বেদনা রহিয়া গেল।' 'কারণ জীবনানন্দই তো বলে গেছেন, - 'বেদনার আমরা সন্তান।'[১০৪]

বিষয় ও ভাষার এই সম্পর্ক ও তুল্যমূল্যতা নিয়ে শৈলেশ্বর বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ভাষা চৈতন্যের প্রকাশ বলে ভাষার প্রশ্নটি তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরী মনে হয়েছে। "ভাষার জীবন ও মৃত্যু" শীর্ষক রচনায় ভাষার প্রাসঙ্গিকতা ও শক্তি নিয়ে তিনি কিছু কথা বলেছেন। যেমন, —

> যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে ব্যাপকতম টানা পোড়েন, তার ছাপ কবিতার শরীরে থাকবেই, স্খলিত ও গলিত এই সভ্যতার রূপ ও গন্ধ যতই ধরা পড়বে কবির কাছে ততই তার ভাষা হবে খড়্গের মতো ধারালো, নিষ্ঠুর এবং অভিজ্ঞতার আলোআঁধারির খেলা হবে তত বেশী।[১০৫]

শৈলেশ্বর দেখান বুর্জোয়া সভ্যতা, যন্ত্রযুগ, ব্যক্তির অসহায়তা, কুসংস্কার পরাধীনতা একজন কবি বা লেখককে বিভ্রান্ত করে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষায় —

> প্রকৃত স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে হয় এমন ভাষা যার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত মানুষের পরিচয় ছিল না। ... এখানেই গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রশ্ন এসে পড়ে। ভাষা জিনিসটি কি? খুশীমতো ভাষা তৈরী করা যায় কিনা। ভাষা ইচ্ছামত তৈরী করা যায় না। সমস্ত - জীবন অভিজ্ঞতার সৎ প্রকাশই ভাষা। স্রষ্টার স্বপ্ন কল্পনা ও জীবন দৃষ্টির সম্মিলিত ফল তার ভাষা।[১০৬]

শৈলেশ্বর বলেন যে, এই ভাষাকে অর্জন করতে অসৎ চৈতন্যের পরিধি ভেঙে লেখককে বেরিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ মিথ্যাকে সরিয়ে সত্যের দিকে, মোহকে ছাড়িয়ে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। সৎ চৈতন্যের দিকেই রয়েছে ভাষার ঠিকানা। সৎ চৈতন্য বলতে শৈলেশ্বর

প্রতিবাদী চেতনাকে ইঙ্গিত করেন। তিনি মনে করেন, ভাষা যখন বাস্তবতা, প্রতিবাদ ও অস্তিত্বের নগ্ন উদ্ভাসক হয়ে ওঠে তখন তা সংক্রামক হয়ে যায়। এমনকি হয়ে ওঠে অন্তর্ঘাতী। ফলে তা পাঠককেও জাগিয়ে দেয়। এই নিরিখে তিনি জীবনানন্দের ভাষার সজীবতার কথা বলেন। অভিজ্ঞতা কল্পনা, বাস্তবতা, আঘাত ও বেদনা সেখানে একাকার। ঐ ভাষা জীবনের প্রতীক স্বরূপ। পক্ষান্তরে, উৎপল কুমার বসুর ভাষাকে বলেন শব্দ ও ছন্দের মিথ্যা মায়াজাল, মিষ্টিক। বলেন, ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে সেখানে। কবিতা যে মনোরঞ্জনের জিনিস নয় এ কথা দিয়ে 'প্রতিবাদের সাহিত্য' রচনাটি শুরু করেছেন শৈলেশ্বর। বাংলা ভাষায় জনচিত্তজয়ী প্রচুর কবিতা ও গদ্য লেখা হচ্ছে। পাঠকরা তা কিনেও পড়ছেন। এ জন্য কবি লেখক এবং পাঠকদেরও শৈলেশ্বর আক্রমণ করেছেন। লেখকদের 'ব্যবসায়ী', পাঠকদের 'রোবট' বলে নিন্দামন্দ করেছেন। সমাজকেও 'মস্তিষ্কহীন' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আংশিক স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর প্রতিবাদী লেখাগুলির জন্যে। তবে রবীন্দ্রনাথে ঔপনিষদিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। উপরন্তু শৈলেশ্বরের অভিযোগ এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ জীবনের কোনো মূল বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছায় না বলে দুর্বল। অথচ জীবনানন্দের প্রতিবাদ জীবনের অন্তস্থল পর্যন্ত পৌঁছায় বলে তা সার্থক। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদগুলো জীবনের শেষ পর্বে আর জীবনানন্দ সারা জীবনভরই প্রতিবাদী। জীবনানন্দের প্রতিবাদ আলাদা করে বিষয় ভিত্তিক নয়, তিনি জীবনের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ভাবেই প্রতিবাদী। প্রতিবাদী কবি হিসেবে জীবনানন্দ ছাড়াও বিদেশের র‍্যাঁবো, লুই ফর্দিনান্দ, আর্তো এবং জাঁ জেনের নাম করেছেন তিনি। তবে রাজনৈতিক বা বামপন্থী কবিদের তিনি প্রতিবাদী বলতে চান নি। শৈলেশ্বর বলেছেন "শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা পৃথিবীতেই প্রতিবাদী সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য।"[১০৭] তাঁর আশা ও সংকল্প জানায় - "এই প্রতিবাদী অন্তর্ঘাতীর সংখ্যা যতই বাড়বে ততই সাহিত্য ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের পরমায়ু সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে। আমাদের সামনে এখন এই কাজ।"[১০৮] বলেন,

> আমরা কালো সাহিত্যের পক্ষপাতী। সেই সাহিত্য জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনাগুলি মুক্ত করে দেবে - কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনামূলক সৃষ্টি যদি কালো হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে সে জন্যে সাহিত্যকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই - জীবনই এ জন্যে দায়ী, জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি এই তমসা লুকিয়ে নেই? এই অন্ধকারই সচেতন বাস্তবতার প্রতিটি ঘটনার পেছনে সক্রিয় শক্তি - তাই এই সামগ্রিক জটিলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মধ্যেই

কবির অস্তিত্বের মূল্য প্রতিপন্ন হয়।[১৬]

সুতরাং প্রতিবাদ এখানে কোনো আরোপিত ব্যাপার নয়। তা কবির সত্তা ও স্বভাবের সঙ্গে ওতপ্রোত। বাস্তবতা ও অস্তিত্বের সমার্থক।

লেখকের শ্রেণীগত অবস্থান নিয়েও শৈলেশ্বর আলোচনা করেছেন। লেখক কেন লিখবেন, কাদের জন্যে লিখবেন, কার কথা লিখবেন? যদি লেখক নিজের কথাও লেখেন তবে প্রশ্ন উঠবে তিনি কে? কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি? এটাও সত্য যে, যে সমাজে লেখক জন্মাবেন, সেই সমাজের মূল্যবোধ দ্বারাই অনেকখানি তিনি চালিত হবেন. তথাপি লেখককে বিদ্রোহী হতেই হবে। এই বিদ্রোহ কখনই রাজনীতিকদের মতো হতে পারে না। যেহেতু একজন লেখক সমাজ ও সভ্যতাকে সরাসরি পাল্টাতে পারেন না. এই সমস্ত কথা নিয়ে 'চরিত্রহীনতার আয়োজন' লেখাটি শুরু করেছেন শৈলেশ্বর। তাঁর মনে হয়েছে, আপন উত্তরাধিকারকে বিশ্লেষণ করেই লেখক গড়ে উঠবেন। লেখক হবার পর, একজন মানুষ শ্রেণীহীন হয়ে যাবেন। তখন তিনি শুধুই নিজের কথা বলবেন, আত্মানুসন্ধান চলাবেন, ভবিষ্যতের আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। কারণ যেটি লেখক শ্রেণীহীন, তার কোনো শ্রেণী থাকতে পারে না। যথার্থ লেখক সমাজহীন, চরিত্রহীন, শ্রেণীহীন - কেবল আপন প্রকৃতি ও সত্তার ভাঙন ও নির্মাণে ব্যস্ত —

> সর্বহারা একটি শ্রেণী কিন্তু আমি একজন সর্বহারা হয়েও যে মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠলাম - নিজেকে খুঁজতে শুরু করলাম, আমি হতে চাইলাম, সেই মুহূর্তে আর সর্বহারা থাকছি না, কারণ আমি শৃঙ্খলকে খুলে ফেলেছি, শোষণের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিতে চাইছি, আমি অন্য দ্বারা চালিত নই বলেই সর্বহারা নই, স্বচালিত। আত্মশক্তি সম্বন্ধে এই নবজন্ম আমাকে শ্রেণীশূন্য করে ফেলে, কিন্তু শ্রেণীশূন্য হয়ে আমার কাজ হয়, তখন সমস্ত সর্বহারাকেই এই অঙ্গীকারে প্ররোচনা দেওয়া।[১৭]

এখানে শৈলেশ্বর লেখককে শ্রেণীহীন এক আত্ম অন্বেষণকারী অভিযাত্রিক হিসেবে দেখতে চান। 'কেন লেখা' শীর্ষক রচনায় শৈলেশ্বর জানান যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতিবাদ করাই লেখার মূল কারণ। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, ব্যক্তির স্বাধীনতাস্পৃহাকে প্রকাশ করবার জন্যই লেখা দাসত্বের বিরোধিতার জন্যই সাহিত্যকর্ম প্রয়োজন।

> নামহীন দাসত্বের শেষ পর্যায়ে এসে কবি শিল্পী তার কর্তব্য ঠিক করে নিচ্ছে অন্তর্ঘাতী ছাড়া কবির আজ কোনো নাম নেই - জীবন বিপ্লবী ছাড়া অন্য কোনো রোলে কবিকে আর চেনা যায় না। মানুষ এখনও সত্যভাষী হয়ে উঠতে পারে নি, বুর্জোয়ার মূল্যবোধ তাকে তার হৃদয়ের কবাট রুদ্ধ করে রাখতে বাধ্য করেছে ... কবি এই জন্যেই বেঁচে আছে ও সংগ্রাম করছে যে একদিন সব মানুষই তার মত হৃদয় খুলে দেখাবে, কারণ হৃদয়ই পরম সত্যের উৎসারণ স্থল। কবি নিজের জন্য নয়, লেখে সে জীবনের জন্যে, সে জন্য জ্ঞান ও চৈতন্যে সমগ্র মানবমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছাড়া তার সার্থকতা নাই।[১১১]

লেখকের একক ব্যক্তিত্ব সমাজের ব্যক্তিসমষ্টির দায় বহন করে, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়, তাদেরকে নিজের যাত্রাপথের সঙ্গী করে নেয়। শৈলেশ্বরের 'কবিতার অভিযাত্রা' শীর্ষক রচনাটি পূর্বোক্ত রচনা দুটিরই প্রতিপাদ্যকে সংহত করেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা, নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চেতনার আবিষ্কার ও সম্প্রসারণ, মৃতপ্রায় ভাষার মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি জাগিয়ে তোলা, মিথ্যা ও অসঙ্গতিগুলোকে আক্রমণ করে যথার্থ জীবন সত্যকে রূপায়িত করা একজন যথার্থ কবির কাজ হওয়া উচিত। একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কবি ও কবিতাকে এক অনির্দ্দেশ্যতার দিকে যাত্রা করতে হবে। সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটি কী? শৈলেশ্বর বলেছেন, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। আবার "জীবনের নৈরাজ্যকে আক্রমণ করতে হলে কবিকেও নিতে হয় এক নৈরাজ্যের পথ।"[১১২] কিংবা —

> অপরাধী সভ্যতার মধ্যেই কবির জন্ম। এখানকার বিষাক্ত হাওয়ায় তার শ্বাসগ্রহণ। ... কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই গলা টিপে ধরা হবে। তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ আছে - প্রতিবাদ দিয়েই জীবনের মধ্যে প্রতিবাদ করবে কবি।[১১৩]

কবির অবস্থান এই সমাজে —

> খুনীর মতো। গণিকার মতো। সন্তের মতো। গরল পান করা ছাড়া তার গত্যন্তর নাই। ... জীবনের খণ্ড টুকরোগুলি বয়ে বেড়াতে হয় আমাদের - সেই খণ্ডগুলিই যন্ত্রণা আর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পাবে - কবিই তাকে পূর্ণতা দেবে।[১১৪]

অর্থাৎ কবি একদিকে ভুক্ত ভোগী, অন্যদিকে সক্রিয়, একদিকে সে অপরাধ জগতের বাসিন্দা অন্যদিকে অপরাধ উত্তীর্ণ এক প্রোজ্জ্বল সত্তা। জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধিতে, উপলব্ধির প্রকাশে অনন্য। অন্ধকার ও পঙ্কিলতা থেকে জ্ঞানালোকের পথে অভিযাত্রী। শৈলেশ্বর বলেন —

> জীবনের মূল সত্যগুলির উৎসর দিকে কবি যেতে শুরু করে - আসে বাধা, প্রতি আক্রমণ করতে হয় কবিকে। বাংলা কবিতায় এই উৎস সন্ধান শুরু হয়েছে। কবিকে এটা বুঝে নিতেই হয় যে, অপরাধ করার প্রবণতা মানুষের মধ্যেই আছে। আবার তারই মধ্যে আছে অপরাধ থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা। আধুনিক বাংলা কবিতা মানুষের অন্তর জগতের এই নূতন উন্মোচন নিয়ে এগিয়ে আসছে - এবং এগিয়ে যাবে মনে হয়।[১১৫]

'জীবন প্রতিষ্ঠান' ও 'আমাদের অভিজ্ঞতা' হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যার প্রয়াস। 'মুক্ত কবিতার ইস্তাহার' শীর্ষক রচনায় বর্ণিত সূত্র গুলিকেই কম বেশী এ 'দুটি ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। হাজার বছরের এই নষ্ট সমাজে তাঁদের আবির্ভাব কেন, ঐ আবির্ভাবের সার্থকতা কী তারই ব্যাখ্যা রয়েছে প্রবন্ধ দুটিতে। যেমন, "ভারতবর্ষে সমাজ প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করে হাংরি জেনারেশন। প্রতিষ্ঠান প্রবল চেষ্টা করেও একে দমন করতে পারে নি।"[১১৬] কিংবা "মহান সাহিত্য - আমরা বিশ্বাস করি না ... আমরা মনে করি, যে সাহিত্য জীবনের আগুনকে ধারণ করে সেই সত্য-সাহিত্য। আমরা চেয়েছি সাহিত্যের ভাষা হবে তাই যা বুর্জোয়াকে ভায়োলেট করবে, প্রাতিষ্ঠানিক, জড় বোধবুদ্ধিকে আক্রমণ করবে।"[১১৭] কিংবা "সাহিত্য ও জীবনকে আমরা এক করতে চেয়েছি। জীবনযাপনের অভিজ্ঞতাই হবে সাহিত্য।"[১১৮] কিংবা "শোষণ ও মিথ্যা থেকে নিজেদের মুক্ত করাই ছিল হাংরিদের লক্ষ। হাংরি সাহিত্য তাই আর কোনো শিল্প নয়, হাংরি সাহিত্য জীবন অভিজ্ঞতার মুক্তি, হাংরি সাহিত্য যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, তার ফলে মানুষের ভুলে যাওয়া সত্য গুলি সেই সাহিত্যে উঠে এসেছে। .... বুর্জোয়ার সাহিত্য শিল্প ধর্ম, মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করার এক একটা সোনার শিকল। হাংরি স্পিরিট কোনোরকম পরাধীনতা মেনে নেয় না। স্বাধীনতার এই নতুন চেতনা থেকেই ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরু।"[১১৯]

'প্রেত প্রতিরোধ' ও 'নিজের আবিষ্কৃত সত্য' রচনায় নিজেদের প্রসঙ্গ এলেও পূর্বসূরী কয়েক জন বাঙালী কবি ও শিল্পীর কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋত্বিক ঘটকের আত্মঘাতী মৃত্যুর পটভূমিকা তাঁদেরই শিল্পকৃতি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন 'প্রেত প্রতিরোধ' নিবন্ধে। বলতে চেয়েছেন, সমাজের একটা ব্যবস্থাই তাঁদের ঘাতক। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানই তাঁদের মৃত্যুকে টেনে আনতে বাধ্য করেছে। শৈলেশ্বর বলেছেন, "মানুষ যখন আর তার জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারে না তখনই মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়।"[১২০]। উক্ত তিন বাঙালী স্রষ্টারও জীবনের ভিন্ন রূপান্তর আটকে গিয়েছিল বা আটকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর প্রতিবাদও করে গিয়েছেন তাঁরা তাঁদের সাহিত্য কর্মের মধ্যে। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা থেকে পংক্তি তুলে ধরছেন শৈলেশ্বর, 'অশ্বত্থের শাখা করে নি প্রতিবাদ'? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' থেকে দেখিয়েছেন যে, হারুর মৃত্যু তার সহজ জীবনের মতই সহজ ও প্রাকৃতিক। অথচ শরীর অর্থহীন জীবনই আরেক মৃত্যুর সূচক - যেমন জটিল তাঁর জীবন, প্রেম; তেমনই মৃত্যুর ইশারা। ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা' ছবির উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, নায়ক নিজের বোনকে বেশ্যা হিসেবে আবিষ্কার করে জীবনের কী ভয়ংকর ঘাতক বৃত্তিকে অনুভব করেছেন — "সুবর্ণ রেখার জলে যে জীবন ভেসে গেল, আত্মহত্যা করলেও তা তো ফিরবেনা, ফেরে না। জীবনের অপঘাতগুলি শেষ পর্যন্ত অপঘাতেই থেকে যায়।"[১২১] শৈলেশ্বর বলেছেন, " ... জীবনানন্দ এবং মানিক যে ক্ষুধা নিয়ে জীবনকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছিল তা সত্যের ক্ষুধা।"[১২২] আর ঋত্বিক "চলচ্চিত্র মাধ্যমকে নিয়ে সত্যের কাছে যেতে চেয়েছিল বলেই - সে জীবনবিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা নিহত হল।"[১২৩] 'নিজের আবিষ্কৃত সত্য' প্রবন্ধটি ঋত্বিক ঘটকের আত্মত্যাগ ও অবদান নিয়ে আলোচনা। ঋত্বিককে প্রাবন্ধিক একজন বিপ্লবী হিসেবে দেখেছেন। বুর্জোয়া শিল্পের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবন ও সত্যের জন্য বিদ্রোহী ঋত্বিকের মৃত্যু শৈলেশ্বরদের সৃজনশীলতার কাছে উদ্দীপক ঠেকেছে। তিনি লিখেছেন, "ঋত্বিকের মধ্যে আমরা সেই শক্তি দেখেছি, যে শক্তি একজন প্রকৃত বিপ্লবীর, যে শক্তির বলে সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করেও একজন প্রতিবাদ করে - মৃত্যুও যখন একটা অস্ত্যর্থক মূল্যবোধে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।'[১২৪] ঋত্বিকের মৃত্যুর কারণ যে প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নতুন সংকল্প দিয়ে শৈলেশ্বর বক্তব্য শেষ করেন।

তথ্যসূত্র

১. মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ৪।

২. মলয় রায়চৌধুরী, (হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা), জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ - ৫৭।

৩. উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১৪৪।

৪. মলয় রায় চৌধুরী, কবিতীর্থ পত্রিকা গ্রীষ্ম বর্ষা সংখ্যা ১৪১০, কলকাতা, পৃঃ ১৩।

৫. মলয় রায় চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯২, পৃ ৫৮।

৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ঃ ১৪।

৭. তদেব পৃঃ ১৬।

৮. তদেব পৃঃ ১৪।

৯. মলয় রায় চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ - ৬।

১০. (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থসমালোচনা দ্রষ্টব্য) - শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ১৪।

১১. মলয় রায় চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৫,, পৃ - ৫।

১২. মলয় রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ - ৫৭।

১৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫ পৃ ঃ ২৬।

১৪. তদেব পৃ ঃ ৩৬।

১৫. প্রদীপ চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী রচনা সংকলন, প্রকাশক লেখক স্বয়ং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ১১।

১৬. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ৩-৫।

১৭. তদেব, পৃ - ৭।

১৮. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ - ৫।

১৯. মলয় রায় চৌধরী, কবিতীর্থ পত্রিকা, গ্রীষ্মবর্ষা সংখ্যা, ১৪১০, কলকাতা, পৃ ১৫-১৬।

২০. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ - ১৪।

২১. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ৭।

২২. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ - ২৬।

২৩. তদেব পৃ - ১৪।

২৪. মলয় রায় চৌধুরী, কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন ঃ বাংলা কলতার পালাবাদল, কবিতীর্থ পত্রিকা, গ্রীষ্ম বর্ষা সংখ্যা, ১৪১০, কলকাতা পৃ ঃ ১৫।

২৫. উত্তম দাশ, হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃ - ১৪৪।

২৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫।

২৭. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ - ১৩।

২৮. শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ, কৃত্তিবাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ - ২৩।

২৯. মলয় রায় চৌধুরী, (হাংরি আন্দোলন, পিছন ফিরে দেখা) জিজ্ঞাসা সংকলন ১৯৯২, কলকাতা, পৃঃ ৬৩।

৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস সংকলন ২, প্যাপিরাস কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ - ১১২।

৩১. তদেব, ভূমিকাংশ, - পৃ ঃ ৫৬।

৩২. অমিতাভ চৌধুরী, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ, কৃত্তিবাস, কলকাতা ২০০৩, পৃ ঃ ১০৬।

৩৩. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি, অ্যাংরি বিট ঃ প্রতিসন্দর্ভের বৈভিন্ন্য, অমৃত লোক পত্রিকা ৯৯ সংখ্যা, মেদিনীপুর, ২০০৩, পৃঃ ৮২।

৩৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ ৩৫।

৩৫. মলয় রায়চৌধুরী, মৃত্যুমেধী শাস্ত্র ঃ প্রথম ইন্সটলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন, মলয় রায় চৌধুরী, পাটনা, ১৯৬৫, পৃ ঃ ১।

৩৬. তদেব পৃ ঃ ১।

৩৭. তদেব পৃ ঃ ২।

৩৮. তদেব পৃ ঃ ২।

৩৯. তদেব পৃ ঃ ৩।

৪০. তদেব পৃ ঃ ২-৩।

৪১. তদেব পৃ ঃ ৩।

৪২. তদেব পৃ ঃ ৩।

৪৩. তদেব পৃ ঃ ৩,৪

৪৪. তদেব পৃ ঃ ৪।

৪৫. তদেব পৃ ঃ ৪।

৪৬. তদেব পৃ ঃ ৫।

৪৭. তদেব পৃ ঃ ৫।

৪৮. তদেব পৃ ঃ ৬।

৪৯. তদেব পৃ ঃ ৬-৭।

৫০. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ঃ ৩৬।

৫১. মলয় রায় চৌধুরী, মৃত্যুমেধীশাস্ত্র ঃ প্রথম ইনস্টলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন, মলয় রায় চৌধুরী, পাটনা, ১৯৬৫, পৃ ঃ ৮।

৫২. তদেব পৃ ঃ ৯।

৫৩. তদেব পৃ ঃ ১০।

৫৪. তদেব পৃ ঃ ১২।

৫৫. Bernard Oliver, Rimband: Collected Poems, Pengin Books, England 1997 Page 8, 13.

৫৬. মলয় রায়চৌধুরী, মৃত্যু মেধীশাস্ত্র ঃ প্রথম ইন্সটলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন, মলয় রায়চৌধুরী, পাটনা, ১৯৬৫ পৃ ঃ ১২।

৫৭. তদেব পৃ ঃ ১৩।

৫৮. তদেব পৃ ঃ ১৩।

৫৯. তদেব পৃ ঃ ১৪।

৬০. তদেব পৃ ঃ ১৬।

৬১. তদেব পৃ ঃ ১৮।

৬২. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৬৩. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৬৪. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৬৫. তদেব পৃ ঃ ২১-২২।

৬৬. তদেব পৃ ঃ ২৪।

৬৭. তদেব পৃ ঃ ২৬।

৬৮. মলয় রায় চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ঃ ১৮।

৬৯. তদেব পৃ ঃ ৮।

৭০. তদেব পৃ ঃ ১০।

৭১. তদেব পৃ ঃ ১০।

৭২. তদেব পৃ ঃ ২৯।

৭৩. তদেব পৃ ঃ ৩০।

৭৪. তদেব পৃ ঃ ৩১-৩২।

৭৫. তদেব পৃ ঃ ৩৩।

৭৬. তদেব পৃ ঃ ৩৯।

৭৭. তদেব পৃ ঃ ৪৫।

৭৮. তদেব পৃ ঃ ৪৭।

৭৯. তদেব পৃ ঃ ৪৭।

৮০. তদেব পৃ ঃ ৪৮।

৮১. তদেব পৃ ঃ ৪৮।

৮২. তদেব পৃ ঃ ৫১।

৮৩. তদেব পৃ ঃ ৫২।

৮৪. তদেব পৃ ঃ ৫৩।

৮৫. প্রদীপ চৌধুরী, ফুঃ পত্রিকা. ৫৯ সংকলন, কলকাতা, ১৯৬৮।

৮৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন, শিলিগুড়ি ১৯৮৪,পৃ - ৩।

৮৭. তদেব পৃ ঃ ৫।

৮৮. তদেব পৃ ঃ ৭।

৮৯. তদেব পৃ ঃ ৭।

৯০. তদেব পৃ ঃ ৭।

৯১. তদেব পৃ ঃ ৭-৮।

৯২. তদেব পৃ ঃ ৯।

৯৩. তদেব পৃ ঃ ১২।

৯৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন শিলিগুড়ি, ১৯৮৪, পৃ ১৪।

৯৫. তদেব পৃ ঃ ১৫।

৯৬. তদেব পৃ ঃ ১৫।

৯৭. তদেব পৃ ঃ ১৭।

৯৮. তদেব পৃ ঃ ১৯।

৯৯. তদেব পৃ ঃ ২২।

১০০. তদেব পৃ ঃ ২৮।

১০১. তদেব পৃ ঃ ২৯।

১০২. তদেব পৃ ঃ ০১।

১০৩. তদেব পৃ ঃ ৩৭।

১০৪. তদেব পৃ ঃ ৪১।

১০৫. তদেব পৃ ঃ ৪৫।

১০৬. তদেব পৃ ঃ ৪৮।

১০৭. তদেব পৃ ঃ ৫৮।

১০৮. তদেব পৃ ঃ ৫৮।

১০৯. তদেব পৃ ঃ ৫৭।

১১০. তদেব পৃ ঃ ৪৩।

১১১. তদেব পৃ ঃ ৬০।

১১২. তদেব পৃ ঃ ৬৩।

১১৩. তদেব পৃ ঃ ৬৪।

১১৪. তদেব পৃ ঃ ৬৫।

১১৫. তদেব পৃ ঃ ৬৬।

১১৭. তদেব পৃ ঃ ৯৪।

১১৮. তদেব পৃ ঃ ৯৪।

১১৯. তদেব পৃ ঃ ৯৫।

১২০. তদেব পৃ ঃ ৬৭।

১২১. তদেব পৃ ঃ ৬৯।

১২২. তদেব পৃ ঃ ৭০।

১২৩. তদেব পৃ ঃ ৭০।

১২৪. তদেব পৃ ঃ ৮৮।

চতুর্থ অধ্যায়

আন্দোলনের বিস্তার পর্ব

১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন বিস্তার পেতে শুরু করে। একাধিক তরুণ ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি এসে জোটবদ্ধ হতে শুরু করেন। এমনকি কাব্য ও সাহিত্য ভাবনার দিক থেকেও একটা সমধর্মিতা স্পষ্ট হতে শুরু করে। এই গুণটি বাংলা সাহিত্যের আর কোনো পত্রিকাই ধারণ করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে আন্দোলনের বিস্তার কিভাবে হয়েছিল তা মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্তের লেখা থেকেই বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে মতানৈক্য ও ভিন্ন দাবীপত্তন থাকলেও তা থেকে তৃতীয়পক্ষের ইতিহাস বিচারে অসুবিধা হয় না।

মলয়ের লেখা থেকে দেখা যায়, তিনি নিজে তাঁর সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে নিবদ্ধ। তাঁর বয়ান ঃ

> "১৯৬৩ সনে হাতে এল সদ্য প্রকাশিত সেমিলি ম্যাকওয়ার্থের লেখা একটা বই, 'গীয়ম অ্যাপলিনার অ্যাণ্ড দ্য কিউবিষ্ট লাইফ।' চৌরঙ্গীর ফুটপাতে বিদেশী বইয়ের দোকানটায় বইটাকে দেখতেই কিনে ফেলি। সুবিমলের আপিসের ছাদে বসে পড়ে ফেলি বইটা সারাদিনে। গীয়মের চরিত্র আর কার্যকলাপে অবাক হই। যদিও ওঁর কবিতা তেমন চেপে ধরতে পারে না। ... ফাল্গুনি রায় আর ত্রিদিব মিত্রকে পড়ালুম। সুবিমল বসাক পড়তে চাইল না। ও বললে বাংলাভাষায় গদ্যে বিশেষ কাজ হয়নি, গদ্যে অনেক কিছু করার আছে।"[১]

বিভিন্ন নামকরা ব্যক্তিকে মুখোশ পাঠানোর ব্যাপারটা এই বই পড়ার পর মলয়দের কাছে অসাহিত্যিক কাজ বলে মনে হয় নি। এই ১৯৬৩ সালেই প্রদীপ চৌধুরী 'স্বকাল' পত্রিকার নাম পাল্টে রাখেন 'ফুঃ'। কারণ 'স্বকাল' - এর সহযোগী সম্পাদক ঐ বছর 'শ্রুতি' নামে আর একটি পত্রিকা বার করে বেরিয়ে যান। প্রদীপের সঙ্গে মলয়ের আলাপ হল। তিনি পরিচয় করতে যান শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে। কারণ ১৯৬৩ সালে 'এষণা' পত্রিকাতেই শৈলেশ্বরের "ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা" বার হয়ে গেছে। সেই কবিতা মলয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মলয় বলেছেন, 'ঠিকানা দেখে খুঁজে বের করি। টালা ট্যাঙ্কের কাছে একটা দোতলা বাড়ি।[২]" ঐ বাড়িরই একতলায় রাস্তার ধারের একটি অপরিসর ঘরে তখন থাকতেন শৈলেশ্বর ঘোষ ও সুভাষ ঘোষ। মলয় বলেন,

> জানতে পারলুম সুভাষ গদ্য লেখেন। সুভাষ কোনও লেখা দেখালেন না। শৈলেশ্বর বললেন তিনি দেবী রায়কে একটা কবিতা দিয়েছেন। ..... হাংরি বুলেটিনে লেখা আরম্ভ করতেই শৈলেশ্বর আর সুভাষের বাড়িওয়ালাকে বেনামী চিঠি দিয়ে ওদের সম্পর্কে আবোল তাবোল খবর যোগানো হতে থাকে। শেষে ঐ বাসা ছেড়ে ওরা মধ্য কলকাতার একটা মেসে উঠে যায়। মেসে যাবার ফলে আমাদের একটা আড্ডার জায়গা হয়।[৩]

ত্রিদিব মিত্র থাকতেন হাওড়ায়। তিনি তো হাংরি আন্দোলনে সামিল হয়েই ছিলেন। তাঁর বাড়িতে থাকতেন বিষ্ণুপুরের এক তরুণ সুবো আচার্য, তিনিও এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। যুক্ত হলেন বিষ্ণুপুরের আরেক যুবক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং ফাল্গুনী রায়। ১৯৬৩ সালে আরও যাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্র গুহ, শংকর সেন, অরূপরতন বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, অমিত সেন, অমৃত তনয় গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ভানু চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক, শম্ভু রক্ষিত, তপন দাস, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র, মিহির পাল, অরণি বসু, অজিতকুমার ভৌমিক প্রমুখ। শৈলেশ্বর ঘোষও বলেন '১৯৬৩ তে আমরা সংগঠিত হয়েছিলাম।'[৪] লেখেন,

> ১৯৬৩ ঃ হাংরি জেনারেশনের সংগঠন ও সৃষ্টি ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের বন্ধু সতীন্দ্র ভৌমিক দমদমের বস্তিতে থাকত ... অফিস ফেরৎ সতীন্দ্র চলে আসত কলেজ ষ্ট্রীট কিংবা ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটে। একদিন যোগাড় করে নিয়ে এল মলয় রায়চৌধুরীর একটা গদ্য।[৫]

এই গদ্য হচ্ছে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম ইস্তাহারটি। শৈলেশ্বর বলেন,

> 'এষণা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল সতীন্দ্র। কাগজের একটি সংখ্যায় নাক উঁচু আধুনিকতার ভান করা কবি লেখকদের আক্রমণ করে বসে। সঙ্গে সঙ্গে কফি হাউসের একটা অংশের কাছে ও অপ্রিয় হয়ে যায়। এদিকে ১৯৬৩র প্রথম দিকে 'এষণা' পত্রিকায় ছাপা হয়ে বের হয় আমার 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' সিরিজের বেশ খানিকটা।

> এর পরবর্তী অংশের কিছুটা হাংরি জেনারেশনের ফালি কাগজে কিছুদিন বাদে বার হয়। .... এই কবিতা পঞ্চাশের প্রতিষ্ঠিত কবিদের কারও কারও মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ... এই কবিতা সূত্রেই যোগাযোগ তৈরী হয় উৎপল কুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। .... ৬৩ সাল পর্যন্ত শক্তিই ছিলেন তখনকার সেই হাংরি জেনারেশনের সব কিছু।... এই কবিতাসূত্রেই (শৈলেশ্বরের 'তিন বিধবা' যা হাংরি জেনারেশনের লিফলেটে প্রকাশি হয়েছিল) কফি হাউসে একদিন যোগাযোগ হয়ে যায় প্রদীপ চৌধুরী এবং সুবো আচার্যের সঙ্গে। ... 'তিন বিধবা' কবিতা ছাপা হবার পর আমি মলয় রায় চৌধুরীর চিঠি পাই। এই প্রথম মলয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ।[৬]

লক্ষণীয়, এই ১৯৬৩ সালেই পঞ্চাশের ক'জন স্বনামী ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলন থেকে নিজেদের পৃথক করে নেন। বিশেষত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। মলয় লিখেছেন, "শক্তি বিনয় সন্দীপন সিরাজ ১৯৬৩ সনেই আন্দোলন থেকে নিজেদের আলাদা করে তো নিয়েইছিলেন, হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেখা আরম্ভ করেন স্বনামে বেনামে।"[৭] শৈলেশ্বরের ভাষায় "শক্তির সেই হাংরি জেনারেশন, যার সঙ্গে সন্দীপন, উৎপল এবং মলয়ের নাম যুক্ত ছিল, বন্ধ হয়ে যায়।"[৮] বাসুদেব দাশগুপ্ত বলেন, "১৯৬৩ সালে হাংরি আন্দোলন থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজেকে গুটিয়ে নিলে নব পর্যায়ে হাংরি আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৬বি শ্যামাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটের ঐ ঘরখানাকে কেন্দ্র করেই।"[৯] মোট কথা, শক্তির প্রবেশ ও প্রস্থান হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব পায়নি। শৈলেশ্বর বলেছেন, 'হাংরি জেনারেশন শক্তির কাছে কোন সিরিয়াস ব্যাপার ছিল না, ওটা ছিল নিজেকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করার একটা চালাকি মাত্র।'[১০] একই মত মলয়েরও। আসলে হাংরি আন্দোলনের মাধ্যমে যে ব্রেক থ্রু তিনি চাইছিলেন তা পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর হাংরি আন্দোলন তাঁর ঘাড়ের ভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[১১] শক্তি, সন্দীপনের প্রস্থানের পরেও হাংরি আন্দোলন ফলবন্ত হয়ে এই সাধারণ সত্যটিই প্রমাণিত করেছিল যে, যৌথ আন্দোলন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ। তা তিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন। এটা হাংরি আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালেও প্রমাণিত হয়েছে, যখন ১৯৬৫ সালে মলয় রায় চৌধুরীও আন্দোলনকে মৃত ঘোষণা করে সরে যান। কারণ তার পরেও এ আন্দোলন বহুদিন পর্যন্ত সজীব ছিল।

যাই হোক, সালটিকে হাংরি আন্দোলনের তুঙ্গ বিন্দু বলা যায়। বাসুদেব যাকে বলেছেন, 'নব পর্যায়ে হাংরি আন্দোলন।'[১২] শৈলেশ্বর জানিয়েছেন, ১৯৬৪'র মার্চ এপ্রিলে মলয় প্রথম

শৈলেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। শৈলেশ্বর বলেন, "যা হোক, ১৯৬৪তে ঠিক হল যে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু করা হবে। মলয়কে গ্রহণ করা হয়। ... সুবিমল বসাকও হাংরি জেনারেশনে যোগ দেয় সেই সময়।'[১৩] এ সব থেকে বোঝা যায়, পুরনো পর্বের হাংরি আন্দোলনকে শৈলেশ্বর, বাসুদেবরা মূল্য দিতে চাইছেন না। 'হাংরি জেনারেশনের অস্পষ্ট সূচনা বলে তাকে নেপথ্যে রাখতে চাইছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তা ঠিক নয়। আন্দোলনের কার্যকারণ সূত্রের নিয়ামক হিসেবে কোনো পর্বকেই তুচ্ছ করে দেখা চলে না। আমাদের মনে হয়, এখানে দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে যতটা না - তার চেয়ে বেশী ব্যক্তিগত তিক্ততার জেরে শৈলেশ্বর মলয় দু'জনেই পারস্পরিক বিরোধিতা করেছেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে ১৯৬২ সালকেই হাংরি জেনারেশনের সূত্রপাতের বছর ধরতে হবে - ১৯৬১ নয়, ১৯৬৩ ও নয়। মলয়ের মগজ থেকেই 'হাংরি জেনারেশন' শব্দবন্ধটি যে উদ্ভাসিত তা ঐ লিফলেটগুলি ছাড়াও, মলয়ের লব্জ প্রয়োগই নিশ্চিত করে। তাই বলে মলয়কে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টাও বলা চলে না। আন্দোলন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় - যে অর্থে হাংরি জেনারেশন একটি আন্দোলন সে অর্থে নয়। 'সবুজ পত্র' কে যদি আন্দোলন বলি সেক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী স্রষ্টা। আজ অবশ্য তাতেও সন্দেহ! "সবুজ পত্র, ছিল এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মুখপত্র। এটা তাঁরই আইডিয়া। সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী তাঁরই দ্বারা মনোনীত।"[১৪] 'কল্লোল' কিন্তু কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, 'কবিতা' অবশ্য একক বুদ্ধদেব বসুরই। যাই হোক, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন একটি যূথবদ্ধতার সৃষ্টি। সেখানে, মলয়, শৈলেশ্বর, প্রদীপ, সুবিমল, বাসুদেব, সুভাষ প্রভৃতি সকলেরই সমবেত অবদান রয়েছে।

হাংরি আন্দোলনের বিস্তার ও তীব্রতায় ১৯৬৪ সালের গুরুত্ব সর্বাধিক। লক্ষণীয়, হাংরি সাহিত্যের বিচিত্র শাখার উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি গ্রন্থ এ বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, প্রদীপ চৌধুরীর, 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' কাব্যগ্রন্থ, মলয় রায় চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ 'শয়তানের মুখ', প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আমার জেনারেশনের কাব্যদর্শন ও মৃত্যু মেধী শাস্ত্র', নাটক 'হিবাকুষা' প্রভৃতি। বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রতনপুর' গল্পটিও ঐ বছরেই 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বোপরি, এ বছরই বেরোয় সেই বিখ্যাত এক ফর্মার হাংরি বুলেটিন যার জন্যে লেখকদের উপর পুলিশী অভিযান চলে। এই সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন সমীর রায় চৌধুরী। পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল 'হাংরি জেনারেশন।' তাতে লেখক ছিলেন, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষ, উৎপলকুমার বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায় চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ। প্রত্যেকটি নামের পদবী আগে নাম পরে - এই ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন প্রদীপ চৌধুরী। যদিও মুদ্রকের নাম ছাপানো যায় নি। কোনো প্রেসই ছাপতে রাজীও হচ্ছিল না পত্রিকাটি। লেখার ধরণ ধারণ দেখেই হয়তো বা। কিন্তু ছাপানো হলে

কফি হাউসে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, কবি লেখকদের আড্ডাখানায়, রেঁস্তোরায় ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হল এই পত্রিকা। মলয় বলেছেন, "আমি তখন পাটনায়। কলকাতায় কফি হাউসে আর অন্যান্য জায়গায় সুবিমল, শৈলেশ্বর, প্রদীপ, বাসুদেবরাই বিলি করলেন।'[১৫] প্রতিক্রিয়া হল মারাত্মক। মলয় জানিয়েছেন,

> "জোড়াবাগান থানায় ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ রাত্তির ৯টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে এফ. আই আর রুজু করেন লালবাজারের প্রেস সেকশনের সাব ইন্সপেক্টর কালীকিংকর দাস। লেখায় অশ্লীলতা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। অভিযুক্ত ঐ সংখ্যার প্রত্যেকে এবং প্রকাশক। মোট এগারোজন। এফ. আই আর নটা পঞ্চান্নতে রুজু হলেও, ওই দিন সকালেই পুলিশ গ্রেফতার করে সুভাষ ঘোষ ও শৈলেশ্বর ঘোষকে, তাদের ঘর তছনছ করা হয়, বইপত্তর ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়, পাড়ায় হমবি তমবি করা হয়, আমহার্স্ট স্ট্রীট লক আপে অজস্র চোর ছ্যাঁচোরদের সঙ্গে পুরে দেওয়া হয়। ... এরপর গ্রেপ্তার হন দেবী রায়, বর্ধমানে। তাঁর ঘরও তছনছ করা হয়। .... কলকাতার দুই সাব—ইন্সপেক্টর সুরেন্দ্রমোহন বারড়ি ও অমল মুখার্জ্জী পাটনা পুলিশের সাব ইনস্পেকটর কৃষ্ণকুমার সিনহাকে সঙ্গে এনে আমাকে আমার আপিস থেকে গ্রেপ্তার করেন ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, দু জনে দুহাত ধরে এবং একজন পিঠের দিকে জামা খামচে ধরে।"[১৬ক]

এর পরে পাটনায় গ্রেপ্তার হন সমীর রায় চৌধুরী। ত্রিপুরায় প্রদীপ চৌধুরী গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করলেও পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হয়। এই প্রথম সাহিত্য করার অপরাধে বঙ্গদেশের ক'জন তরুণকে হাজতে বাস করতে হয়। সমকালীন পত্র পত্রিকার পাতায় এই সব উত্তেজনার বিবৃতি পাওয়া যায়।[১৬খ] ৩রা সেপ্টেম্বর 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'য় সংবাদ এ রকম ঃ অশ্লীল রচনার দায়ে স্কুল শিক্ষক গ্রেপ্তার এবং তার ঘর থেকে অনেক অশ্লীল বই পুলিশ উদ্ধার করেছে।

একই দিনে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় খবরের শিরোনাম এ রকম ঃ TWO HUNGRY GENERATION WRITERS ARRESTED. খবরের শেষে ঐ দুজন সম্পর্কে লেখা হয় 'They are said to belong to a New School of Poetry Calling themselves,

'The Hungry Generation.' 'যুগান্তর' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভ এরকম ঃ যে ক্ষুধা জঠরের নয়।' ফলে কলেজ ষ্ট্রীট কফি হাউসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে আর কেউ যেতে চান না। অনেকে কলকাতার বাইরে চলে যান। এদিকে বোম্বাইয়ের BLITZ একটি সুপরিসর প্রতিবেদন বার করে ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ সালে। শীর্ষনাম দেয় ঃ EROTIC LIVES AND LOVES OF HUNGRY GENERATION এই রচনায় প্রদীপ চৌধুরী ও সুবো আচার্যের কলকাতার দিনলিপির বর্ণনা দিয়ে হাংরি আন্দোলনকে উচ্চকিত করা হয়। বাংলা কাগজগুলির নিন্দামন্দের বিপরীত ব্যাপারগুলি ঘটে চলে ইংরাজি পত্রিকাগুলিতে। এমনকি কলকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকাতেও। বিশেষ প্রভাব ফেলে TIME পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে। এটি বেরোয় ২০শে নভেম্বর ১৯৬৪ সালে। শীর্ষনাম থাকে ঃ India : The Hungry Generation. পত্রিকাটির একটি মন্তব্য এখন খুবই মজার মনে হয় — "... five scurffy young poets were hauled into calcutta's Bank Shall court for publishing works that would have melted even vatsayana's pen The Hungry Generation had arrived." 'টাইম' পত্রিকা হাংরিদের অ্যালেন গীনসবার্গের প্রভাবজাত বলেও ঘোষণা করে। যাই হোক, এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রচার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের চাপ সরকারের উপর পড়ে। উক্ত কাগজগুলো ছাড়াও 'দর্পণ', 'জনতা', 'সপ্তাহ', LINK, ধর্মযুগ, প্রভৃতি কাগজে হাংরিদের নিয়ে নানা ধরণের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এভাবে সমস্ত ১৯৬৪ সাল হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের একটি তুঙ্গ বিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের ক্লাইম্যাকস বললে, ১৯৬৫ সালকে বলতে হয় De-nouncement : পুলিশী হস্তক্ষেপের কারণে আন্দোলনকারীদের সংঘ ভেঙে যায়। 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার ৮ম সংখ্যার দশজন লেখক এবং প্রকাশক সমীর রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হলেও শেষ পর্যন্ত মলয় রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধেই মামলা চলতে থাকে। অভিযোগ দায়ের হয়েছিল জোড়াবাগান থানায়। P. S. Case NO. 360 dated 2.9.64 U/S 120B / 292 PC. অভিযোগ হচ্ছে ঃ Entering into a criminal conspiracy for an Unathorised publication to wit a book l et. Hungry Generation and thereby continued its circulation to corrupt the minds of the common reader. মলয় লিখেছেন, ''মলয় দেবী সুভাষ, প্রদীপ, সমীর, শৈলেশ্বর, সুবিমল, রামানন্দ, সুবো, উৎপল এবং বাসুদেবের নামে অ্যারেষ্ট ওয়ারেন্ট বের হয় ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১২০বি এবং ২৯২ ধারা ভাঙবার দরুণ। গ্রেপ্তার হন প্রথম ছয় জন। হাত কড়া পড়িয়ে কোমরে দড়ি বাঁধা হয় আমাদের। সকলের চাকরিতে টানাটানি আরম্ভ হয়।''[১৭] ফলে, ১৯৬৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর আলিপুর

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের ৯ নং কোর্টে উক্ত অষ্টম সংখ্যা হাংরি জেনারেশন পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত মলয়ের 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হয়। মলয় রায় চৌধুরীর জরিমানা হয় দু'শ টাকা, অনাদায়ে একমাসের জেল। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ মলয় কলকাতা হাইকোর্টে রিভিশন আপিল করলে ১৯৬৭ সালের ২৬ শে জুলাই উচ্চতর আদালত নিম্নতর আদালতের রায় বাতিল ঘোষণা করে মলয়কে বেকসুর খালাস করে দেন। মলয় বলেন, 'তার পরদিন থেকে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিই এবং ক্রমশ নিজেকে একাকীত্ব দিয়ে ঘিরে ফেলি।'[১৮] ডঃ উত্তম দাশ বলেছেন, 'মলয়ের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ সত্য নয়। হাইকোর্টের রায়ের পরেও মলয় দু'সংখ্যা হাংরি জেনারেশন বের করেছিলেন। কিন্তু ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক আর জোড়া লাগেনি। ১৯৬৮ সাল থেকে মলয়ের স্বেচ্ছানির্বাসন। প্রায় ষোল বছর মলয়ের অজ্ঞাত বাসের কাল। ১৯৮৪ সালে মলয় পুনরায় ফিরে এলেন লেখার জগতে।'[১৯]

এ প্রসঙ্গে মলয়ের বিশ্লেষণ এরকম ঃ

> "..... আমি মনে করি ১৯৬৫ সনের মে মাসের তিন তারিখ হাংরি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে ভেঙে যায়। কেননা, সেই দিন ব্যাংকশাল কোর্টে আমাকে যে চার্জশিট দেয়া হয়, তার সঙ্গে হাংরিদের দেয়া জবানবন্দীগুলি জনা জানি হয়ে যায়। তারপর আন্দোলনকে কিছুদিন আমি হিঁচড়ে নিয়ে যাই, কিছুদিন শৈলেশ্বর, কিছুদিন সুবিমল বসাক, তারপর তুমি। হাংরি আন্দোলন এবং হাংরিয়ালিজম দুটো আলাদা ব্যাপার, এটা তো জানো? তেসরা মে ১৯৬৫ এর পর আন্দোলন মুভ করে না, ফলে মুভমেন্টও থাকে না, যা থাকে তা ভরবেগ। ... আমি বলব তুমি একজন হাংরিয়ালিষ্ট হাংরি আন্দোলনকারী নও।'[২০]

এ সব থেকে বোঝা যায়, মলয় হাংরি আন্দোলনের উত্তুঙ্গ অবস্থাটুকুর পরের পর্যায় গুলিকে আর আন্দোলন বলতে রাজী নন। হাংরি চেতনার ক্রমপ্রসারণ হিসেবেই ঐ স্তরগুলোর বিন্যাস করতে চান তিনি। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে। বিশেষত ১৯৬৫ সালের পরই যখন হাংরি সাহিত্যের মূল্যবান রচনাগুলি আমরা লাভ করছি এবং আন্দোলনের প্রভাব ক্রমে উভয় বঙ্গ ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে বাসুদেব দাশগুপ্তের বক্তব্য মলয়ের বিপরীতে যায়। আর তা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গতও বটে। বাসুদেব বলেন,

> ১৯৬৫ সালকে বলা যায় হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠার বছর। কারণ ঐ বছরেই হাংরি জেনারেশন লেখকদের গ্রন্থগুলো পর পর প্রকাশিত

হতে থাকে। ১৯৬৫ সালের জুন মাসের মধ্যে মলয়ের 'মৃত্যুমেধী শাস্ত্রী', 'আমার অমীমাংসিত শুভা', 'জখম', প্রদীপ চৌধুরীর 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি', 'চর্মরোগ', সুভাষ ঘোষের 'আমার চ'বি' বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা', সুবিমল বসাকের 'ছাতামাথা' প্রকাশিত হলে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'জেব্রা' প্রথম সংকলন। ঐ সংকলনে আমাদের সকলের লেখাই ছিল, বাদ পড়েছিলেন দেবী রায়, আর দুটি নতুন নাম যুক্ত হয়েছিল ত্রিদিব মিত্র ও তপন দাস। ঐ বছরই শারদীয়া 'দেশে' প্রকাশিত হয় সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বিবর'।[২]

শুধু এটুকু নয়, ১৯৬৫ সালে সুবিমল বসাক বার করেন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিক'। ওতে হাংরি অনেক কবি লেখকরাই লিখতে শুরু করেন। ১৯৬৫ সালেই কৃষ্ণ গোপাল মল্লিক তাঁর পত্রিকা 'গল্প কবিতা'র সূত্রপাত করেন। এই পত্রিকায় শুধু হাংরিদের লেখা নয়, হাংরিদের উপর সত্য গুহের আলোচনাও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৬৫ সালেই ফাল্গুনী রায় হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৮১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধিস্থানীয় হাংরি কবি। তাঁর সাহিত্য চর্চা ছাড়াও, জীবনযাপন প্রণালী ছিল বিচিত্র যা এই রাজ্যে এখনও একটি মিথ হয়ে আছে। সুতরাং ১৯৬৫ সালেই আন্দোলন ভেঙ্গে গেছে এ কথাটি আংশিক সত্য মাত্র। বরং ভাঙনের পরও তা নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে আশির দশক পর্যন্ত হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের নানা রূপ, স্তর ও বিকাশ তাই লক্ষ করা গেছে। সাহিত্য বিচার পর্বে এই গোটা সময়সীমাকেই আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

তথ্যসূত্র

১. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ - ৮।

২. তদেব পৃ ৯।

৩. তদেব পৃ ১০।

৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ১৭।

৫. তদেব।

৬. তদেব, পৃঃ ১৮।

৭. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪ পৃ ৮।

৮. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ৩৯।

৯. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, তদেব, পৃ ১২৪।

১০. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ ঃ ৬১।

১১. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ২৯-৩০।

১২. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৪।

১৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, তদেব, পৃ ঃ ৪৩।

১৪. অন্নদা শঙ্কর রায়, মুখবন্ধ, সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০০। পৃঃ -০।

১৫. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুকস্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪ পৃ ঃ ৩৭।

১৬ক তদেব, পৃঃ ৩৮।

১৬খ. উল্লিখিত রিপোর্টগুলির কিছু অংশ গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত হল।

১৭. মলয় রায় চৌধুরী, হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, ১৯৯২, কলকাতা, পৃঃ ৬৫।

১৮. তদেব, পৃঃ ৬৬।

১৯. উত্তম দাশ, ক্ষুধিত প্রজন্ম ঃ বিদ্রোহ না সন্ন্যাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকতা, ২০০২, পৃ ঃ ১৪৮।

২০. মলয় রায়চৌধুরী, অরুণেশ ঘোষকে সাক্ষাৎকার, জিরাফ পত্রিকা, কোচবিহার, ১৯৮৫, পৃ ঃ ১৩।

২১. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ ১১৯।

পঞ্চম অধ্যায়

আন্দোলনের পরিণতি পর্ব

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বিস্তার ও পরিণতির ক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যাপার অনুধাবণযোগ্য। প্রথমতঃ হাংরি জেনারেশন বুলেটিন ও পত্রিকার অবলুপ্তি। রাষ্ট্রীয় দমন জনিত কারণেই তা ঘটে কিন্তু অন্য নামে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশ এবং সেগুলিতে ঐ একই কবি লেখকেরা অংশ গ্রহণ করেন ; কিছু কিছু নতুন কবি, লেখকও অংশ গ্রহন করেন। দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখক এই আন্দোলন থেকে বার হয়ে যান । কেউ কেউ পুলিশের ভয়ে, অথবা আনন্দবাজার যুগান্তরের মতো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার ইচ্ছায়। যথা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উৎপল কুমার বসুর মত কেউ কেউ চলে যান বিদেশে। বিনয় মজুমদার, শম্ভু রক্ষিতের মতো কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোনো পত্রিকা বা গোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে, স্বাধীনভাবে ছোট খাটো নানা পত্রিকায় লেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। শক্তি, সন্দীপন বিনয়, সুবো আচার্য, অরনি বসুর মতো অনেকেই কৃত্তিবাস পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। সুবো আচার্য হাংরি আন্দোলনের মধ্যেও সমান্তরাল ভাবে থেকে যান । তৃতীয়তঃ মকদ্দমার কারণে আন্দোলনের সংহতি বিনষ্ট হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক বিশ্বাসে চিড় ধরে - সম্পর্কের বাঁধন আর থাকে না। আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মলয় রায় চৌধুরী সাহিত্য জগৎ থেকেই নির্বাসন নিয়ে পাটনায় গিয়ে নতুন দাম্পত্য শুরু করেন। তাঁর মনে হয়, সাহিত্যের চেয়ে জীবন, বিশেষত অর্থ সম্পদ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। মোট এগারোজন অভিযুক্ত হলেও, প্রাথমিক স্তরেই বাকী দশজন মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় এবং একমাত্র মলয়ই সোপর্দ হওয়ায় ভয়ংকর একাকীত্বের বোধ তাঁকে গ্রাস করে। মোট কথা, আন্দোলন থেকে বিছিন্ন হয়ে যান তিনি। চতুর্থতঃ আন্দোলনটি কেন্দ্রাভিমুখীনতা থেকে বিচ্যুত হয়। শৈলেশ্বর, বাসুদেব সুভাষ, প্রদীপ একদিকে একটি অবিন্যস্ত আন্দোলন পরিচালনা করেন, অন্যদিকে সুবিমল বসাক, দেবী রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁদের পত্রপত্রিকায় সমধর্মী লেখকের লেখা ছাপাতে থাকেন। আন্দোলনের প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হতে থাকে ক্রমশঃ। তখন উঠে আসে অন্য এক তরুণ সম্প্রদায়, তাঁরা হাংরি আন্দোলনের নতুন প্রজন্ম। গড়ে ওঠে অন্য এক ইতিহাস।

যাইহোক, হাংরি জেনারেশন পত্রিকা উঠে যাবার পর এবং নিঃসঙ্গ মলয় রায় চৌধুরীর মামলা চলাকালীন প্রথমে তাঁরই পত্রিকা 'জেব্রা' এবং সুবিমল বসাকের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৯৬৬ সালে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র দ্বিতীয় সংকলন বার হয়। ১৯৬৭ সালে মলয়ের 'জেব্রা' পত্রিকার দ্বিতীয় এবং শেষ সংকলনটি বেরিয়ে যায়। ১৯৬৮ সালে 'হাংরি' জেনারেশন স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত' পত্রিকাটি বার হয়। সম্পাদক ও প্রকাশক বাসুদেব দাশগুপ্ত। ত্রিপুরায় প্রদীপ চৌধুরীও তাঁর পত্রিকা 'ফুঃ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি বার করে ফেলেন। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলন ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত হয়, সেখানে সম্পাদক সুভাষ ঘোষ। তৃতীয় সংকলন ১৯৭৫ সালে, সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী। চতুর্থ সংকলন ১৯৭৭ সালে, সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ, পঞ্চম সংকলন ১৯৭৮ সালে, সম্পাদক শৈলেশ্বর ঘোষ। ৬ষ্ঠ সংকলন 'ক্ষুধার্ত' ১৯৮১ সালে শৈলেশ্বরেরই সম্পাদনায় বার হয়। সপ্তম সংখ্যার সম্পাদকও তিনিই, প্রকাশকাল ১৯৮৪। উল্লেখ্য যে, এখানে শৈলেশ্বরের কবিতার উপর মলয় রায় চৌধুরী লিখেছিলেন প্রবন্ধ। এরপর আর 'ক্ষুধার্ত' বেরোয়নি। শেষ সংখ্যা 'ক্ষুধার্তে'র শেষতম লেখাটির মলয় রায় চৌধুরীর। একটা জিনিস বোঝা যায়। তখনও পর্যন্ত শৈলেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। সুতরাং সরকারী মামলায় একক অভিযুক্ত হওয়ার অভিমানই মলয়ের নিঃসঙ্গ হবার কারণ নাও হতে পারে। ১৯৮৪ সালেই শিবনারায়ন রায় তাঁর 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার কার্ত্তিক পৌষ সংখ্যায় অবশ্য লিখেছিলেন, ''পাটনায় ছেলে মলয় এখন লক্ষ্ণৌতে বাস করেন। অভিমান করে দীর্ঘকাল তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন।'' মলয় বলেছেন যে .....

> আমি লেখা ছেড়ে দিই -বা লেখা আমাকে ছেড়ে দেয় - সম্পূর্ণ অন্য কারণে। মামলার গন্ডগোলের মাঝে আমার জীবনে একের পর এক নানান ঘটনা ঘটতে থাকে। সে সব এত ব্যক্তিগত যে, তার গোপনতাই যেন সুস্থতা মনে হয়। সেগুলো গোপন রাখার মধ্যে একাকীত্বের ভালো লাগা আছে .... যতটুকু মনে করতে পারি,জুলাই ১৯৬৭ এ হাইকোর্টে মকদ্দমা জিতে যাবার পর আর কোনও লেখা লিখিনি। লেখার জন্য স্থির হয়ে বসার মানসিকতা ছিল না।অস্তিত্বের অদম্য অস্থিরতায় আমি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলুম। ১.

তবে, মলয়ের লেখা থামানোর সঙ্গে সঙ্গেই হাংরি জেনারেশন আন্দোলনটি শেষ হয়ে যায় এ যুক্তি ধোপে টেকে না। বিশেষ করে তাঁর লেখা ছেড়ে দেবার কারণটি যেখানে অনেক খানি ব্যক্তিগত। এটা ঠিক যে, শেষ পর্যন্ত মলয় একাই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র বল্লভ, সমীর বসু, প্রমুখেরা রাজসাক্ষী হয়েছিলেন, পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিয়েছিলেন - ইতিহাস সে কথাই বলে। যদিও পুলিশের জবানবন্দী পুরো গ্রহনযোগ্য নয় বলে চার্জশীট গঠন হবার পর সে গুলিকে চ্যালেঞ্জ করা যায়।মলয় লিখেছেন, ''দেবী রায় মুচলেকা লিখতে অস্বীকার করেছিলেন, সম্ভবত তাঁর সাব অল্টার্ন বোধের দরুণ। বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবো আচার্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সে সময়ে অ্যাবসকন্ড করেছিলেন বলে এজাহার দিতে হয় নি।''২ লক্ষণীয়, শৈলেশ্বর ও সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ হাংরি সাহিত্যিকরা ছাড়াও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রমুখ কবিরা আদালতে জোরালো ভাবেই মলয়ের কবিতার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন - যার ফলে তিনি অভিযোগ মুক্ত হতে পেরেছিলেন। সুতরাং সতীর্থদের সঙ্গে মলয় রায় চৌধুরীর সম্পর্ক তখনও চরম তিক্ত স্তরে যায় নি। তাই ৭ম সংকলনের 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় শৈলেশ্বরের কবিতার উপরে প্রবন্ধ লিখতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। আসলে ঐ ১৯৮৪ সালেই 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় 'হাংরি আন্দোলন পিছন ফিরে দেখা' প্রবন্ধটি বার হবার পর শৈলেশ্বর, সুভাষ, বাসুদেবদের সঙ্গে মলয়ের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রে মলয়ের 'হাংরি কিংবদন্তী' স্মৃতি চিত্রণ ধারাবাহিক শুরু হলে এবং ১৯৯৪ সালে তা দে বুক ষ্টোর থেকে গ্রন্থাকারে পরিবেশিত হলে উক্ত সর্ম্পকের চূড়ান্ত অবনমন ঘটে। শৈলেশ্বর বলেছেন, মলয় সত্যের অপলাপ করেছেন, প্রচারের লালসায় নিজেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টা বলছেন। বাসুদেব দাশগুপ্ত বলেছেন, ''১৯৬৫ সাল থেকেই আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি হাংরি জেনারেশন বলতে মলয় রায় চৌধুরী শুধু নিজেকেই বোঝাতে চাইছেন।''৩

এক দিক থেকে শৈলেশ্বর, বাসুদেবদের অভিযোগ ঠিক, অন্যদিক থেকে মলয়েরও এরকম ভাবনার পিছনে কিছু যুক্তি আছে। কারণ আন্দোলনের মূল পরিকল্পনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়া আদালতের চূড়ান্ত লাঞ্ছনাও তো তাঁকেই একা ভোগ করতে হয়েছে। সতীর্থরা যে সে ভাবে মলয়ের পিছনে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন - তেমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে না। তবু অসীম আত্মত্যাগের পাশাপাশি মলয়ের স্বেচ্ছানির্বাসনও বেমানান। তাঁর কারণ যাই হোক না কেন। আন্দোলনের দাবি, নেতার যোগ্যতার কাছে অন্য রকমই প্রার্থিত ছিল। যেমন প্রার্থিত ছিল সতীর্থদের সংঘবদ্ধ সহযোগিতা। শিবনারায়ন রায় ঠিকই বলেছেন,-

> শহীদ হওয়া শিল্পীদের দায়িত্ব নয়; কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ এবং বিপন্ন বন্ধুর প্রতি আনুগত্য না থাকলে কোনও আন্দোলনই শক্তি অর্জন করতে পারে না। শিল্পকৃতির জন্য আন্দোলন জরুরী নয়, শিল্পী ও ভাবুকদের মধ্যে অনেকেই নির্জনে সাধনা করবার পক্ষপাতী। কিন্তু কোনও আন্দোলন - শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে হোক আর জীবনের জন্য বিন্যাসেই হোক - প্রভাব ফেলতে পারে না, যদি না সেই আন্দোলনে যাঁরা অংশভাক তাঁরা সৎ, নীতিনিষ্ঠ এবং পরস্পরের কাছে নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হন।৪

এসব কারণে বলা যায়, ১৯৬৫ সালের পর হাংরি জেনারেশন আন্দোলন গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে যায়। বিশেষতঃ মলয় রায় চৌধুরী এই আন্দোলন থেকে বিছিন্ন হয়ে যান। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার একাধিক সম্পাদক বদল থেকে এ ইঙ্গিতও আসে যে এই আন্দোলনটি আর কোনো একক ব্যক্তির হাতে থাকবে না। অরুণেশ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অন্দোলনের এই পর্বান্তরগুলোকে মলয় একেবারে অস্বীকার করেননি। মলয়ের 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সুবিমল বসাক লিখেছেন,-

> মকদ্দমা চলাকালীনই আমাদের নিজেদের মধ্যেও সুসম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। ডোমিনেট করার প্রবণতা দেখা দেয় .....আমরা প্রত্যেকে এই অবস্থার জন্য সমান দায়ী। মলয় হয়তো ভেবেছিল, সে থেমে যাওয়ায় আন্দোলন থেমে যাবে... কিন্তু আন্দোলন থামে নি। আন্দোলন থেমে থাকে না। নেতৃত্বও কখনও কারো পায়ের কাছে গেড়ে বসে না। যে আন্দোলন এত গভীর ভাবে আমাদের রক্তে মিশে গিয়েছিল, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না। হাংরি জেনারেশন একটি পরিকল্পিত সাহিত্য আন্দোলন। প্রত্যেকটি বিষয়ের ম্যানিফেষ্টোকে সামনে রেখেই সকলেই নিজস্ব হাতিয়ার তুলে ধরেছিল।

> সকলেরই জীবন ছিল আলাদা; নিজস্ব জীবন,
> নিজস্ব বোধজাত রচনায় কোন রকম ভেজাল ছিল না।
> এদিকে এই আন্দোলন তারপর লাগাতার এগিয়ে নিয়ে
> যায় বাসুদেব শৈলেশ্বর, সুভাষ, প্রদীপ, ত্রিদিব অনেকে।
> ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত খবর, ফুঃ স্বকাল, প্রতিদ্বন্দ্বী, উন্মার্গ এই
> সব পত্রিকা বেরোতে থাকে।৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ক্ষুধার্ত' খবরের সম্পাদক ছিলেন সুভাষ ঘোষ, 'উন্মার্গে'র ত্রিদিব মিত্র। এছাড়া ১৯৬৭ সালে শৈলেশ্বর ঘোষের সম্পাদনায় 'ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ' বার হয়েছিল। দেবী রায়ের 'চিহ্ন' বার হয়েছিল ষাট দশকেরই মধ্যে। মোটকথা, আন্দোলনের ঘনীভূত অবস্থা আর রইল না। এরই মধ্যে শৈলেশ্বর, সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, ফাল্গুনী রায়, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্যেরা আশির দশকের শেষ পর্যন্ত যূথবদ্ধ রইলেন। পরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্তব্ধ হয়ে গেলেও তাঁদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব রচিত হয় নি। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও অটুট ছিল ও আছে। ছিল বলার কারণ, ইতি মধ্যেই ফাল্গুনী রায়, সুভাষ ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে একমাত্র প্রদীপ চৌধুরী ছাড়া বাকিদের সঙ্গে মলয় রায় চৌধুরীর সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, সুবিমল বসাক, দেবী রায়, মলয় রায় চৌধুরী মিলে একটি গোষ্ঠী। হয়তো সে কারণে, 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলনে' এঁদের রচনাকর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়নি বা পাওয়া যায় নি। কিন্তু দেবী রায়ের সঙ্গেও মলয়ের সম্পর্ক আর উষ্ণ নেই। ধানবাদ থেকে প্রকাশিত অজিত রায়ের 'শহর' পত্রিকায় এক জায়গায় দেবী রায় লিখেছেন,-

> পরমত সহিষ্ণুতা বলে একটা শব্দ আছে, মলয়কে তা
> নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পরামর্শ দিই ..... মলয় এক
> জায়গায় লিখেছেন হাংরি আন্দোলনকারী হিসেবে যাঁরা
> পরে খ্যাত হন, এঁদের কারুর সঙ্গে অ্যালেন গীন্সবার্গের
> আলাপ হয় নি। কথাটি মলয় ঠিক লেখেন নি। .... মলয়
> এ রকম একজায়গায় লিখেছেন। '.....এন (Debi
> Roy) has no knowledge of world
> literature, 'He belongs to lower caste. ....
> যিনি স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে এতো সিরিয়াস ভেবে থাকেন,

সেই তিনিই কিভাবে আরেক জনের সম্পর্কে শালীনতা বিসর্জন দিয়ে কেন যে নিছক, মুখরোচক কিংবদন্তী লেখেন ?

মলয়ের স্ত্রী সলিলা রায় চৌধুরী তাঁদের বিবাহ উত্তর দাম্পত্যের বর্ণনায় সাহিত্যচর্চা নিয়ে বলেছেন, ''মলয়ের বন্ধুবান্ধব দেখিনি বড় একটা। সাহিত্যিক দু-একজন দেখা করতে চাইলেও এড়িয়ে যেত। বেশ খেপে ছিল বন্ধুদের উপর। সুবিমল বসাক কয়েক বার এসে নন্দার চায়ের দোকান থেকে মলয় মলয় বলে ডাক পাড়ত, তবুও সাড়া দিত না'' ৬ সুবিমল বসাকের জবানীতেও একই ছবি,-

> তারপর পাটনায় যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, ভুলেও সে কখনও সাহিত্য সর্ম্পকে, বন্ধুবান্ধব সর্ম্পকে, লেখালেখি সর্ম্পকে উল্লেখ করেনি। শুধু, একদা প্রসঙ্গত বলেছিল - মানুষ রুটির জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। মলয় তখন ঘোর সংসারী, সন্তানের পিতা, সফল স্বামী, দায়িত্বশীল অফিসার - পরিপূর্ণ জমাটি। জীবনের ভিন্ন আশ্রয় বলে তখন আর কিছু নেই, দেখে মন খুব দুঃখিত হয়ে পরে আমার। আমিও মলয় সর্ম্পকে ক্রমশ: আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।৭

এসব থেকে একটি জিনিস স্পষ্টতা পায়, মলয় রায়চৌধুরী হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের স্রষ্টা হতে পারেন, কিন্তু নেতৃত্বের জন্য যে ধৈর্য্য, ত্যাগ, একাগ্রতা প্রয়োজন ছিল সে সবের কোনোটাই তাঁর ছিল না। অথবা তিনি নেতা হতেই চাননি। সেই জন্যেই কি প্রথম ইস্তাহারে নেতা হিসেবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন ? সেই জনেই কি ১৯৮২ সালে মায়ের মৃত্যুর পর পুনরায় লেখালেখির জগতে ফিরে এসে মলয় রায়চৌধুরি আর নিজেকে হাংরি ঘরানাতেও বাঁধতে চাননি ? নিজেকে বলেছেন অধুনান্তিক সময়ের সদস্য ? বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মলয় বলেছেন,-

> আমি নিজেকে এখন হাংরি বলে মনে করি না। হাংরি শব্দটা আমার ঘাড়ে চেপে বসে আমার লেখা লেখির পক্ষে অসুবিধে আরম্ভ করেছে। ..... আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠান বিরোধীও বলতে চাই না।

আমি মলয় রায়চৌধুরী। আমার ভাবনা চিন্তার জন্যে প্রতিষ্ঠানই আমার বিরোধিতা করে। শম্ভু রক্ষিত, দেবী রায় অরণি বসু, উৎপল কুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এঁরা যেমন হাংরি শব্দটাকে ঝেড়ে ফেলেছেন আমিও তা-ই চাই। আমি মলয় রায় চৌধুরী হিসেবে পরিচিত হতে চাই। যাঁরা মনে করেন হাংরি আন্দোলন চলছে, তাঁরা চালিয়ে যান। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে থাকুন। যা ইচ্ছে করুন, তাঁদের বিষয়ে ভাবার সময় আমার হাতে আর নেই।৮

এই জায়গায় শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে মলয়ের দুস্তর ব্যবধান। শৈলেশ্বরের কাছে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন একটি সামাজিক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আন্দোলন। এর একটি স্বকীয় চারিত্র্য আছে - যা থেকে শৈলেশ্বরেরা কখনই ভ্রষ্ট হতে চান নি। অতএব মলয় ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে শৈলেশ্বর লেখেন -

'যা সে নয় তাই নিজেকে সাজাতে গিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে তাঁর এই বিদায়, হাংরি আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র বিচারে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। হাংরি আন্দোলনকে আমরা যথার্থ প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সত্রপাত সেই সময়েই ঘটে। মলয় স্ববিরোধিতার জালে আটকে পড়ে। তাঁর বিদায় আমাদের আন্দোলনকে সুস্থ চরিত্র দিতে সাহায্য করেছিল। এর পরের ২৫ বছর অনেক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া গেছে।৯

এবং

> একজন লেখকে সারাজীবন ধরে অসম্ভব কষ্ট, ত্যাগ এবং ধৈর্যের মধ্য দিয়ে নিজের রচনাকে এবং চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতাকে সত্য করে তুলতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল আরও ভয়ংকর, কারণ আমাদের কথা ও কাজের দিকে সকলের তীক্ষ্ণ নজর ছিল। হাংরি সাহিত্য বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এবং মলয়ের বক্তব্যের মধ্যে একটা বিরোধ প্রথমেই তৈরি হয়েছিল। সে লিখেছিল, অবক্ষয়ের নির্বিচার দ্বিধাহীন আত্মসাৎ প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্যই' ১০ এই সাহিত্য। আমাদের কাছে এটা দাঁড়ায় বস্তু সমুহের ষড়যন্ত্রময় অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ।১১

দুটো বক্তব্যের গতিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি তাই হয়, তবে তো আন্দোলনের ভাঙন অনিবার্য। বাস্তবে ব্যাপারটা তা নয়, দু-জনের মধ্যেই প্রচলিতের বিরুদ্ধতা ছিল। বরং মলয়ের মত দিয়ে শৈলেশ্বরের কবিতা এবং শৈলেশ্বরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে মলয়ের কবিতা বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সহজতর। সুবিমলের পূর্বোক্ত কথাই ঠিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছিল। পুলিশ, আদালত, চাকুরি ও সামাজিক আশ্রয়াভাব মধ্যবিত্ত বাঙালী কবি লেখকদের ভীত, সতর্ক ও সন্দেহপ্রবণ ও করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে সমীর রায় চৌধুরীর ভাবনা যথার্থ,-

> তবে আমার মনে হয় মামলায় এজাহার ও সাক্ষ্য দুই স্তরে শৈলেশ্বর ও সুভাষের ভুমিকা সবচেয়ে সঠিক ছিল। তখন যে জুলুমের পরিবেশ ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে। এরপর হাংরি ব্যাপারটাকে অন্যেরা যেমন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, শৈলেশ্বর, সুভাষ, বাসুদেব, প্রদীপ ও সুবিমল তেমনই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যেমে ক্রমশ আন্দোলনের স্পষ্ট স্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন। ১২

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের পরিণতি বিচারে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ব্যক্তিগত কলহকে বাদ দিলেও চলবে। শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্তেরা এবং প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখেরা নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যে এই আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেটা গুরুত্বপূর্ন। এমনকি মধ্যে - সত্তরের নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকেও নিজস্ব ধ্যানধারণায় সমান্তরাল ভাবে তাঁরা যে আন্দোলনটিকে পরিচালিত করেছিলেন তাঁতে এই আন্দোলনের পরিনতিকে ফলপ্রসূই বলতে হবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায়চৌধুরী, অরুনেশ ঘোষকে সাক্ষাৎকার, জিরাফ পত্রিকা, সংকলন - ১০, কোচবিহার, ১৯৮৫, পৃ: ৩ ।

২. মলয় রায়চৌধুরী, 'এবং' পত্রিকা, ৫৫ সংখ্যা /কলকাতা , ১৯৯৯ পৃ :১০৭ ।

৩. বাসুদেব দাশগুপ্ত, চিঠি, শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ: ১২০ ।

৪. শিবনারায়ন রায়, সম্পাদকীয়, জিজ্ঞাসা, কার্তিক পৌষ ১৩৯১। হাওয়া ৪৯, ২০০১ থেকে সংকলিত, কোলকাতা, পৃ: ২২৬ ।

৫. সুবিমল বসাক, সংযোজন, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কোলকাতা, ১৯৯৪ পৃ: ১১৬-১১৭ ।

৬. সলিলা রায়চৌধুরী, আমার উনি এবং তারপর, হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ২০০১, পৃ: ২১১ ।

৭. সুবিমল বসাক, সংযোজন, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কোলকাতা, ১৯৯৪ পৃ: ১১৬ ।

৮. মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি সাক্ষাৎকারমালা, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ: ৫৮ ।

৯. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ: ১২০ ।

১০. তদেব পৃ: ৬১ ।

১১. তদেব পৃ: ৬১ ।

১২. সমীর রায়চৌধুরী, বয়ান, হাংরি কিংবদন্তী, দে বুক ষ্টোর, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ: ১২৩-১২৪ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্দোলনের উত্তর প্রভাব

ষাটের দশকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন যখন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে - তখন সুদূর উত্তরবঙ্গেও এর প্রভাব অনুভূত হয়। বিশেষ করে ১৯৬৪ সালে মামলায় পর্যুদস্ত হবার ফলে আন্দোলনকারীদের কিছু নিরাপদ আশ্রয়ও দরকার হয়। এই আশ্রয় যতখানি না ব্যক্তির তার চেয়ে পত্রিকার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। প্রদীপ চৌধুরী-ই একমাত্র যিনি ত্রিপুরায় তাঁর স্বগৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। নইলে তাঁর সাহিত্য চর্চা চলছিল কলকাতাতেই। যাই হোক, 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকা যখন ১৯৬৮ সালে বন্ধ হয়ে গেল, তখন 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরোলো ১৯৬৯ সালে অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে। প্রকাশনা ও সম্পাদনা - বাসুদেব দাশগুপ্ত। এরপর এই পত্রিকারই তৃতীয় সংকলন বেরোলো কোচবিহার থেকে। প্রকাশক- অরুণেশ ঘোষ; প্রকাশকাল ১৯৭৫। স্মর্তব্য যে, এক বছর আগেই শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে অরুণেশের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে কলকাতায়। ১৯৭৪ এর মাঝামাঝি 'জিরাফ' পত্রিকার ৬ষ্ঠ সংকলনে শৈলেশ্বরের 'অপরাধীদের প্রতি' কাব্যগ্রন্থের আলোচনাও করেছিলেন অরুণেশ। এই তথ্যগুলো জীবতোষ দাসের 'রোবট' (১৯৮২) পত্রিকায় অরুণেশ ঘোষের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়। সেখানে অরুণেশ আরও বলেন,-

> 'হাংরিরা প্রচলিত ধারায় লিখতে চায়নি, তাঁরা শিল্প সাহিত্য করার চাইতে জোর দিয়েছে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দিকে,জীবন ও সত্য অভিজ্ঞতাকে তাঁরা মূল্য দিয়েছে বেশী। ..... জীবনকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল ..... কলকাতা থেকে দূরে বসে ভাবতাম, এ আমারই স্বপ্ন - যা একটা রূপ পেতে চলেছে। ছেলেবেলা থেকে এই স্বপ্নই আমি দেখে এসেছি। অস্থির ও উন্মাদ আমি ছোট শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি একই রকম উন্মাদনা নিয়ে....

> আমি যখনই যাই শৈলেশ্বরের বাড়িতে তখন প্রায় সবাই ধরে নিয়েছে হাংরিরা শেষ হয়ে গেছে। প্রাথমিক উন্মাদনা কেটে যাবার পর সঙ্গে সঙ্গে ঝরে গেছে অনেকেই - যাঁরা রাতারাতি কুখ্যাত হয়ে বিখ্যাত হতে চেয়েছিল। তাঁরাও হতাশ - আর এটাই ছিল আমার কাছে স্বস্তির কারণ ....।১

লক্ষণীয়, অরুনেশ ঘোষের 'জিরাফ' পত্রিকাটি যেন হাংরি জেনারেশন আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার বহন করে। সমাজও সভ্যতা সর্ম্পকে 'জিরাফ' পত্রিকা 'ক্ষুধার্ত' বা 'জেব্রা' পত্রিকার বিষয় বিন্যাস ও ভাবনাকে অস্বীকার করে নি। এমনকি লেখক তালিকাতেও হাংরি কবি - লেখকরাই প্রধান। 'জিরাফ' ১০ম সংকলনের শিরোনামে বিশেষণটি ছিল এ-রকম 'ক্ষুধার্ত চেতনার কাগজ'। সম্পাদকীয়তে অরুণেশ লেখেন -

> আজকের যে ক্ষুধার্ত তা মলয়ের হাংরি থেকে আলাদা। .... ক্ষুধার্ত আন্দোলন কিছু সময়ের জন্য থেমেও গিয়েছিল। আবার সে চেতনা সংকট কাটিয়ে, নৈরাশ্যকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জেগে উঠেছে। যেখান থেকে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন, স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে আজ আর দাঁড়িয়ে নেই। .... ক্ষুধার্ত স্পিরিটির মৃত্যু হয় নি।২

শৈলেশ্বর ঘোষও লিখেছেন, ''নিজের কিছু লেখা আর 'জিরাফ' পত্রিকা নিয়ে অরুণেশ আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়। ..... মানসিকভাবে সে তখন হাংরি জেনারেশনের অংশীদার। তাঁর লেখায় এর ছাপ স্পষ্ট।''৩ মনে রাখা প্রয়োজন, অরুণেশের 'জিরাফ' পত্রিকার ১০ম সংকলনই শৈলেশ্বর ঘোষ ও মলয় রায় চৌধুরীর বিবাদকে প্রকাশ্যে প্রখর ভাবে নিয়ে আসে। সেখানে অরুণেশ উক্ত দু-জনের দুটি সাক্ষাৎকার ছাপেন। সেটি প্রকাশ পেলে শৈলেশ্বর মলয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া, অরুণেশ নিজেও মলয়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন সম্পাদকীয়তে। এই ব্যাপারটি ঘটে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে। একদিক থেকে মনে হয়, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রথম যুগের পর্ব পেরিয়ে যেন আরও সম্প্রসারিত কোনো পর্বান্তর ঘটতে চলেছে। যদিও ১৯৮৫ তেই 'জিরাফ' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তার প্রভাব থেকে যায় উত্তর বঙ্গের কিছু তরুণ কবিদের মধ্যে।যেমন কোচবিহারেরই জীবতোষ দাসের কথা বলা যায়। জীবতোষ দাসও হাংরি আন্দোলনেরই আরেক সহযোদ্ধা। ১৯৭৫ সালে তিনি প্রথম 'নাড়িভুঁড়ি' পত্রিকাটি বার করেন। ১৯৭৬-এ বার করেন 'রোবট' পত্রিকা। এই পত্রিকাতে হাংরি কবি লেখকদের বহু কবিতা, প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ১৩ বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া রাজা সরকারের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প', মনোজ রাউতের 'ধৃতরাষ্ট্র' প্রভৃতি পত্রিকা শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কোচবিহার থেকে অনুভব সরকার বার করেছিলেন 'টার্মিনাস' ইত্যাদি পত্রিকা । এ গুলির প্রত্যেকটি-ই হাংরি কবি লেখকদের আশ্রয়স্থান হয়ে উঠেছিল। পত্রিকাগুলির মূল ভাবাদর্শও ছিল হাংরি ধ্যানধারনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কলকাতায়, এখন এ 'রকম', 'বর্ণ পরিচয়' চন্দননগরে 'দন্দশূক' অশোকনগরে এই 'সহস্রধারা' প্রভৃতি পত্রিকাও হাংরি কবি লেখকদের প্রচুর লেখা প্রাধান্য দিয়ে ছেপেছে। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে লোকমানসে সজীব রাখতে চেয়েছে। শৈলেশ্বর ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,-

> কলেজ ষ্ট্রীটে 'কাগজের বাঘ'কে কেন্দ্র করে একদল তরুণ লেখক 'এখন এ রকম' এবং 'বর্ণ পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। পরিচালনায় ছিল জীবন সাহা, ল্যাডলী মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ সমাদ্দারের মত তরুণ লেখকরা এঁরা হাংরি লেখকদের কাছাকাছি এলেন। তাঁদের কাগজে হাংরিদের লেখা ছাপা শুরু হল এবং তাঁদের দোকানটি বেশ কয়েক বছর আমাদের মেলামেশার ও তরুণদের সাহিত্য ভাবনার কেন্দ্রে হয়ে পড়ে। কলকাতার আরও বেশ কিছু তরুণ কবি লেখক গোষ্ঠী হাংরি লেখকদের কাছাকাছি চলে আসে। এই সময়েই এক ঝাঁক তরুণ হাংরি আন্দোলনে এসে পড়ে। এদের মধ্যে সৈয়দ সমীরণ ঘোষের কবিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমীরন ছাড়া মনোজ রাউত, অলোক গোস্বামী, জীবতোষ দাস, সেলিম মুস্তাফা, অরূপ দত্ত ও রত্নদীপ ঘোষের নাম উল্লেখ করতে হয়।৪

মলয় রায়চৌধুরীও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলেন। তবে তিনি মনে করেন যে, হাংরি আন্দোলন একটি বিশেষ দেশ-কাল প্রেক্ষিতের ঘটনা। তার পরিসর খুবই ছোট। তাকে বছর বছর ধরে টেনে চলবার কোনো প্রয়োজন নেই। হাংরি আন্দোলন এখন মৃত। হাংরি আন্দোলনের উত্তর প্রভাব বলতে মলয় বোঝেন - একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অভিঘাতের আধুনিক মাত্রাকে। সাহিত্যের ভাবনা ও আকারের একটি নতুন বিন্যাসকে। হাংরি জেনারেশন অন্দোলনকে একটি বিগত ঘটনাবলী হিসেবেই তিনি দেখতে চান। তাই বলেন,-

> তথ্য বিস্ফোরণ আক্রান্ত পুঁজিবলবান অধিবাস্তব বিশ্বে আর কোনো সাহিত্য শিল্প আন্দোলন - পরিবর্তনের দ্রুতির কারণে সম্ভব নয়। বাঙালির উত্তর - আর্দশবাদী সমাজে, নকশাল আন্দোলনের পর যৌথ লোকান্তর সৃজনের ভাবনা নেই বলা যায়। ব্যক্তি প্রজ্ঞা ইউরোপীয় আধুনিকতার মনন সন্ত্রাসে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিক্রয় যোগ্য কৌম নিরপেক্ষ মাল। ছয়ের দশকের আন্দোলনগুলোর সাহিত্য সংজ্ঞার সঙ্গে পরবর্তী কালের সংজ্ঞার মিল নেই, থাকা সম্ভব নয়।৫

তবুও যাঁরা হাংরি ভাবনায় অনুপ্রাণিত তাঁদের সর্ম্পকে মলয়ের প্রতিক্রিয়া এরূপ- ''উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু তরুণ, যেমন রাজা সরকার, অলোক গোস্বামী ইত্যাদি হাংরি বিদ্যুতের একটা কনডেনসার তৈরী করতে চাইছে, করুক''।৬ হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের এই দিকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধু রচনারীতি বা বিষয়বস্তু নয়, একই দৃষ্টিভঙ্গীর একটি আন্দোলন যা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে, এমনকি ত্রিপুরায় পর্যন্ত ছড়াতে পেরেছিল। আর তা শুধু ষাট, সত্তর বা আশি নয়, নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত প্রসারিত। কোচবিহার থেকে নব্বইয়ের দশকেই - সুমিতেশ ঘোষ ও মানস দে'র সম্পাদনায় 'সৃজন' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ পায়, দম দম থেকে অশেষ রায়ের সম্পাদনায় বার হয় 'উদ্বাস্তু' ও সোমা ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'আস্পর্ধা'। এ ছাড়া উত্তর কলকাতার কাশীপুর থেকে অশোক অধিকারী ও সব্যসাচী সেনের 'শব্দভেদী' পত্রিকা। আগরতলা থেকে সাত্ত্বিক নন্দী দু-হাজার সালে 'ক্ষুধার্ত সময়' নামে পত্রিকা বার করে চলেছেন। এগুলির মধ্যে 'শব্দভেদী'র নবম বর্ষ চলছে। কাজেই হাংরি আন্দোলনের উত্তর প্রভাব যে আরও কতকাল বিস্তৃত হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে, হাংরি আন্দোলনের এই উত্তর পর্বে মলয় এবং শৈলেশ্বরের তাত্ত্বিক কড়াকড়ি (rigidity) অনেক কমে এসেছে।

তাই হাংরি আর্দশ কী বা তাকে কিভাবে এই প্রজন্ম ব্যবহার করছেন তা সূত্রাকারে কখনই জানাননি এই নবীন প্রজন্মের কবি , লেখকেরা । কিন্তু ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত, হাংরি এ সব প্রসঙ্গ নিয়ে, শৈলেশ্বর, বাসুদেব, মলয় রায়চৌধুরী প্রমুখ পূর্বসূরীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন এই নবীন লেখক সম্প্রদায়। তাঁদের আমন্ত্রিত লেখা ছেপেছেন এঁরা । এমনকি পুরনো রচনারও পুনর্মুদ্রণ করেছেন। এমনকি এই উত্তরসূরীদের মধ্যে মলয় শৈলেশ্বরের গোষ্ঠী বিভাজনের রেশও রয়ে গেছে। যদিও মলয় , বা শৈলেশ্বর কেউই নবীনদের মধ্যে তাঁদের তথাকথিত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে ছড়িয়ে দেন নি। তবুও যে এরকম হয়েছে তার কারন একেক জনের কাছে মলয়কে বা শৈলেশ্বরকে একেক ভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানের বিরূপতা সত্ত্বেও হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে উত্তর প্রজন্ম কেন গ্রহণ করেছিল তার উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। এটুকু বলা যায় যে, একদিকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আপোষহীন প্রতিবাদ ও রূঢ় বাস্তবতা, অন্যদিকে তাঁদের সংস্কারহীন ভাষা তরুণ প্রজন্মের কাছে অভিনব ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। উপরন্তু তথাকথিত সাব -অলটার্নের জীবন ও বাচনিকতা এ প্রজন্মের কবি, লেখকেরা যেন প্রথম স্পষ্ট ভাবে হাংরি লেখকদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেজন্যই, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রভাব এত ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছে। আর তা আশ্রয় করেছে মূলতঃ মফঃস্বল অঞ্চলগুলিকেই। এমনকি সুদূর ত্রিপুরার পাবর্ত্য গ্রামাঞ্চলকেও। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের উত্তর প্রভাবের ক্ষেত্রে এটাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. সাক্ষাৎকার, অরুণেশ ঘোষ, রোবট ১৯৮২, দ্রষ্টব্য শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫ পৃ: ৯২-৯৩।

২. অরুণেশ ঘোষ, সম্পাদকীয়, জিরাফ পত্রিকা ১০ম সংকলন, কোচবিহার, ১৯৮৫, পৃ: ২৭-২৯।

৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ৯৩।

৪. তদেব, পৃ: ১১১।

৫. মলয় রায়চৌধুরী, (একটি পশ্চিমবঙ্গীয় প্রবলেম্যাটিক; হাংরি আন্দোলন), অব্যয়, শারদীয়া সংখ্যা, কোলকাতা , ১৯৯০, পৃ: ১২০।

৬. মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি সাক্ষাৎকারমালা, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৪৩।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ

(সাহিত্য বিচার পর্ব)

।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

প্রথম অধ্যায়

কবি ও কবিতা

হাংরি সাহিত্যের মুখ্যতম বিকাশ কবিতার মধ্যে। ১৯৬১ সালে যে বুলেটিনটি বেরোয় তা কবিতারই ইস্তাহার। ১৯৬২ সনে 'সম্প্রতি' কাগজে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব'-প্রকাশ লাভ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক ধরপাকড় এবং সমকালীন বঙ্গদেশে যে আলোড়নের উত্তাপ হাংরিরা সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্য দায়ী ছিল কবিতাই। সুতরাং হাংরি সাহিত্য আলোচনায় কবিতাই হচ্ছে প্রধান উপাদান। হাংরি-কবিতাবলী সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত সংখ্যায় সুপ্রচুর। তার মধ্যে প্রধান ধারার মোটামুটি পঁচিশ বৎসরকালের উল্লেখযোগ্য ফসলগুলিকেই আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

ক. মলয় রায়চৌধুরী —

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও কবি মলয় রায় চৌধুরী। তাঁর জন্ম পাটনায়, ইমলিতলায়, ১৯৩৯ সালে। আদি নিবাস হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়। মামার বাড়ি — যশোর। মলয়ের দাদামশায় কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মলয়ের বাবার ঠাকুর্দা যদুনাথ বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার থেকে বিতাড়িত হন উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের বালবিধবাকে বিবাহের জন্যে। এই সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকেই জব চার্ণক কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের ইজারা নিয়ে ছিলেন। মলয়ের বাবার নাম রঞ্জিত রায়চৌধুরী, মা অমিতা রায়চৌধুরী। তাঁর বাবা ছিলেন পাটনার একজন নামকরা ফোটোগ্রাফার আর্টিষ্ট। তবে তাঁর বাবা ও মা স্কুলে পড়াশুনো করেন নি। পড়াশুনোর পাট মলয়ের প্রজন্ম থেকেই শুরু। মলয় ছয় বছর পড়েন মিশনারি স্কুলে। তারপর ম্যাট্রিক পর্যন্ত ব্রাহ্মস্কুলে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক এবং ১৯৬০ সালে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৬১ সালে মলয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পাটনায় নিজের অফিসে মলয় গ্রেপ্তার হন। ষড়যন্ত্র ও অশ্লীল কবিতা লেখার অভিযোগে ১২০ বি এবং ২৯২ ধারায় কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁকে তোলা হয়। ২০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাসের জেল ১৯৬৫-তে। ১৯৬৭তে হাইকোর্টের রায়ে বেকসুর খালাস এবং সাহিত্য থেকে বিযুক্তি। ঐ সালেই ব্যাঙ্কের চাকরিতে তিনি যান নাগপুর এবং ১৯৬৮ সালে সহকর্মী সলিলা মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন। ১৯৭১ সালে লখনউতে কৃষি-বিশ্লেষকের নতুন চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৮২ সালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে আবার লেখালেখি শুরু করেন নানা ধরনের লেখা —

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ - নিবন্ধ, জীবনী, সাক্ষাৎকারগ্রহণ প্রভৃতি। ১৯৮৭ সালে মলয় গ্রামোন্নয়ন বিশেষজ্ঞের চাকরি নিয়ে মুম্বাই চলে যান। ১৯৯৪ সালে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে কলকাতায় ফেরেন। ১৯৯৭ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শয়তানের মুখ'। প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৭১ (ইং ১৯৬৪)। প্রকাশক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠিকানা দেওয়া আছে ৩২/২ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা ২৮। এই কাব্যগ্রন্থে ৪০টি কবিতা, তিন ফর্মার বই। শয়তানের মুখ নয়, কবি নিজেরই মুখের ছবি দেখতে চেয়েছেন এখানে। প্রেম, শিল্প, নর, নারী, ইত্যাদি সম্পর্কে মলয়ের একটা তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ আছে। কাব্যিকতা নেই, অনুভূতির চেয়ে বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদ, ক্ষোভ, অস্থিরতা যা আছে তারও নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ নেই। সেদিক থেকে অনেক কবিতাকেই নৈরাজ্যপূর্ণ বলা যায়। লক্ষণীয়, গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতে গ্রাম্য পথের যাত্রাকথা রয়েছে। কবি বলেছেন,

"গোরুর গাড়ির চাকা ডেকেছিল গ্রাম্যপথে রাতে।

ঘুম ভেঙে, অন্ধকারে, দরজা খুঁজেছি সারাঘর —"[১]

কিন্তু কবি কোথাও যেতে পারেননি। ঘরেই রয়ে গেছেন। শুধু "চাকার শব্দ ততক্ষণে গড়িয়েছে দূরে" (অমীমাংসিত আবাস)। এই প্রয়াস ঘটেছে রাতের ঘন অন্ধকারে। গ্রন্থের শেষ কবিতায় শহুরে জীবনের অনিবার্যতা অমোঘ হয়ে রয়েছে। সেখানে ভোরের প্রসঙ্গ পাচ্ছি। কবিতার নামও 'কল্পদ্রুম'। সমগ্র কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে কোথাও কবি ব্যক্তিত্বটির কিঞ্চিৎ অগ্রগমণ ঘটেনি। তিনি স্থাণু, স্থবির, দ্বিধাগ্রস্থ এক যুবাই থেকে গেছেন। মধ্যবিত্ত অরাজনৈতিক বাঙালী তরুণের কিছু কিছু অসুস্থতাই এই কবির সম্বল। গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতায় বলেছেন, " জলের

ভেতরে
হাত ডোবালে আমি
বুঝতে পারি আমার হাত
ভাঙা
জলে
তা সোজা মনে হয় মৃত্যু
প্রেম
দ্বিধা
পাপ
(আমি)।"[২]

আবার কখনও বা ক্রোধ ও চীৎকার কিছু কার্য-কারণহীন উচ্চারণ হয়ে উঠেছে মাত্র। যেমন,

"এভাবে বিদীর্ণ করো প্রেম শিল্পে কবিতাকে এ মুড়ো ও মুড়ো
নিমীল কুমারী বুক নখে ছেঁড়ো নিষ্পেষণে ভালোবাসা দ্বিধা
প্রতিক্ষণ দগ্ধবাক অযাচিতে ছিন্ন করো অবলা গোলাপ
বিজনে গহন রৌদ্রে, ভেঙে তুলে সচ্চরিত্র আমূল শিমূল

কখনও বা বলেছেন, "আমাকে ধোলাই দাও হে ঈশ্বর পচে গেলুম মরে গেলুম মাগো ... ধোলাই।"[৩] তবে কয়েকটি কবিতায় লক্ষ করি যে, দৃশ্যমান এই সভ্যতার প্রতি কবির কিছু বিদ্বেষ রয়েছে। এর পিছনে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নেই। আছে শিল্প, সাহিত্যগত কারণ। ঐতিহ্য ও সংস্কারের প্রতি বিরূপতা। 'একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন বহুকথা। তার কয়েকটি লাইন এরূপ ঃ

(ক) মাইকেলের অস্তিত্ব বিলোপের জন্য মানিক বাঁড়ুজ্জ্যেকে খুন
জারজ নিরো যাদের নখরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন নন্দকুমার[৪]

(খ) মলয় রায়চৌধুরীর ভবিষ্যদ্‌বাণী
একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি আমার ফতোয়া
আর চীৎকারের প্রতিদ্বন্দ্বী এই বীভৎস শব্দাবলীকে আর এর
ধ্বনি প্রতিধ্বনিকে ইতিহাস একদিন চূড়ান্ত ঘোষণা করবে
হায়ারোগ্লীফ
সময়
ক্ষোভ! ঘৃণা! ভয়! রাষ্ট্র! দুঃখ! অনুর্বরতা! হতাশা! পাপ!
সংশয়! ক্লান্তি! অবিশ্বাস!"[৫]

গ) ক্ষত্রিয়দের পিরামিড হাঁ করে ধূলিকণা তবু, নীলনদের ছলৎছল আবহমানকালে
প্রতিটি ক্ষত্রিয়ের উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী
অথচ নশ্বর গোলাপ নিয়ত
আমার আত্মার যন্ত্রণায় গোলাপের পাপড়ি ঝরানোর ...

ঘ) বিমানবন্দর সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সুরক্ষিত আর কাঁটা তারের
বাইরে আমার পচা লাশের গ্যাঁজলা

স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদেরা বিস্মৃত বলে জ্যান্ত বাণীবমনকারী মেশিনের

নামে সরণি ও শহর।

ঙ) ... ঈভের যোনি থেকে কেবল সভ্যতার কঙ্কাল নির্গত এবং

আলেকজান্ডারের সমাধি

আজ নিশ্চিহ্ন বলে হাওয়ায় ঈসকিলাস আমাকে ডাকছেন।"

বোঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদী রাজপুরুষ, ক্ষমতাগর্বী শাসককুল এবং রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান যন্ত্রের প্রতি কবির বিরূপতা ব্যাপক। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ সৃজনশীলতাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত তারই বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ। ব্যক্তিকে রাষ্ট্র কখনই মেনে নেয়নি, বিশেষত প্রথাবিরোধী সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে। কবির আত্মার যন্ত্রনা ও সংক্ষোভ সেই কারণেই।

সমগ্র কাব্যটিতে মলয় বহুবার শিল্প ও কবিতার কথা বলেছিল। ফলে মলয়কে কবির চেয়ে একজন কবিতা ও শিল্পভাবুক মনে হতে পারে। কেননা তিনি বলেন, 'শিল্প যূপকাষ্ঠ' (সেনেট)। কখনও বলেন, 'আব্রহ্ম শিল্পের পাঁকে আমি' (নুয়ে যাও গুপ্তচর)। কখনও বা বলেন, 'কবিতাকে চূণকাম করবো না যযাতি' (ধোলাই)। তাঁর কবিতার নামও 'শিল্পের বিরুদ্ধে', 'কবিতার প্রতি,' 'স্পর্শের প্রহরে শিল্প' প্রভৃতি। নিজের উমার্গগামিতা, ক্রোধ, অস্থিরতার সঙ্গে স্বীয় আর্ট বিষয়ক দৃষ্টিকোণকে মলয় মিশিয়েছেন এ ভাবে ঃ

ক্ষিপ্রহাত, ছিন্নমুন্ড, কয়েক ঝলক রক্ত, লক লকে জিভ
উল্লোল স্ফূরিত হিংস্র সারি সারি ভীষণ জল্লাদ ...
... 'খচ্' করে শব্দ এক, আমার কর্তিত দেহ, দেখি
ছটপট করিতেছে মেঝের উপরে গর্তে ! "কেমন বল্লুম শালা
জেদে গোঁয়ার্তুমি করিসনে, শিল্প-ফিল্প গ্যাঁড়াকল বহুদিন শেষ হয়ে গেছে
(মেঘনাদের পুনরুজীবন)।

নিজেকে নিয়ে মলয় আরও যে ছবি ও ব্যাখ্যান তুলে ধরেন তা আরও নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে এই ভাবে ঃ

মৃত্যু দিনের পোষাকে নাচে আমার কঙ্কাল, প্রতিরাতে প্রেমিকাপালক
ছোঁয়াময় মরাচূড়া বেঁধে ঘোরে ঘাণিগোরু জনগণ মৃতপ্রায় হাঁটে ঘিরে ছোঁয়া
উত্তপ্ত গলিত স্বর্ণে পোড়ে পদ বৃক্কমেরু মহান পাপের মেনেলাস
— (অপসৃয়মান গ্রীষ্মাবলীর টোটেম)।

এ ছাড়া অনর্গল শব্দের পর শব্দের ব্যবহার অনেক সময়ই অনন্বয়ী হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু শব্দবন্ধও উৎকট, যথা - মরাচূড়া, বৃক্কমরু, পিয়াতসাপেরুজ্যা, অকপলয় ইত্যাদি। দেশবিদেশের সাহিত্য ও মিথোলজি থেকে নানা অনুষঙ্গের যথেচ্ছ ব্যবহার মলয়ের কবিতাকে জটিল করেছে। আসলে, এ কাব্যে শয়তানের মুখের চেয়েও শয়তানের মুণ্ডুটিই অধিক প্রকট। 'মেঘনাদের পুনরুজ্জীবন' কবিতায় একটি কাটা মুন্ডু'র ছবি আছে - তা যেমন মেঘনাদের, তেমনই কবিরও। এই উৎকটতাই মলয়ের কাব্যের চাবিকাঠি।

মলয় রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জখম' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের ৯-ই জুন। প্রকাশক জেব্রা প্রকাশনী। একটি দীর্ঘ কবিতা নিয়েই সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি। পৃথিবীর নানা ভাষায় কবিতাটি অনুবাদিত হয়েছে। ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় এটিকে অনুবাদ করেছেন কার্ল ওয়েসনার। স্প্যানিশে অনুবাদিকা মার্গারেট র‍্যানডাল।

কবিতাটির বিষয়বস্তু হল পরিপার্শ্বের সঙ্গে একজন সংবেদনশীল তরুণের তীব্র মানসিক টানাপোড়েন। প্রচন্ড আবেগের তরল স্রোত যেন বইছে সারা কবিতায়। অ্যালেন গিনসবার্গের 'ক্যাডিশ' জাতীয় কবিতার পরোক্ষ প্রভাব যেন এখানে অনুভব করা যায়। তবে এর প্রেক্ষিত দেশজ এবং মাদকসেবনজাত প্রতিক্রিয়া নয়, চতুর্দিকের নৈরাজ্য বিরোধিতার ব্যাপারটিই প্রধান। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের দ্বন্দ্ব তাকে যখন ক্রমেই নিঃসঙ্গ করে দেয়, তখন সে কিভাবে ক্রুদ্ধ, অস্থির ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তারই একটি বিস্তৃত ছবি 'জখম' কাব্যে মলয় রায় চৌধুরী চিত্রিত করেছেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে এ কাব্য আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার, অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে তীব্র প্রতিবাদের। সে জন্য এখানে কোনো বিষাদের ছায়া নেই, আবার রাজনৈতিক দর্শনের আরোপও ঘটেনি। কবি বলছেন —

> চাঁদোয়ায় আগুন লাগিয়ে
> তার নীচে শুয়ে আকাশের উড়ন্ত নীল দেখছি এখন
> দুঃখে কষ্টের শুনানি মুলতুবি রেখে
> আমি আমার সমস্ত সন্দেহকে জেরা করে নিচ্ছি ...
> আমার সামনে সমস্ত দৃশ্য ধেবড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি
> কারুর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না আমার।"

কবি বুঝতে পারেন না কেন

> 'পরমাণুশক্তির উন্নয়ন সত্ত্বেও হারানো ছেলেরা
> ভেসে উঠছে পচা ডোবায়।'

এবং

'আমি জানি না কেন ১ জনকে মৌলালিতে মারা মানে খুন
রাজশাহীতে মারা মানে দেশপ্রম'।[৭]

কবি লক্ষ করেন,

মানুষই মানুষকে শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে শৃঙ্খলার গুণ ও হিটলারের আত্মকথা

অথবা

অনেক পুতুলেরও নীতিবোধ চেগে উঠছে আজকাল

অথবা

কোলকাতার প্রতিটি রাস্তায় পড়ে রয়েছে ধ্বস্তাধ্বস্তির মুনাফাকারী চিহ্ন।[৮]

যতো এই সব অসঙ্গতি দেখছেন ততই কবি পীড়িত বো'ধ করছেন। আত্ম পীড়িত। ফলে বলছেন,

ওফ আমার ভালো লাগছে না এইসব
আমি মরে যাবো আমি মরে যাবো আমি মরে যাবো
আমার দুঃখকষ্ট বুঝতে না পেরে
ভেতরে ভেতরে আমার হাড়গোড় চিড় খেয়ে যাচ্ছে।[৯]

যদিও তিনি জানেন

'কিছুই হল না আমার পৃথিবীরো কিছু হবে না শেষ অব্দি'।
তখন 'নিজের শরীরের ভেতর দিকেই আজকাল থুতু ফেলছি আমি
আয়নার শঠ পারা থেকে খুঁটে তুলছি আমি
আমার হিংস্র চোখ মুখের আত্মত্রানকারী ছাপছোপ।'[১০]

নিজেকে আক্রমণ ও ক্ষত বিক্ষত করাও একসময় অসম্ভব হয়ে উঠছে। তাই 'নিজের পায়ে কুঠারাঘাত কোর্তে গিয়ে কুঠার ভেঙ্গে যাচ্ছে।' নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি নয়, আঘাতের মধ্য দিয়ে ধ্বংশই করতে চাইছিন কবি ঃ

''নূতুন চামড়া দেখবে' বলে আমি আমার ঘায়ের মামড়ি খুঁটে ফেলছি এখন
আস্তিনের নীচে আধপচ' দগ দগ ঘা লুকিয়ে
সকলের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বোলে যাচ্ছি
মুখের চামড়ার নীচে আমার খুলি সবসময় হাঁ কোরে হাসছে ...
মরা মানুষের হতাশ জামাকাপড় পরে তারি খোঁজে ঘুরেছি রাস্তায় রাস্তায়।''[১১]

এই কাব্যে মলয় এক ভয়াল সময়ের অশ্বারোহী। হাতে তাঁর বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের তলোয়ার। উদ্দেশ্য ও পরিণতিহীন সেই যুদ্ধ। শুধুই একটা ঝড়, যেন একটা প্রলয়ের আশঙ্কা। তবে তা যূথবদ্ধ নয়, একক ব্যক্তির অনবরত এক আত্মিক লড়াই ঃ

"ওফ্
প্রতিহিংসা আমাকে জের্বার করে তুলছে
নিজের সঙ্গে শলাপরামর্শ এঁটে ঠিক কোর্ছ কি করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়
একটা একটা চোটে ফেটে গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে
আমার কঙ্কালের সমঝদার ঘরদোর
আক্রমণের আগে আমি ২ দন্ড জিরিয়ে নিচ্ছি
ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে ফুঁসছি আর গর্জ্জাচ্ছি
বালামচি দিয়ে চোটজখম ঝালাই কোরে
স্রেফ ন্যাংটা হাতে লড়ে যাচ্ছি ২৫ বছর
সমস্ত কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য,
আমার চোখ মুখ থম থম কোর্ছে এখন।"[১২]

মলয় রায় চৌধুরীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমার অসীমাংসিত শুভা।' এটিও একটি দীর্ঘ কবিতা মাত্র। প্রথম প্রকাশ ১৩ই মাঘ ১৩৭১ (ইং ১৯৬৫)। প্রকাশক, জেব্রা প্রকাশনী। 'জখম' কাব্যেরই তীব্রতর রূপটি এ কাব্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে। তবে এখানে প্রশ্নকাতরতা নেই, রাষ্ট্র ও জাতির কোনো প্রসঙ্গও উত্থাপিত নয় এখানে। কবি ব্যক্তিটি পুরোপুরি এ ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছেন। মলয়ের 'প্রচন্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি নিয়ে মামলা হয়েছিল। ঐ কবিতাটিরই যেন সম্প্রসারিত ও সংশোধিত রূপ 'আমার অমীমাংসিত শুভা।' অস্তিত্বের যে অসহনীয় অস্থিরতার কথা বার বার এখানে কবিকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তার মূল কারণ কী তার স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। তবে শুভা নামে একটি নারীকে আশ্রয় করে মলয় তার আকূতি ও নিরাসক্তি, প্রেম ও ঘৃণার, হৃদয় ও মগজের দ্বৈরথ ঘটাতে চেয়েছেন। কখনও কখনও মনে হয় যৌন কামনা বা তার অতৃপ্তির জন্যেও কবিচিত্তের এই অনিকেত চাঞ্চল্য ঘটতে পারে। নইলে কেন বলবেন,

শুভা আমাকে তোমার ও অখিলের মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়তে দাও

শান্তি দাও, শুভা শান্তি দাও।' এবং 'আমার চূড়ান্ত আশ্রয়হীনতার মধ্যেও লাখ লাখ কুমারীর গর্ভঘর ফাঁকা পড়ে আছে কেন বুঝি না।' বলছেন, 'ধরা পড়ে যাচ্ছে যে আমার শরীর আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে

শুভার সমস্ত ন্যাকামি ধরা পড়ে যাচ্ছে ... এই শুভাগ্রাফের ফাঁকে ফাঁকে দীপালি রায়কে ভালোবাসার ইচ্ছে চাগাচ্ছে আমার নন্দিতার ফর্সা গালে কষে ১টা চড় মেরে আলতো করে চুমো খাবার ইচ্ছে হচ্ছে।'[১৩]

সুতরাং এই কাব্যের তথাকথিত যন্ত্রণাকাতরতা ও অস্থিরতার ভিত্তিভূমিটি খুব দৃঢ় নয়। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর অনন্যতার জন্যই কবিতাটির অনেক অংশ পাঠকদের ভালো লাগে। মলয়ের কাব্যের ভাষারীতির আলোচনা প্রসঙ্গে তার উদাহরণ দেওয়া যাবে।

আসলে, মলয়ের কাব্যে ব্যক্তিজীবনের নৈরাশ্য বা অসন্তোষের চেয়ে কালের যন্ত্রণাকে মূর্ত করবার প্রয়াসে একধরনের তিক্ততা লক্ষ করা যায়। ব্যক্তি অনুভূতির গাঢ়তার চেয়ে তাই প্রধান হয়ে ওঠে বুদ্ধিবাদিতার ছাপ। মনে হয়, প্রেম, মৃত্যু বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কাব্যের প্রচল বিষয়গুলিকেই তিনি কবিতায় রূপ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মলয় রায়চৌধুরীর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'মেধার বাতানুকুল ঘুঙুর', ১৯৮৭র জানুয়ারীতে প্রকাশিত। প্রকাশক, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা। তিন ফর্মার বই। ৩৪টি কবিতা সম্বলিত। এখানে এক প্রৌঢ় মধ্যবিত্তের গলার আওয়াজ শোনা যায়। ক্ষোভ, চীৎকার আছে, পরিপার্শ্বের প্রতি বিরূপতা আছে, আছে সিনিসিজিমও। প্রচলিত সামাজিক ভাষা, দাম্পত্যজীবন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি কবির মনোভঙ্গী স্পষ্ট ঃ

'ওগো স্তন্যপায়ী ভাষা পিপীলিকাভুক মুখ চোরা
ভূচর খেচর জলচর দাম্পত্যজীবনে তুষ্ট একশিঙা ...
স্থলে বিচরণকারী উদবিড়াল গন্ধগোকুল বিনোদিনী
শব্দগহ্বর খেয়ে নোকরশাহীর রাজ্য এনেছো এ দেশে' (ঘৃণপোকার সিংহাসন)।

নারীকে বলেছেন, 'ফ্যান টাঙাবার ওই খালি হুক থেকে
কণ্ঠে নাইলন দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ো'

এবং

'দোলো লাশ নামাবার জন্যে আছি আমি' (বিজ্ঞানসম্মত কীর্তি)।

'শুদ্ধ চেতনার রহস্য' কবিতাতেও একই ধরনের কথা বলেছেন কবি। আত্ম হত্যায় প্ররোচনা দেবার মতো অপরাধ ও বিকৃতিতে অনেকগুলো কবিতাই পূর্ণ। অমানবিকতা ও ঘৃণার দাহ কুৎসিতাকার পায় কবি যখন বলেন,

'মানুষীর মরা মাংস কেমন জানি না

আধ পোড়া স্তন খেয়ে দেখবো তোমার'। (অভ্যন্তর, ওফ)।

জীবন সম্পর্কে দুঃসহ তিক্ততা ও ঘৃণা প্রকাশ করবার জন্যই এসব পংক্তির অবতারণা। হয়তো এ কারণেই হৈ হল্লা ও হুমকির বাতাবরণও মেলে এ কাব্যে ঃ

'দরোজায় লাথি মেরে বেহায়া চীৎকার তুলছি মাঝরাত্তিরে
যারই বাড়ি হোক এটা খুলতে হবেই নাতো ভেঙে ঢুকে যাবো
সামলাও নিজস্ব স্ত্রীলোক বাঁদি সোনাদানা ইষ্ট দেবতা'

(বাড়ি দখল)।

পরিণতিও জানা কবির ঃ

লুমপেন বলে তোরা ঘিরে ধরবি
আরেকবার ছিটকে পড়বো ফুটপাতে মুখে গ্যাঁজলা নিয়ে

(মেশোমশায় পর্ব)।

মলয়ের এই কাব্যগ্রন্থে সত্তর দশকের অরাজক রাজনৈতিক খুনোখুনি ও অস্থিরতার ছবিটিও দেখা যায়। যেমন ঃ

অন্ধকারে জুতোর ঠোক্করে টের পাই কারুর মাথার খুলি
পায়ে লেগে ছিটকে পড়ল কিছু দূরে। দেখি টর্চ বাতি জ্বেলে
পোয়াতি নারীর মাথা কেটে কিছুক্ষণ আগে ফেলে গেছে কেউ
... এখন পুলিশ এসে
ধরে যদি আমাকেই? কী প্রমাণ দেবো? (নিক্তি)।

কিংবা ভোর রাতে দরোজায় গ্রেপ্তারের টোকা পড়ে
একটা কয়েদি মারা গেছে তার স্থান নিতে হবে (অস্তিত্ব)।

এবং আবলুশ অন্ধকারে তলপেটে লাথি খেয়ে ছিট্‌কে পড়ি
পিছমোড়া করে বাঁধা হাতকড়া, স্যাঁতসেতে ধুলোভরা মেঝে
আচমকা কড়া আলো জ্বলে ওঠে চোখ ধাঁধায়
এক্ষুনি নিভে গেলে মুখে বুটজুতো পড়ে দু'তিনবার
কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে টের পাই।' (আলো)। -

এ ভাবেই তাঁর কবিতায় সময়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই কাব্যে মলয় সমস্ত নোংরামী, তিক্ততা, আঘাতকে সহ্য করে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার

কথাই বলেছেন। এটাকে এক ধরণের সদর্থকতা বলা যায়। 'জখম' থেকে 'আমার অমীমাংসতি শুভা' পর্যন্ত 'আমি মরে যাবো, আমি মরে যাবো' বলে তিনি চীৎকার করেছিলেন। কিন্তু সেই অস্থির নৈরাশ্যকে এখানে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা দেখতে পাই। কেননা তিনি বলেছেন, —

'দেখে নিস তোরা মাটিতে গোড়ালি ঠুকে পৃথিবীর চারিধারে জ্যোতির্বলয়
গড়ে যাবো'
(মেশোমশায় পর্ব)।

মনে হয়, উদ্দেশ্যহীন কোনো শব্দ গ্রন্থিলতা থেকে একটা সাময়িক অর্থময়তায় যাচ্ছেন। বলেছেন, 'একসঙ্গে সব আলো নিভে গেলে পরবর্তী আক্রমণ সহ্য করবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিই।'! আলো। এখানে সমকালীন পুলিশী অত্যাচারের ছবিটিকেই নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন কবি।

সামগ্রিকভাবে মলয়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে তা হল তা নিছক একজন ব্যক্তিমানুষেরই প্রতিক্রিয়া। 'আমি' নামক ব্যক্তি অহংটির প্রকাশকেই তিনি মুখ্য মনে করেছেন। সামাজিকতার কোনো আদল সেখানে নেই। এ জন্যে ব্যক্তির স্বৈরাচার দু'একটি তীব্র ফুলকির মতো দেখা গেছে — অসামাজিকতার সমূহ চাপ কখনই রচিত হয়নি। কখনও কখনও 'তুমি' বলে মলয় যাকে সম্বোধন করেছেন, তাকে প্রেমিকা, স্ত্রী ইত্যাদি বলে ভাবাই যায় না। ঐ নারীর হৃদয়, মস্তিস্ক, কমনীয়তা কিছুই নেই। শরীর ও যৌন ব্যবহারে ঐ নারীকে একটি যান্ত্রিক কাঠামো বলে বোধ হয়। কারণ তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার ব্যাপার নেই। কবিকে সে কোনো শান্তি ও আশ্রয়ও দিতে পারছে না। নারীর সঙ্গে কবির যৌনতা শেষ পর্যন্ত অর্থহীন ও অস্থিরতার আর্ততায় পর্যবসিত হচ্ছে। এছাড়া মলয়ের কবিতায় আবেগের বাষ্প নয় লাভা আছে। কথার মধ্যেও বক্রতা, সাংকেতিকতার অভাব। সরাসরি স্পষ্টভাষায় কথা বলতে তিনি ভালবাসেন। হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধিকে গুরুত্ব দেন বেশী। নিসর্গ নয়, নগরসভ্যতাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। অনেক সময় বোদলেয়ারের প্রভাবও এসেছে। নারীর শরীর, স্তন, চুল, গন্ধ, ঘাম, প্রেমপাংশু গণিকা, পূঁজ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, কফ, নিষিদ্ধ বিষ, অন্ধকার, কঙ্কাল, কঙ্কালের নৃত্য ইত্যাদি সবই ফরাসী প্রতীকবাদী কবি থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কবিতা মলয় লিখে গেছেন টানা গদ্যে, অনলঙ্কৃত ভাষায়। বক্তব্যের উপরই জোর দিয়েছেন, ইঙ্গিতের প্রতি নয়। এ সব কারণে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কবিতায় দুর্বোধ্যতা এসেছে। কিন্তু অনেক নিষিদ্ধ অপশব্দের প্রয়োগ তিনি করেছেন যেগুলি কবিতার কোনো শক্তিবৃদ্ধি করেছে বলে মনে হয় না। আসলে, মলয়ের শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে এ কথাই বলতে হয় যে, তাঁর শব্দাবলী অমোঘ নয়। নির্দিষ্ট ঐ শব্দগুলি অনায়াসে পাল্টে দেওয়া যায়, আর তাতে তাঁর কবিতার

কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না। তাঁর কবিতার শিরোনাম কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলানো দুষ্কর। কিন্তু কবিতার নামগুলো নতুন ধরনের, কানে লেগে থাকে যেমন, 'অন্তরঙ্গ বহির্মুখ,' 'যূপ কাষ্ঠরিয়া,' 'কোকিল ও সাঁজোয়া', 'নিম্নাভিমুখী হৃদয়স্থাপন', 'মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর' 'ঘৃণপোকার সিংহাসন', 'শুদ্ধ চেতনার রহস্য', ইত্যাদি। মলয়ের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শয়তানের মুখ'-এ অল্পস্বল্প হলেও রোম্যান্টিকতা উঁকি দিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন',

বাঁধনহারা অন্ধকারে আড়াল তোলে
পাপড়ি ঢাকা স্তনে
আলোছায়া উরুর কোনে যোনির কাছে কুটুম ঠোঁটদুটি
(স্পর্শের প্রহরে শিল্প)।

কিংবা

'লাথি মেরে হটাবো তলোয়ার
তোমার ত্রস্ত স্তনে হাত
দেবো আজ তৃণের ফুল পায়ে' (হিংস্র বারোক)।

কিন্তু 'জখম' কাব্যে যখন তিনি নিজেকেই আক্রমণের বস্তু করলেন তখন রোম্যান্টিকতার এই স্বল্প-সৌরভটুকুও অন্তর্হিত হয়ে গেল। এক অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন। উন্মাদের মতো পরস্পর বিরোধী কথা বলে তিনি বোঝালেন যে, তিনি আহত, রক্তাক্ত, ক্রুদ্ধ এবং দিশাহীন ঃ

'নতুন চামড়া দেখবো বলে আমি আমার ঘায়ের মামড়ি খুঁটে ফেলছি এখন
আস্তিনের নীচে আধপচা দগ দগে ঘা লুকিয়ে
সকলের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছি
মুখের চামড়ার নীচে আমার খুলি সবসময় হাঁ কোরে হাসছে। (জখম)।[১]

প্রশ্ন জাগে, 'নতুন চামড়া' কী নতুন সময়? 'ঘায়ের মামড়ি খুঁটে দেখা কি নীরবে সব স্বীকার না করে সাময়িক স্থিতিকে ভেঙে ফেলা? চামড়ার নীচে খুলির হাসি কি সমস্ত রকম ভাণের প্রতিবাদ? আবার, এই যে কথা বলে যাওয়া, বাক্য স্রোতের অন্তহীন অনর্গলতা - তা মলয়ের জখম সত্তারই উদ্ভাসন। পরবর্তী কাব্য 'আমার অমীমাংসিত শুভাঁয় একই বোধের অভিব্যক্তি। তবে চিত্রকল্প রচনার অভিনবত্ব বেশ চোখে পড়ে। যথা ঃ

(১) আমার চোখের পাতাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে

দেখতে পাচ্ছি।[১৫]

(২) ঘাসফড়িঙের চোখের ভেতর দিয়ে দেখচি শুভার ঝাপসা
থুত্নির উত্তেজক মেলা।[১৬]

(৩) আমার পিঠে চাবুকের দাগ ফুঁড়ে বেরোচ্ছে
হাজার হাজার নারীর চোখের পাতা[১৭]

(৪) আমি দেখছি ১ হাত জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে কোলকাতা[১৮]

মলয়ের কাব্যের অরেকটা গুণ তার অ্যাবসার্ডিটি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই এটা রয়েছে। যেমন ঃ

(১) বিচ্ছিন্ন ধড়ের বুকে বেজে চলে আদিগন্ত লাউডস্পীকার
জুমরাতে (মেঘনাদের পুনরুজ্জীবন ঃ শয়তানের মুখ)

(২) জন্ম ও মৃত্যুর আগে গ্লিসারিনের ধর্ম প্রত্যেককে
পালন করে যেতে হয় শুভা
আমাকে ঐ নিষ্পলক
পদ্মের ভেতর দিয়ে তোমারা ম্লেচ্ছ হৃদয় পর্যন্ত চলে যেতে
দাও' (আমার অমীমাংসিত শুভা)।

(৩) 'গোখরোর মাথায় খুলে উঠছে জাপানী হাতপাখা আর
মানুষের জীবন্ত পাঞ্জা' (জখম)।

এসবের কারণে মলয় তাঁর কবিতায় কখনই একটা সামগ্রিকতার বৃত্তাভাস আনতে পারেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে মন্তব্য ও চিত্রকল্পের, তত্ত্ব ও ইশারার একটা কোলাজ গড়ে উঠেছে।

(খ) শৈলেশ্বর ঘোষ ঃ

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অন্যতম নেতা শৈলেশ্বর ঘোষ এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। বগুড়া জেলার সদর বিভাগের রাজাপুর গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। শহরের উত্তর উপকণ্ঠে, করতোয়া নদীর পারে নির্জন স্থানে তাঁর পিতৃগৃহ অবস্থিত ছিল। গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল, কিন্তু অরণ্যপ্রধান ও ক্ষয়িষ্ণু। শৈলেশ্বরের পিতার নাম বিশ্বেশ্বর ঘোষ, মাতার নাম জগত্তারিণী দেবী। তাঁর এক দাদা ও তিন দিদি ছিল। পিতা ছিলেন কাছারিতে দলিল লেখক। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে তাঁদের বাড়িতে ডাকাত পড়ে। ফলে তিনদিনের মধ্যে বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। দাদা বদলি নেন ভাটপাড়ায় সিভিল

সাপ্লাই অফিসে। বাড়ির সবাই ভাটপাড়ায় থাকতে শুরু করেন। আবার ছ'মাস পরে সবাই রাজাপুরে ফিরে চলে যান। শৈলেশ্বর কলকাতাতেই বাবার ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে প্রায় ছ'মাসের মতো অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে দাদা সর্বেশ্বর ঘোষ বালুরঘাটে বদলি হলেন। ১৯৪৯ সালে শৈলেশ্বরও বালুরঘাটে এলেন। বালুরঘাট হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলেন। ১৯৫৩ সালে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করলেন। বালুরঘাট কলেজ থেকেই আই. এস. সি পাশ করলেন। সেখানে অনার্স নিয়ে বি. এস্. সি পড়ারও ইচ্ছে হল। কিন্তু বাদ সাধল পিতার অসুস্থতা। তিনি পক্ষঘাতগ্রস্ত হয়েছিলেন। শৈলেশ্বর আর এস-পি পার্টির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়লেন। ফলে পড়াশুনোর কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হল। চলে এলেন কলকতায়। বাগমারীতে রামেশ্বর ছাত্রবাসে রইলেন। ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। ১৯৫৮ সালে বাংলা অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করলেন। পরে মানিকতলায় একজনের বাড়িতে পেয়িং গেষ্ট থাকতে শুরু করলেন। সেখানে আলাপ হল সুভাষ ঘোষের সঙ্গে। জুটল আরেক বন্ধু বিমল কুন্ডু। তিনি থাকতেন উল্টোডাঙ্গা বস্তিতে। এই দু'জনেই পরে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সুভাষ ঘোষ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প রচনা করেছিলে। যাই হোক, ১৯৫৮ সালেই বালুরঘাট থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটি জুনিয়র হাই স্কুলে তিনি হেডমাষ্টার পদে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে বালুর ঘাট জেলা গ্রন্থাগারে সহ-গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হন। ১৯৬২ সালে শৈলেশ্বর যোগ দেন হিন্দ মোটর স্কুলে। তখন সেখানে তার মাসিক বেতন ছিল ষাট টাকা। তিনি তখন থাকতেন শ্যামবাজারে টালার কাছে। ১৯৬৭ সালে সুনীতা কুন্ডুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৭১ সালে তাঁর কন্যার জন্ম হয়। ১৯৯৮ সলে শৈলেশ্বর ঘোষ হিন্দ মোটর স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা প্রথম বেরোয় সতীন্দ্র ভৌমিকের 'এষণা' পত্রিকায়। কবিতার নাম ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা'। ১৯৬৩ সালে এরই কিছু অংশ পরে 'হাংরি জেনারেশন লিফলেটে' ছাপানো হয়েছিল। ছাপানো হয়েছিল 'তিন বিধবা' কবিতাটিও। কিন্তু শৈলেশ্বরের কাব্যগ্রন্থ বেরোয় আরও পরে - ১৯৬৭ সালে। গ্রন্থের নাম 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'। প্রকাশক, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ৬ নং বংশীধর মল্লিক লেন, কলকাতা। দাম দুই টাকা। এখানে মোট ২৭টি কবিতা সংকলিত। 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' সিরিজের কবিতাগুলি এখানে রয়েছে। অস্থির সময়ের প্রেক্ষায় চর্তুদিক সচেতন এক যুবকের আত্ম - অনুসন্ধান এক অননুকরণীয় ভঙ্গী ও ভাষায় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম কবিতা 'টার্মিনাস পার হতে গিয়ে'। টার্মিনাস মানে জীবন। এই জীবনকে তিনি একেবারেই ভালেবাসতে পারেন নি। কবিতার শেষে আত্মহননের ইশারা। নিজের হাতের শিরা নিজেই কেটে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, 'জীবনানন্দ দড়ি হাতে গিয়েছিল'। কিন্তু সেখানে ছিল

নিরর্থকতার বোধ, নিঃসঙ্গতারও। কিন্তু শৈলেশ্বর বলছেন, 'সমুদ্র উঠে আসে যুদ্ধভূমির দিকে, যুদ্ধভূমির মধ্যে ছিটকে পড়েছি আমি'। [১৯] ক্রোধ ও ঘৃণার প্রকাশে শৈলশ্বরের আত্মহনন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। এই প্রতিবাদকে শৈলেশ্বর নিজেই গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'বৈদ্যুতিক ১৯৬৪'তে ব্যাখ্যা করেছেন — 'রক্ততন্ত্রীর ভিতর দিয়ে যাতায়াত করছে অসুস্থ বিদ্রোহ'। নিজেকে বলেছেন, 'সভ্যতাপ্রসূত গাধা।' বলেছেন, 'ইতিহাস সভ্যতার হাড় দিয়ে তৈরী হয়েছে দালান।'[২০] কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। এলোমেলো যৌনতা ও স্বাধীনতার রেফারেন্স কন্টকিত এই বিদ্রোহকে তারুণ্যের লক্ষ্যহীন আবেগময় উচ্চারণই বলা সংগত। এক স্থানে শৈলেশ্বর বলেছেন,

'প্রণতিকে এখন আমি চাই, নিজের মাকে যেমন আমি চাই প্রণতি, বিশ্বাস কর তোমাকে চাই — আমূল মাখনের মত ব্যবহার করতে চাই - এমনকি বেশ্যাদের কাছেও আমি ভালবাসা চাই'[২১]। অন্যত্র শৈলেশ্বরের বক্তব্য ঃ

'আমাদের রাজনীতি মানেই তো
মূল্যবৃদ্ধি যার ফলে বাজার থেকে দুধ উধাও হয়ে যায় আর
মূর্খদের সুখ বেড়ে যায়।' (১০ পয়সার ম্যাজিক)।

কিংবা '... একজনের মৃত্যু আর একজনের স্বাধীনতা বাড়িয়ে দেয়' (বৈদ্যুতিক ১৯৬৪)। এই কাব্যগ্রন্থে কবি সঙ্গম, সন্ত্রাস, জীবন, আত্মহত্যা, স্বপ্ন, মাতাল, সভ্যতা ইত্যাদি শব্দগুলোকে চিহ্নের মত ব্যবহার করেছেন। পুনঃ পুনঃ ছন্নছাড়া ভাবে ব্যবহারের ফলে সেগুলি অবশ্য তেমন তাৎপর্য দান করতে পারে নি। এই কাব্যেই শৈলেশ্বর নিজেকে প্রথম 'ক্ষুধার্ত' বলে ঘোষণা করেছেন। 'আমি ক্ষুধার্ত' নামক সেই কবিতায় দেখা যাচ্ছে, তার বাবা জুয়া খেলতে গিয়ে সর্বস্ব হারিয়ে পাগল হয়ে ফিরে এসেছে, মা শুয়ে আছে এক দেবতার সঙ্গে। কবি নিজে সমকামী ও বিপরীতকামী, তাঁর বন্ধুরা কেউ জারজ, কেউ বিশ্বাসঘাতক, কেউ খুনী। মাদকাসক্ত কবিকে তাদের সঙ্গে মারামারি করতেও দেখা যায়। এসবের মধ্য দিয়ে শৈলেশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষুধাটিই যেন প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, কবি এইসব চরিত্র, আচরণ ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে চিনে নিতে চেষ্টা করছেন। নিজের মুখটিকে আঁকতে চাইছেন। 'আমার মুখ' নামক কবিতায় বলেছেন,

'তূলাতোষকে অনিচ্ছুক আমার মুখ দেখতে পাচ্ছি
মীরার দিকে অনিচ্ছুক - ঘুমের প্রতি - সর্বত্র অনিচ্ছুক
অমানুষিক স্বপ্নের মধ্যে আরও ঘোরতর অনিচ্ছুক আমার মুখ ছড়ানো
বিক্ষিপ্ত লাল কালো

বিক্ষিপ্ত হলুদ সবুজ টুকরোগুলি দেখতে পাচ্ছি -

কমলালেবুর বিক্ষিপ্ত কমলার মধ্যে আমার মুখ এ রকমই দেখতে পাচ্ছি।'[২২]

'জন্মনিয়ন্ত্রণ' কাব্যে বহু কবিতায় আত্মহত্যার প্রসঙ্গটি এসেছে। যেমন এসেছে মা'র কথা। জীবনের নিরর্থকতার জন্য অনীহা এখানে অস্তিত্ববাদী টানাপোড়েন বা দার্শনিকতার ঘোর সৃষ্টি করবার জন্য নয়। রাগী শৈলেশ্বরের ক্রোধেরই প্রকাশ। মা এখানে সৃষ্টিমূল হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টিরই যে কোনো সৌকর্য ও প্রয়োজন নেই তা-ই কবির মত। কারণ আমরা কোনো সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছি না। দ্বিতীয়ত 'মা' নামক যে একটি শ্রদ্ধেয় ভাবকল্প রয়েছে সেটিকে ধ্বংশ করাও শৈলেশ্বরের উদ্দেশ্য।

এই কাব্যে দূরান্বয়ী ভাবনা ও আপাত অসংলগ্ন বক্তব্যকাঠামোর উপস্থিতি সত্ত্বেও অদ্ভুত কিছু চিত্রকল্পের প্রয়োগ কবি করেছেন। যেমন ঃ (১) 'স্ত্রীলোক রয়েছে শুয়ে / তার জরায়ুর আঁশ এখনও রয়েছে গায়ে' (টার্মিনাস পার হতে গিয়ে)। (২) 'মায়ের গর্ভের মতো সমুদ্র' (বৈদ্যুতিক ১৯৬৪)। (৩) 'কমলালেবুর মতো বসন্তপল্লী নেমে আসে সাঁওতাল পল্লীতে' (শোকগাথা)। (৪) 'চারিদিকে দন্তোদ্গম উৎসবের আলো' (ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা)। (৫) 'হে ঘোড়া / তোমার নিশান আমার মুখের উপর চুম্বনতিথির / মত উড়ে আসে।' (ঐ)। (৬) 'কাগজের পাতায় জীবন বেঁচে টিকে আছে' (জন্ম নিয়ন্ত্রণ)।

শৈলেশ্বরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অপরাধীদের প্রতি' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশন। দাম ৩.৫০ টাকা। মোট ৬১টি কবিতা এখানে সংকলিত আত্মহননের ঘোর এখন কবি কাটিয়ে উঠেছেন। সংবেদনশীলতার প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে জীবনের অসঙ্গতিগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নেবার প্রয়াস পাচ্ছেন। পারিপার্শ্বিককে শুধু আঘাত নয়, জয় করবার অভীপসাও দেখা যাচ্ছে। কবির আমি বহু বচনাত্মক 'আমরা'র দিকে যাচ্ছে। তিনি মানুষকে আহ্বান করছেন, তাঁর সঙ্গী হবার জন্যে এবং তাদের সহযাত্রী হয়ে তিনিও নতুন কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে আগ্রহী। নাম কবিতার প্রথম পংক্তিটি এরূপ ঃ 'আসুন, আমরা আর একটি পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি বাসোপযোগী মানুষ ...।' বলেছেন, 'এই বাড়ির বাসিন্দারা আজও ঐতিহ্যের হাতেই বন্দী হয়ে আছে ... অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের জ্ঞানের ভিতর জ্ঞান হয়ে আছে।'[২৩] এই ঐতিহ্য থকে মুক্তি এবং জ্ঞানের অন্তর্দ্বন্দ্ব মোচন কবির লক্ষ। সে কারণে অপরাধ প্রবণ মানুষের অন্ধকার দিকগুলিকে কবি উপেক্ষা করতে চান না। জ্ঞানী ও অপরাধী একাকার হয়ে যায় কবিদৃষ্টিতে। কবির এই বিপ্রতীপতাকে উচ্চারণ করতে দেখা যায় 'নিরপরাধ মাংস' কবিতায়' - 'আমাদের ভালবাসা আছে এবং আছে ভালবাসা বহির্ভূত নিরপরাধ মাংস।' কিংবা 'হারার' কবিতায় ঃ 'গলিত হারারে

হৃদয়ের পর্ণকুটিরে ভীত সন্ন্যাসী শব্দে জয় করেছ অন্তর্বাহী অন্ধকার আর সেই অন্ধকারে আনন্দে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আছ।' 'সন্ন্যাস' কবিতায় বলেছেন, 'খুন ও খুনীর মধ্যবর্তী ক্রিয়া বেছে নিতে হবে, এস সন্ন্যাসী, তোমার সাধনা, গোপন ভয়ের কথা চীৎকার করে জানিয়ে দাও, গৃহ অভিমুখে এই যাত্রী মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে বেঁচে থাকা কান্না শব্দ জীবরোল একবার মিথ্যা মনে কর, দেখবে শরীরের স্বভাব দরজা কি বিষন্নতা ঘিরে রাখে আমাদের?' অর্থাৎ সত্য শিব সুন্দরের আদর্শায়িত কাঠামো থেকে জীবনকে মুক্তি দেবার কথা বলেছেন কবি। জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। জিঘাংসা ও রিরংসাকে প্রেম ও আনন্দের সঙ্গে পৃথক করে দেখার কথা ভাবেন নি। অনেক সময় তাদের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে এখানেই এ ভাবেই শৈলেশ্বরের ভিন্নতা দেখানোর চেষ্টা। তাঁর ভাষায় ঃ

ফিরে এসো ত্যাগীজটা পিস্তলধারীর ভয়
ফিরে এসো সত্যরক্ষী ঘাতক তোমার জ্ঞান
ফিরে এসো মৃত্যু জামাকাপড় ছাড়া এই আমি ...
.... পৃথিবীর পাশে আকে পৃথিবী ফিরে এসো'
(নামহীন মন্ত্র পরম্পরা)।

প্রকৃতপক্ষে, দৃশ্যমান এই স্বাভাবকি পৃথিবীর পাশে অন্য এক পৃথিবীর ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কবি। নিষিদ্ধ জগৎ নিষিদ্ধ চেতনার জয়গান করেছেন। তবে মধ্যবিত্তের যে স্বাভাবিক মূল্যবোধ তার থেকেও বেরোতে পারেন নি। শৈলেশ্বরের এই মধ্যবিত্ত দ্বিধা প্রতিটি কবিতার মধ্যে একধরনের টেনশান রচনা করেছে। 'বহুদৃষ্টি' কবিতায় বলেছেন,

এই তো উগ্র আবেগ আমার অপটু শরীরে জ্বলে উঠছ
তবু এই ইতিহাস গুপ্ত ভালবাসা জাগিয়ে দিয়ে বিপন্ন
হয়েছি আমি অনভিজ্ঞ বলে খুনীর কীর্ত্তিও বিস্মিত করে
জীবনে তাই প্রয়োজনহীন ভালবাসার সময়
এল না, দুঃখজনক মুখ নিয়ে যখন ঢুকে পড়ি বাজারে
ও শরীরে, মনে পড়ে সেই সমসাগরা রাত্রিভরা গান
আমাদের,জায়া ও জনকের মধ্যিখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা পা দু'খানি,
হয়ত এই ভাবে প্রতিটি খুনী খুনের আগে শক্তি সঞ্চয় করে।'

বলেছেন 'খুনী আমি যাদের খুন করেছি ভালবেসে তাদের সঙ্গেই রয়ে গেলাম' (বাস্তবতার

পুনরারম্ভ)। আরেক জায়গায় বলেছেন,

> আমি যে গল্প শুরু করেছি আজ, তার কোনো শেষ হলো না, শেষ হবে না কোনোদিন, আসলে এটা একটা ছলনা, দুঃখজনক ও উত্তেজক নেশা, নেশা একটানা (নেশা)।

এগুলো তো অভিমানেরই কথা। এ কাব্যে কবির মূল বক্তব্য এ রকম ঃ

'এখন বলতে পারি, অপরাধী যা করে তাই তার অপরাধ নয়

পিতা সে অপরাধ করে বলেই তো তাকে 'অপরাধী বলার
সুখ ভোগ করতে পারছি আমিও - দুরারোগ্য এই ব্যাধি
বহন করে চলেছি আমরা, অপেক্ষা কেবলমাত্র জৈব রূপান্তরের
মগজ যখন সংস্কার বশেই অবৈধ প্রশ্নগুলি তুলে ধরে

অতিরঞ্জনই আমাদের ধর্ম, বিপজ্জনক চামড়ার মানুষ। জানি, আপৎকালে প্রথম শিথিলতা এসে যাবে আমাদেরই ক্রুর বেহালাবাজিয়ে নিগ্রোর অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে সাদা চামড়ার এজলাশ (আনন্দদিগন্ত)।

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক, এত তত্ত্বকথা প্রকৃত কবিতার কতখানি উপকার করে? কিংবা কতখানি ক্ষতি করে? 'অপরাধীদের প্রতি' কাব্যপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, একই তত্ত্বের পুনরুক্তি ও একই ধরণের বর্ণনা পাঠকের কাছে একঘেঁয়ে বোধ হয়। নিজের দুর্বলতা বরং কবি-ই যথার্থ স্পষ্ট করেছেন,

> 'মুখ ব্যবহার করে আমি গান নষ্ট করেছি
> শরীর ব্যবহার করে কবিতা ধ্বংশ করেছি' (যে কেউ নষ্ট করে)।

কবির দোলাচলতার ছবিটিও যথার্থ ঃ

> ' মৃত্যু আমাকে সুখী করে না
> জীবন আমাকে বেঁচে থাকতে বলে না' (ঐ)।

এই দ্বান্দ্বিক চেতনার অবিন্যস্ততার মাঝখানেই শৈলেশ্বরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অপরাধীদের প্রতি'র অবস্থান ।

শৈলেশ্বর ঘোষের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দরজা খোলা নদী' প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। প্রকাশক ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। সংকলিত কবিতার সংখ্যা - ৬৫। এখানে কবির একক ব্যক্তি সত্তার প্রাধান্য। পূর্বের কাব্যগ্রন্থে যদি নিষিদ্ধের কল্পলোক কবিতার পটভূমি তো এখানে প্রকৃতির সান্নিধ্য ও

অনিবার্যতা। ডি. এইচ. লরেন্সের প্রকৃতির সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে। মিল আছে জীবনানন্দের সঙ্গেও। কবি বলেন,

'দরজাখোলা এক নদীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি এই আমার আকাশ পথ' (দরজা খোলা নদী)। কিংবা 'সৌর পৃথিবীর নাবিক আমি ছায়াপথে ঘুরে বেড়াই' (ছায়াপথ)। প্রকৃতির মধ্যে কবির এই ভ্রমণ, অন্তরঙ্গতা শুধু শূন্যতা, অপরাধ ও ধ্বংশের কথা বলেনি, ভালবাসার কথাও বলেছে। বলেছে সৌন্দর্যের কথা, তন্ময়তার কথা। হাংরি কাব্যসাহিত্যে সবচেয়ে নিবিড় প্রেমের কবিতা আছে এই কাব্যেই। শুধু তার ভাষাটাই যা আলাদা। লক্ষণীয় 'সরস্বতী' কবিতার এই পংক্তিমালা,

> দুঃখকে জয় করতে যাব আমি ও সরস্বতী - এলোচুল বেঁধে নাও গরম নিঃশ্বাস, প্রসারিত হাত, হাতের বেষ্টন মরা জ্যোৎস্নায় কাঁদে এক পাখি - এগোই আমি নির্জনতা ভালবেসে মরি তাকে অনুসরণ করে চলে আসি গুহায়, জঙ্গল ভূতগ্রস্ত আমি সরস্বতীকে এভাবেই ভালবাসি যদি জীবন ফিরে আসে,' কিংবা 'বিশ্বাসঘাতকের জুতা

কবিতার শেষ লাইনগুলি ঃ

'হলুদ পাতা ঝরে পড়ে, আকাশের জলে শুকনো মাটি হয় কাদা
তবে সব কিছু শেষ হয় নি পৃথিবীতে! নাও ঘ্রাণ ... ঐ উন্মোচিত স্তন...
শিকারীর গন্ধ দূর থেকে পায় পশুরা ... সহজাতদের প্রকৃতি
আকাশ তাই নীল ... ধরে থাকে ফুল ... সবুজ হয়ে আছে বন।'

এই কাব্যের কবিই বলতে পেরেছেন,

'আমার আকাশে যখন সূর্য থাকে না শরীরের
তটরেখা ভরে নক্ষত্রেরা ফুটে ওঠে
এক করুণ আলো সারারাত জাগিয়ে রাখে আমাকে
তখনই আমি তোমাদের সকলের সাহায্য চাই'
(লিপি প্রতিলিপি)।

'বিকেলের চা' কবিতায় শৈলেশ্বর বলেছেন, 'ভালবাসার হিংস্রতা আমাকে মুগ্ধ করে।' সত্যি তাই। 'দরজা খোলা নদী'-তে কবির মুগ্ধতার যে কত রূপ! এই মুগ্ধতা ও বিস্ময়বোধকেই পাচ্ছি রোম্যান্টিকতা সম্পর্কে থিওডোর ওয়াটস ডানটন ও ওয়াল্টার পেটারের বহুখ্যাত মন্তব্যে (ক) The renascence of wonder - Dunton (খ) Addition of strageness to

beauty - Walter Pater.। যদিও শৈলেশ্বরের রোম্যান্টিকতা তিক্ততা ও ঘৃণার সংমিশ্রণ, কালো ও শূণ্যতাময়, তবুতো তাকে বাস্তবতার বিবর্ণতার সঙ্গে মেলানো যাবে না। 'দরজা খেলা নদী' কাব্যে বিবর্ণতাকে স্থান দেননি কবি। বরং কালোর সঙ্গে লাল, সবুজ, নীল ইত্যাদি নানা রঙের ব্যবহার করেছেন। সমুদ্র ও অরণ্য, সমতল ও মরুভূমি, আলো ও অন্ধকার, নক্ষত্র লোক ও ধরিত্রীভূমির নক্শা তৈরী করেছেন। জোয়ারের শব্দ ও মধ্যরাতের গান, জাহাজের বাঁশী ও নোঙরের শব্দ এরূপ নানা ধ্বনি তরঙ্গকে কবি তাঁর কবিতায় খেলিয়ে দিয়েছেন। কবির চোখে পড়েছে —

"ভোরের পাখি একটি নক্ষত্র ঠোঁটে করে নিয়ে
এসে বসে গাছে
মনে পড়ে কেউ একদিন দয়াপরবশ হয়ে
এসেছিল খাবার দিতে
নদী নালাগুলো ঝলমল করে উঠছে' (নতুন ঠিকানা)।
কিংবা
'আমি অপেক্ষা করি এমন এক মুহূর্তের যখন মৃত্যু রূপান্তরিত হয়
জীবনে, জল শূন্যে গিয়ে হারিয়ে ফেলে রূপ, ফুল যখন সূর্যের
সাথে সম্পর্কিত হয় স্বেচ্ছায় অতিথি হয়ে চলে আসি তোমাদের
ঘরে, অপরিচিত এখ পুরুষের সাথে এখানেই আমার পরিচয়'
(প্রপাতের দেবতা ও কুকুরগুলি)।

এই কাব্যে যত কথাই থাক, মূল সুর এক প্রেমিকযুগলের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের উপরেই বেজে উঠেছে। মাঝে মাঝে যৌনতা ও যৌনবিকৃতি ও বহু যৌনতাও এসেছে ঠিকই কিন্তু আর্তি রয়েছে দ্বৈত নর-নারীর। যে প্রেম পৃথিবীতে নেই বলে কবির আতঙ্ক, তারই অন্বেষণ। তিনি বলেন —

' এক মানুষের জন্য যখন আমার চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো
হয়ে যায় সেই হয় আমার ভালবাসা
আমার ছোঁয়ায় যখন শরীরে হাজার সূর্য জ্বলে ওঠে
সেও হয় আমার ভালবাসা
ভালবাসাহীন সূর্য কি একদিন এই পৃথিবীকে ধরে রাখবে আর?' (লীন তাপ)।

অন্যত্র বলেছেন, 'সূর্যকে পেয়েছে বলে গাছ সবুজ, বহন করে নিজের ওজন আর শূন্যতার ভার' (মহাকাশ মহাশূন্য)।' অতএব প্রেমের মধ্যে একটা কামনা, তীব্রতা আছে যা প্রেমিককে

তরতাজা রাখে, তার ভার ও শূন্যতাকেও মানিয়ে নেবার শক্তি দেয়। সাধারণভাবে, নিশ্চয়ই এ কথাগুলি কিছুই নতুন নয়, কিন্তু একজন হাংরি কবি যখন তাঁর কাব্যে এই তত্ত্বটিকেই বার বার প্রতিষ্ঠা দেন, তখন তা আমাদের আশ্চর্য করে বৈকি। 'দরজা খোলা নদী'তে মূল বিষয়বস্তু ও উপকরণ কী এ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর শৈলেশ্বর যেন তাঁর একটি কবিতাতেই ধরে রেখেছেন ঃ

আমাদের আকর্ষণ করে ফসল মাটি আর ঘাস
নিয়ম না মেনে ছিঁড়ি ফুল, পাপড়িগুলি, আমাদের বিশ্বাস
ধীরে ধীরে মরে যায়, শুকায় রং ... শুধু দুঃখের উপকথা
আমাদের ভালবাসতে বলে - এই তো মধ্যরাত্রির আকাশ
এরই তলে আমাদের মৃত্যুর সাধনা — স্বপ্নের প্রকাশ
কিশোরীর লুকানো বুকে মাতালের প্রশ্বাস ফিরে চাই
প্রকৃতির নদী ...' (অভিকর্ষ)।

লক্ষণীয়, এখানে কবির কোনো ক্ষোভ বা ক্রোধ নেই, আছে জীবনের প্রতি ভালবাসা। প্রকৃতি ও প্রেমলালিত সহজ জীবনের প্রতি আকৃতি।

শৈলেশ্বরের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'পূর্ণগ্রাস' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী। দাম সাত টাকা। সংকলিত কবিতার সংখ্যা - ৬৫। কবির ক্রোধ, প্রতিবাদ এবং আবেগ এখন স্তিমিত। বরং তত্ত্বপ্রাধান্য এবং উপলব্ধির প্রতিবেদন রচনার দিকে ঝোঁক। নিরর্থকতার বোধ, মৃত্যুর অনিবার্যতা, অচরিতার্থতার ঘোষণা বহুবার এই কাব্যে করা হয়েছে। 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'দরজা খোলা নদী' পর্যন্ত একজন তরুণ কবিকে পাওয়া গিয়েছিল; 'পূর্ণ গ্রাসে' এসে তিনি প্রৌঢ় হয়ে উঠেছেন। না, নতুন কোনো অভিযান নেই আর, চেতনার কোন আবিষ্কার নেই; পুরনো ভাবনা চিন্তার সঞ্চয়কেই একটু বিস্তৃত ও গম্ভীর সুরে কবি এখানে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। এ কাব্যের কবিতা ব্যাখ্যামূলক। সেই ব্যাখ্যার পরে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাও করা হচ্ছে। ফলে সন্দেহ হয়, অনুভূতি নয়, জ্ঞানের প্রচার যেন 'পূর্ণগ্রাসের' উদ্দেশ্য। অথবা একটি চিত্রনির্মাণ কবির চোখে মানবজীবনের একটি চিত্রপট রচনা। কবি বলেছেন,

'পুনর্জন্মের পাখি হয়ে ফিরে এসেছি আমি
ঃ কোন পূর্বস্মৃতি নাই
মনে পড়ে না বেশ্যাদের মুখ, মনে পড়ে না খেলা আর ক্ষুধা ...
মেঘের বুকে সুপ্ত বজ্র, আকাশ যুদ্ধ পরবর্তী শান্তির মত থমথমে
(পুনর্জন্মের পাখি)।

এই কাব্যে কবির প্রেমিকা সরস্বতীকে খুনের কথা আছে, এমনকি নিজের পচে যাওয়া শবের কথাও আছে। মৃত্যু ও ধ্বংসের শেষে সব কিছুই তো একদিকে নিরর্থক ও শূন্য, তবু তা যেন আধুনিক জীবনের বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতার রূপ ও স্বরূপ নির্ণয়ই শৈলেশ্বরের উপজীব্য। 'সামনে কী আছে' কবিতায় বলেছেন, 'কী আছে সামনে আমাদের ? পাকা শস্য কিছু পড়ে আছে মাঠে

আনন্দ দুঃখ ভয় আর ভালবাসা ঃ জ্ঞানীর গ্রন্থ আজ পোকায় কাটে

কী আছে সামনে আমাদের? জোয়ারের জল রাস্তায় এসেছে উঠে

সংহার আর মৃত্যু?

আরেক স্থানে বলেছেন,

'আমাদের কানা গলিতে স্বাধীনতার প্রশ্ন নেই

মৃত্যু ও মাটি পরস্পরকে গেলে

বস্ত্রহরণের সময় ধর্মও কত অসহায়

স্বেচ্ছাচার সমাপ্ত হলে পশু তার আস্তাবলে ফিরে যায়

যে হৃদয় পোকায় কাটেনি তাকেই আজ সকলে খায়' (মৃত্যু ও মাটি)।

এই মূল্যবোধ নেতির প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের পরিশীলিত জ্ঞান, ইতিহাসচেতনা, দর্শনপ্রেক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের একেবারে বিপরীত প্রকৃতভূমিতে শৈলেশ্বরের অবস্থান। তবু একাধিক কবিতায় শূন্যতাবোধের পুনরুচ্চারণে এবং 'রক্ত গোধূলি'তে মরুসন্ধ্যার চিত্রায়ণে সুধীন্দ্রনাথ উঁকি দিয়ে যান। কখনও বা শৈলেশ্বর একজন শ্রমণের মতো জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে তার অতীত জীবনের মায়াবদ্ধতাকে এক অদ্ভুত উদাসীনতার সঙ্গে লক্ষ করেন ঃ

আমাকে বলা হয়েছিল সমুদ্র অতিক্রম কর

আমি সমুদ্র অতিক্রম করলাম

বলা হয়েছে পর্বত লঙ্ঘন কর

আমি পর্বত লঙ্ঘন করলাম

বলা হয়েছি শ্বাপদসংকুল অরণ্য ভেদ কর

আমি ভয়ংকর অরণ্য পার হয়ে এলাম

সেখানেই দাঁড়িয়েছিল সে

দূর থেকে কামনা করেছিলাম যাকে

রোমাঞ্চিত হয়েছিল সব কটি জীবন বুকের কেন্দ্রে এসে
তারই শরীরে পেলাম আবার অরণ্যর স্মৃতি
সমুদ্রের ঢেউ, মেলে ধরা বর্তমান
প্রথম প্রবেশ
আমি তার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের বরফ গলা
জল হয়ে নেমে এলাম
... আমাকে বলা হল অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাও
আমি ফিরতে লাগলাম
অরণ্যে স্মৃতি নাই, সমুদ্র সীমায় স্তব্ধ
পর্বত হারিয়ে ফেলেছে তার উচ্চতা
অস্পষ্ট কলঙ্করেখা শুধু দেখা যায় দূরে'

শৈলেশ্বর নিজেকে বলেছেন, ধর্মহীন। আমরা বলি, প্রাকৃত। কারণ একজন প্রাকৃত মানুষের মতই তাঁর আশা, আকাঙ্খা এবং জীবনবোধ। 'হেমন্তের ফুল' কবিতায় নিজেকে বলেছেন, 'দরিদ্র মানুষ, জীবন সন্ধানী'। 'ধর্মহীন' কবিতায় বলেছেন, 'হৃদয় এক উপত্যকা ছিল —

আশা ছিল - মৃত্যুর গাছ ছিল
মাথার উপরে কর্কটক্রান্তির সূর্য মৃত্যুর গুহা পর্যন্ত
চেটে নিয়েছিল সেই ক্ষুধা - দেহোপজীবী মানুষ আমরা
সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে কেবলই ভেবেছি মুক্তি আর
ভেসে যাবার কথা।'

অসীম সেই ক্ষুধায় শৈলেশ্বর তার প্রেমিকা সরস্বতীকে, নানা রূপোপজীবিনীকে গ্রহণ করেছেন। শেষে তছনছ করেছেন নিজেকে। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অসীম ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে'? অবশ্য আত্মভুক শৈলেশ্বর শূন্যতাকে অতিক্রম করেন নি, প্রার্থিত করেছেন শূন্যতাকে। তাঁর 'ধর্মহীন' 'পুনর্জন্মের পাখি', 'রসদ' 'পূর্ণগ্রাস', অনিয়ন্ত্রিত 'বাস্তবতা', 'অন্তর্নিহিত জীবন', 'চৈত্র আততায়ী', 'সীতা' প্রভৃতি প্রত্যেকটি কবিতাতেই শূন্যতার পরাক্রম পতাকা উড্ডীন করেছেন তিনি। এই কাব্যে এসে শৈলেশ্বর অন্য প্রতীক গ্রহণ করেছেন। যেমন 'মোহানা' কবিতায় — 'আক্রমণের পর একা, তাই অশ্রুবর্ষণ'? ইতিহাস মিথ্যা ছিল মিথ্যা ছিল আমার সব যৌনআরাধনা।" এই কাব্যে শৈলেশ্বর 'বুদ্ধে'র প্রতীকটি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন কারণ বুদ্ধদেব সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র, সোনার রাজত্ব

ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। প্রচার করেছিলেন অহিংসার বাণী। রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের কবিতায় বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ ও তত্ত্ব গভীর প্রভাব রেখে গেছে। শৈলেশ্বর ঐ বুদ্ধদেবকে ভিন্নভাবে তাঁর কবিতায় প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। 'বুদ্ধ উপত্যকা' (১) কবিতায় প্রথম পংক্তিতেই ঘোষণা করেছেন, ' উপত্যকায় এসে বুঝতে পারলাম রক্ত ছাড়া সন্তুষ্ট হবে না ভালবাসা আমার।' বুদ্ধ উপত্যকা(২) কবিতায় শেষ পংক্তিতে বলেছেন, 'এ উপত্যকায় আজ মুখোমুখি খুনী আর জ্ঞানী।' গ্রন্থের শেষ কবিতা 'কালো বুদ্ধ' কবিতায় লিখেছেন,

'নিজের গুহা থেকে বেরিয়ে এল বুদ্ধ
বাইরেই অন্ধকার এবং শান্তি
জ্ঞান পূর্ণ হয়েছে তার, ক্ষুধার্ত বোধ করছে তাই।'[২৫]

কবি দেখিয়েছেন, এই কালোবুদ্ধ একজন আধুনিক মানুষ। প্রবৃত্তির নির্বাপন নয়,প্রেম ও করুণার প্রকাশ নয়, হিংস্রতার উদ্ভাসন তার মধ্যে। তাই, —

'এক স্ত্রীলোক খাবার নিয়ে এসে রাখল সামনে তারপর নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো,
ঠিক যেন তার নিজেরই গুহা
প্রথমে খাবার পরে ঐ স্ত্রীলোককে ব্যবহার করল সে
ক্ষুধার্ত সমুদ্র শান্তি হল না তবু, চেপে ধরল গলা
করুণাবশত তাকে হত্যা করতে হল - শূন্য থালা
কুড়িয়ে নিয়ে চলল, শরীরে শূন্যতার আলো
তোমাদের পূর্ণ করতে এসেছিলাম, ভালবাসা আর অর্থ দান করে গেলাম,
চিনে নাও অতিপ্রাকৃত সব গর্ত
দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধ নিজেই আজ প্রাকৃতিক এবং কালো

এখানে ক্রমান্বয়ে ক্ষুধা, যৌনতা, হত্যা ইত্যাদির পরেও হৃদয়ের শূন্যতার কথা বলে শৈলেশ্বর সমকালীন জীবনের শুধু একটি রূপ নয় সমালেচনাও করেছেন। আধুনিক নিষ্ঠুরতাগুলিকে পরিস্ফুট করবার জন্য শৈলেশ্বর বিদ্রুপ ও ঠাট্টার আশ্রয়ও নিয়েছেন এই কাব্যে ঃ

'অপরাধগুলি শেষ করে তৃপ্ত বোধ করছ তুমি ?

শ্মশানে কীসের কান্নাকাটি — যত রক্ত পড়বে মাঠে তত ভাল ফসল হবে?' (অনিয়ন্ত্রিত বাস্তবতা)।

শৈলেশ্বরের 'পূর্নগ্রাস' আসলে এক বিপন্ন কালবেলার কাহিনী। জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও

ঘৃণা, আলো ও অন্ধকার, স্বপ্ন ও নৈরাশ্যের অপূর্ব যৌগপদ্য। কবির সামনে আর কোনো পৃথিবী নেই, —

পৃথিবীর পথ নাই - মৃত্যু আলোকিত
করে অন্দরমহল, সাপ আর ইঁদুর দুইই আলোকিত।[২৬]

কিংবা —

মাটি সন্দেহজনকভাবে ধরে রেখেছে আমাকে কোনো পরিণতি নাই —
বুক চাপড়ানোর শব্দে ধরা পড়ে প্রতি জন্মের নির্যাতন
সন্দেহজনক যাযাবর সঙ্গে রেখেছে ধুনি, ভিজে উঠেছে মরু ভূমির বালি -
দয়া দেখাও উপপ্লাবিত তুমি -
এখানে কি দরকার ছিল তোমার ? এর জবাব দাও
পাহাড় থেকে নামছে ঢল বুদ্ধ গেছেন কোথায়
ভিক্ষা নিতে গেছেন তিনি বেশ্যা, মাতাল আর খুনীদের কাছে
এখন তিনি আছেন কোথায় ?
শূন্য বলেন তিনি আছেন মাটিতে
পূর্ণ বলে তিনি আছেন সমুদ্রে

বাজারের অন্ধকারে তার অবস্থান
রূপান্তরিত ধানের উপর দিয়ে ভেসে যায় বিষাদসিন্ধুর গান '(ভিক্ষা)।'

বুদ্ধ থেকে বিষাদসিন্ধু, সন্ন্যাসী থেকে অপরাধী, কুশ্রী বাস্তবতায় সবাই আচ্ছন্ন এই ক্লিন্ন জগতের ভয়ংকর ও অসহনীয় রূপটিকে কবি এভাবেই নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধ নেই এ ব্যাপারটি এখানে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, বাস্তবতার এই গলিত রূপ ও বিকৃতিকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন এই ভাবে ঃ

অনুভূতিগুলি হরিয়ে আমি স্বাভাবিক এই শ্মশানে
খুঁজতে এসেছি, আমাদের কথাগুলির আর কি মানে
জীবন কল্পনামাত্র ? ...
কিছু শব্দ আমি শুনেছিলাম যা এই পৃথিবীর নয়
কিছু গান আমি শুনেছিলাম যা মানুষের নয়
কিছু মানুষ আমি দেখেছিলাম যারা এই সংসারের নয়
কিছু ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম যা আলোকিত নয়

শব্দহীন এক ভূখন্ড আছে যা কখনই আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়' (শব্দ)।

বস্তু পৃথিবীর ক্লিন্নতার ভিতরে কবি, এখানে যেন এক অপার্থিব আলো খুঁজে পাচ্ছেন। বলা যায়, দৃশ্য ও অদৃশ্যের এই সেতু নির্মাণ; উভয়ের দ্বন্দ্ব জটিল বিমূর্ততাকে স্পর্শ করবার আকাঙ্খাই 'পূর্ণগ্রাসের' বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে মেলে জাঁ আতুর র‍্যাবোর সেই হ্যালুসিনেশন বা ভিসনারী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ "For he arrives at the unknown. Because he has cultivated his own soul ... He reaches the unknown; and even if, crazed, he ends up by losing the understanding of his visions, at least he has seen them. Let him die charging through those unutterable, unmeable things."[২৭]

শৈলেশ্বর ঘোষের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'উৎসব'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। প্রকাশক কবি নিজেই। কবিতা সংখ্যা ৩৩। কবিতাগুলো একটু দীর্ঘ আকারের। বক্তব্য বা ভাবনার দিক থেকে কোনো নতুন কথা নেই যা কবি আগে বলেননি। তবে মৃত্যু ও প্রকৃতিকে এখানে অনেক বেশী একাত্ম করা দেওয়া হয়েছে। সদর্থকতার ইশারা মিলেছে ক্বচিৎ কখনও। এমনকি সৌন্দর্যও পেয়েছে গুরুত্ব। লোকায়ত জীবনচেতনা, অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্র রচনা করেছে ভিন্নতর নকশা। কবি বলেছেন, —

'অচেনা দেবতার হৃদয় উপড়ে নিয়ে আনন্দে মেতেছি আমরা
মাটি খুঁড়ে বের করেছি দানাশস্য, মাটির বাসন, কঙ্কালের হাসি
ঝড়লণ্ঠন ঝুলছে মাথার উপর বিষাক্ত সাপের ডাক জীবনের প্রতি
সিঁদুর চিহ্ন শিলা, খেলার সাথী, জেগে থাকিস অন্দর মহলে

আমাদের পূজার মন্দির ভূষিত হয়ে আছে রক্ত আর ফুলে (পূজার মন্দির)। কিংবা 'আমাদের জীবন কাছিমের খেলা, সুস্বাদু মাংস ভরা আছে ভিতরে' (সুস্বাদু মাংস)। এখানে মৃত্যুর, ধ্বংসের ও রিরংসার যে উৎসবচিত্র শৈলেশ্বর রচনা করেছেন তাতে অনেক সময়েই আমরা এক অতিপ্রাকৃত এবং অ্যাবসার্ড জগতে চলে যাই। এই জগৎকে কবি কখনও বলছেন 'প্রেতপুরী', কখনও 'বিস্মৃতির দেশ', কখনও 'সমুদ্রহীন এক পৃথিবী', ইত্যাদি। কবি লক্ষ করেছেন,

'বন্ধ্যা চাঁদ মরা আলো সেও অস্তগামী
শিকারের রক্তে পিছল এই জীবনভূমি (চলো)।

অথবা 'খুন করে শব পুতে রেখেছি নিজেরই উঠানে, আমাদের মুখে তাই
কাঁশফুল হাসি
নিজেদের অপরাধ ভুল গিয়ে গন্ধ আর গানে আমরা মাতাল হয়ে আছি

ঋতুতে ঋতুতে চঞ্চল আমরা - অন্ধকার মাটি খুঁড়ে নিজেদের লুকানো শব খুঁজি
দড়ির টানে নৌকা নিজেকে চেনে, জলপথ তার কিন্তু ভ্রমণ তীরের কাছাকাছি
নিসর্গের সন্তান, নিজেকে বিচিত্র করব, তাই মুখে কিছু রঙ মেখে নিয়েছি
(রহস্য শব)।

মৃতদেহ , হাড় মাংস, ভিক্ষুক, মর্গ, উন্মাদ, গর্ভ, মাতাল, জন্মান্ধ, স্বপ্রদর্শন, মদ অপরাধী, খুন এই প্রকার যত শব্দের সমাহার এই কাব্যে রয়েছে তা সবই ফরাসী প্রতীকী কবিদের দান। তবে 'হিংসা সৌন্দর্যের' যে সন্ত্রাসকে যৌনতার আনন্দ উৎসবে কবি পরিণত করতে চেয়েছেন - সেটা তাঁর নিজের কল্পনা। জীবনানন্দের মত তিনি বলেননি, উৎসবের কথা আমি কহি না'ক / পড়ি না'ক গান।' কিন্তু শৈলেশ্বরের এই কাব্যে 'সূর্যের নীচে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় প্ররোচিত হয় — গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ডাকে মদিরার বান।' (উৎসব মদিরা)। আসলে, শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতায় হাংরিদের স্বাভাবিক গুণগুলি উপস্থিত থাকলেও কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাঁর। স্বাভাবিক গুণ বলতে প্রতিবাদ, যৌনতার প্রাচুর্য, অসমাজিকতা, অপ্রেম ও ঘৃণা, রুক্ষতা এসবই বোঝানো হচ্ছে। হাংরিদের নগর জীবন কেন্দ্রিকতাও তাঁর মধ্যে সুপ্রচুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শৈলেশ্বর পাঠককে এই বস্তু পৃথিবীর ক্লেদ ও ক্লিন্নতার মধ্য দিয়ে যেন এক অপ্রাকৃত জগতের দিকে টেনে নিয়ে যান। শহর, গ্রাম, জনপদ পার হয়ে এক অপার্থিব জগতের মধ্যে ঠেলে দেন। তাঁর কবিতা তাতে আরও আকর্ষণীয় ও রহস্যময় হয়ে ওঠে কিন্তু এই প্রকাশ, এই পরিণতি গতানুগতিক উত্তরণ জাতীয় কিছু নয়। যদি তা হতো, তবে হাংরি কবি হিসেবে শৈলেশ্বর তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতেন। অন্য আধুনিকের বৈশিষ্ট্যই অর্জন করতেন তিনি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই শৈলেশ্বর এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' কাব্যের 'বাড়ী খুঁজতে গিয়ে' কবিতায় বলেছিলেন —

চলে গেলাম মায়ার দিকে মায়হীনতার দিকে
স্বপ্ন এবং স্বপ্নহীনতার প্রতিশব্দবিহীনতার দিকে।
এই কবিতাতেই বলেছিলেন, বাড়ি ঘর খুঁজতে গিয়ে
দক্ষিণ সমুদ্রের পরেই আমার মৃত্যু
দক্ষিণ সমুদ্রে পারে আমারই ময়ূরপঙ্খী
বাদাম ফুলে উঠছে।

'দরজা খোলা নদী' কাব্যে 'বিশ্বাসঘাতকের জুতো' কবিতায় শৈলেশ্বর
লিখেছেন, — হলুদ পাতা ঝরে পড়ে, আকাশের জলে শুকনো মাটি হল কাদা
তবে সব কিছু শেষ হয়নি পৃথিবীতে! নাও ঘ্রাণ ... ঐ উন্মোচিত স্তন

এমনকি প্রকৃতি থেকেও তিনি ইন্দ্রিয়ের তাপ গ্রহণ করেছেন। 'দরজা খেলা নদী' কাব্যে

'জীবনের খেলা' কবিতায় বলেছেন, —

সমুদ্রে গন্ধে আমার ইন্দ্রিয় চৈতন্য হয়
বরফের শৈত্যে আমার চেতনা ইন্দ্রিয় হয়।

'উৎসব' কাব্যে আমার আনন্দ কবিতায় বলেছেন, —

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় থমকে গেলাম, সৌন্দর্য এই রাত্রির বুকে
জাগিয়ে তুলেছে রক্তের পিপাসা —

এখানে প্রকৃতি যেন হিংস্র জন্তুর মতো হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রকৃতিকে নানা ভাবেই এ কবি ব্যাখ্যা করেছেন। শৈলেশ্বরই সেই হাংরি কবি যিনি প্রেমের আকাঙ্খাকে এভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন — 'উদ্দীপনা নক্ষত্র স্বাগত জানাই তোকে - হৃদয় ছিল এক অন্ধকার দেশ। সেখানেই ডেকে উঠেছিল পাখি, হৃদয়ে ছিল এক সুপ্তির সমুদ্র সেখান থেকে উঠে এল বন্য প্রজাতি' — (স্বপ্নদর্শন, উৎসব কাব্য)। এই ধরণের আধা রোম্যান্টিক, আধা প্রকৃতিবাদী - জৈবিকতার প্রকাশ শৈলেশ্বরের কবিতাকে ভিন্ন ধরণের স্বাতন্ত্র্য দান করে। শুধু ষাট দশকের উত্তাল সময় নয়, সমকালীনতাকে অতিক্রম করে মানবজীবনের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বকে, রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের নানা গোপন বেদনাগুলোকেও তিনি রূপদান করেন। হাংরিদের হঠকারী চেতনার সঙ্গে বেদনার এই অনুরণন শৈলেশ্বরের কবিতাকে মায়াময় করে তোলে।

(গ) প্রদীপ চৌধুরী ঃ

হাংরি সাহিত্য আন্দোলনের প্রথম যুগের সংগঠকদের মধ্যে প্রদীপ চৌধুরী অন্যতম। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায়। খুবই ছোটবেলায় এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন। প্রথমে কলকাতায়, পরে ত্রিপুরায় চলে যান। ছাত্রাবস্থায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে হাংরি সহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেখানে কবিতা রচনায় অশ্লীলতার দায়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে সুবো আচার্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। দু'জনেই হাংরি সাহিত্য আন্দোলনের অংশভাক হন। সেখান থেকেই ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম. এপাশ করেন। এদিকে হাংরি বুলেটিনে লেখার জন্য পুলিশ তাঁকে ত্রিপুরা থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা সেখানে থাকতেন। ভারতীয় কয়েকটি ভাষা ছাড়াও প্রদীপ চৌধুরীর গ্রন্থ ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রদীপ বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী ও একটি পুত্র আছে। স্ত্রীর নাম গৌরী চৌধুরী। পেশায় প্রদীপ বিদ্যালয় শিক্ষক এবং বহু বছর ধরে কলকাতার কাছে যাদবপুরে বসবাস করছেন।

প্রদীপ চৌধুরীর প্রথম গ্রন্থ 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' ১৯৬৪ সালে বেরোয় ত্রিপুরার আগরতলা থেকে। এটি গদ্য ও কবিতার মিশ্রণ। গদ্য অংশে আত্ম জৈবনিকতা ও কড়চার ধরণ। তাকে স্বগতোক্তিও বলা যায়। কবিতা অংশে আছে এগারোটি রচনা। সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, নগর ও প্রকৃতির টানোপোড়েনের ভিতর দিয়ে এক তরুণ প্রেমিক কীভাবে নিজেকে অন্বেষণ করছেন তারই আর্তি এই এগারোটি কবিতার মধ্যে মেলে। প্রথম কবিতা 'শহর শহর'। এখানে প্রদীপ বলছেন, 'আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছ

আমার মা
ওঃ
অসহ্য
অসহা
ইতিহাসের পাতায় পাতায়
মানুষের
রক্ত
এবং
বুটের ঘা
ইতিহাস

আমাকে ফোঁপড়া করে দিয়েছে।'[২৮] 'নষ্ট গাড়িবারন্দা' কবিতায় বলছেন,

'১৯৫২ সালের খাদ্য আন্দোলন আমাকেও স্পর্শ করেছিল ...
বনের ভিতর অন্ধকার, বনের পেছনে নদী
আমার স্পষ্ট মনে পড়ে বেশ কিছুকাল সৎমার মাই চাটছিলাম।'

প্রদীপ চৌধুরী লীনা নামক তাঁর নারীকে বলছেন,

" এখন তোমার মুখে আদিম জ্যোৎস্না
ফোটে কাছাকাছি হ্রদতট ও খাদ
জ্যেৎস্নায় শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিরহ ও যৌন কোলাহল"
(বিধ্বস্ত উপজাতি)

আরেক জায়গায় বলেছেন, "নির্ভুল বিকেলে আমি উত্তরের মাঠে গিয়েছিলাম অথচ প্রতীক্ষার ত কাউকে দেখিনি পথের দুধারে আমি স্মিত কুসুমের নাম একে একে জানতে চেয়েছি - প্রত্যেকেই আশ্চর্যনীরব।' (সাময়িকতা)। 'একজন্মের পাপ' কবিতায় নারীর উদ্দেশ্যে বলছেন, 'একুশ ঋতু মাতাল ঋতু মাথা কোটে দুর্বিনীত, তোমার ভালবাসা মানেই বিপন্নতা।' এই গ্রন্থের শেষ

দুটি কবিতা প্রেমিক তোমার চাবুক', এবং 'সমুদ্র' রোম্যান্টিক প্রেমভাবনাতেই পরিসমাপ্তি পেয়েছে। বলা যায়, প্রদীপ চৌধুরী প্রেমহীনতা ও প্রেম বিপন্নতার ছাঁচটি বজায় রাখতে পারেন নি।

প্রদীপ চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ '৬৪ ভূতের খেয়া' ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশ পায়। যদিও মুদ্রিত হয় আগরতলায়। এই গ্রন্থে ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কলকাতা মহানগরী, তার যান্ত্রিকতা, মানবিক সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, যৌনতার অস্থিরতা ও প্রলাপ এবং ব্যক্তি আমির হাহাকার এখানে প্রভূত ছড়িয়ে আছে। অনেক সময় সমর সেনের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, 'মহানগরীর বিবর্ণ দিন ও আলকাতারার মতো রাত্রি'র কথা। তফাৎ এইখানে যে, সমর সেন বলেছিলেন বন্ধ্যা শহরের কথা। আর প্রদীপ বলেছেন, জারজ শহরের কথা। সমর সেন চলে গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণার শাল মহুয়ার রুক্ষ প্রান্তরে, আর প্রদীপ শেষ পর্যন্ত এই শহরের মধ্যে এবং আত্মকৃত জটিলতার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন। প্রদীপ নেশাগ্রস্ত — প্রতিবাদ ও প্রতিযোগিতার গোলোকধাঁধায় অংশগ্রহণকারী একজন সংবেদনশীল মানুষ। তাই খুবই ব্যাঞ্জনাগর্ভ ভাষায় প্রদীপ বলেন —

এই শহরের শেষ মোমবাতিও আমার টেবিলে জ্বলে গেল
এই টেবিল থেকেই লাফিয়ে পড়েই আমার
বিড়াল খুঁজবে তার ক্ষুধার্ত আত্মা
তার লালসা পিঙ্গল চোখ, নরম থাবা
দিয়ে সে আমার আন্ডারওয়ার
ছিঁড়েছে মানুষের বিবেকের মতো
লীন হয়ে গেছে আমার সঙ্গে
মানুষের মতোই সে আমাকে ব্যবহার করে
পাণ্ডুলিপি ছিন্নভিন্ন করে' (বিড়াল)।

অথবা 'সব যানবাহন ছুটছে ছুটছে
কোলকাতায়
স্কোয়ার
এভেন্যু পার্ক গণিকাপল্লী গোলপার্কের ভেতর দিয়ে
সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে
যানবাহনে বদলে যাচ্ছি বধিরতায় রক্তে মেদে পরিপূর্ণ, (সময়-ধর্ষিত ভাঁড়)।

প্রদীপ বলেছেন, 'গ্রন্থিহীন এ শহর, শেকড়হীন সভ্যতা ও ঈশ্বর ভাইরাস
এক পবিত্র জীবনস্রোত সাঁতরে এসপ্লানেড

পেরোচ্ছি, আমরা, আমি ও সুভাষ' (মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ)।

পবিত্র জীবন ? কী সেই পবিত্রতা? যেখানে ঘৃণা, ক্লান্তি, অপ্রাপ্তি ও শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই সেখানে 'পবিত্র' শব্দটি একধরণের তির্যক ঠাট্টা ছাড়া কিছুই নেই। পৃথিবীর যাবতীয় বিসংগতিকে যিনি আত্মপীড়নের শারীর ক্রিয়ায় মুক্তি দেন তাঁর কাছে 'পবিত্র' শব্দটি রসিকতা ছাড়া আর কী? 'কালো দিন কালো রাত্রি পৃথিবীর কালো খেলাধূলা'য় অংশগ্রহণকারী প্রদীপ শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরের মধ্যেই গুটিয়ে যান ঃ

"নিশুতি শরীর কিংবা নশ্বর দেহের মতো রাত আমার শরীরে পথ, শরীরের মতো চোরা গলি' (এই নষ্ট দেহ আবার নিজের কাছে চলে আসে)।

জীবনানন্দ নিজেরই মুদ্রাদোষে একা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রদীপের একাকীত্বের জট একটু অন্য রকম ঃ

আমার সারা শরীরে
অক্ষমতা বা প্রতিভা যাই বলুন
আমাকে নিয়ে আসে
রঙীন তটের কাছে একা, কবরের ভিতর একা
নগরের ভেতর একা, পার্কে ডায়েনিং টেবিলে একা,
যাদবপুর গড়িয়া বেতাইতলায় একা, প্রস্রাব করতে করতে
একা
অন্ধকারে একা, একা, একা
পুরুষনুক্রমিক রক্ত থেকে আমি বেরিয়ে এশ্চি
নয়া পয়সার হিসাব থেকে বেরোতে পারি না'

(সময় - ধর্ষিত ভাঁড়)।

তাই শহরের মধ্যে, নারী প্রেমিকার আবর্তে, জুয়ার টেবিলে, মাদকদ্রব্যে, খালাসী টোলায় একজন উদভ্রান্ত ভবঘুরে প্রদীপকে হতেই হয়। যদিও কোনও গন্তব্যে তিনি পৌছতে পারেন না। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

'খেয়া পারাপার হয় না
কেবল এ ফুল থেকে ঐ ফুলে চলে যায়
জীবনের বিষাক্ত পরাগ'

(মধ্যরাত, অক্টোবর ১৯৭০)

প্রদীপ চৌধুরীর তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ 'কালো গর্ত'। ১৯৮৩ সালের মে মাসে কলকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। মোট সংকলিত কবিতা বাহান্নটি। এই কাব্যে অল্প হলেও স্বপ্নের এবং ভালোবাসার অস্তিত্ব জানান দিয়েছে। গ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই কবি বলেছেন,

"কিছু অপরাধীকে বলি, তোমাদের সামনে রয়েছ ভালাবাসার বিশাল দিগন্ত

তোমরা সংঘবদ্ধ হও...

অন্ধকার গর্ত থেকে তোমরা তোমাদের শিকড়গুলিকে

মেলে দাও স্কাই স্ক্রেপারের নীচে আত্মগোপনকারী

ভালবাসার বিশাল ফসলগুলি এভিনিউয়ের চারদিকে ছড়িয়ে দাও"

- (গোলপার্ক)

শুধু এটুকু নয়, গ্রাম ও শহরের মধ্যেও মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন কবি। আর হারিয়ে যাওয়া ধর্ষিতা বালিকা, গ্রাম্যবালিকা যেন নাগরিক বাস্তবতা ও বিরংসাকে জয় করে ফিরে এসেছে ঃ

'পূর্ব গোলার্ধের সবাই-এর সঙ্গে আমরাও

দেখব একদিন অস্তগামী সূর্য

গলিত সোনার মতো শরীর বিছিয়ে দিয়েছে

শহরের আর গ্রামের

গ্রামের আর শহরে এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে

আর তক্ষুনি পিঠ ভর্তি চুল এলিয়ে

গম্বুজ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে

আমাদের বোন,

তার মুখে গর্বিত ও অর্থপূর্ণ হাসি' — (নাগরিক উপকথা)

পূর্ববর্তী কাব্যে নগরীর কাছে যে আত্মসমর্পন ছিল কবির - তাও এখানে কখনও সখনও অন্তর্হিত। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন এখানে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। আমি হয়ে গেছে বহুবচন 'আমরা'। প্রদীপ লিখেছেন, 'এই নগরীর প্রবেশ ও প্রস্থান পথগুলি

আমাদের ক্ষুব্ধ শরীরের আঘাতে

তছনছ হয়ে গেছে ...' এবং

'কিছু সময়ের মধ্যে আমরা ঐ স্তম্ভকেও টেনে নেবো

ঘূর্ণি জলের কেন্দ্রাভিগ টানে'

(টি. ভি. টাওয়ার)।

অভিজ্ঞতাকে এ কাব্যে কিছুটা গুরুত্ব কবি দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এখানে কিছুটা প্রসারিত - শুধু নগর কলকাতা নয়, সমস্ত পৃথিবী ও পরিব্যাপ্ত সময়কে তা আশ্রয় করেছ। কবির নিজের ভাষায় ঃ

'এই ধাতুসূর্যের নীচে সম্পূর্ণ পৃথিবী
আমি এর প্রতিটি গলি ও
অন্ধগ্রন্থিতে উন্মত্ত অপভ্রমণ করেছি'

(ব্যক্তিগত ৬)।

অভিজ্ঞতার এই সঞ্চয় কি কবিকে কিছুটা আস্থাশীল করেছে? কালো অন্ধকারের মধ্যেও আলোর অরুণিমা সঞ্চারিত করেছে? কেননা কবি বলেছেন,

'আমি খুব বড় নদী দেখেছি
ভারতবর্ষে, মানুষের চূর্ণ সভ্যতায় ...
আমি ভারতবর্ষের গোঁড়ালিতে
ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি
আমার চোখের সামনে মাথার খুলির সমুদ্র
এবং অর্থপূর্ণ হাই-ফাই সঙ্গীত
ভারসাম্য, ভালবাসা, সক্রিয় উত্থান
লোহিত সাগরের বুক চিরে সূর্য ওঠে
এবং কিছু দরকারী উত্তাপ রেখে ডুবে যায়' (দুই অধ্যায়)।

জীবনকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন একটি অলৌকিক ও মহার্ঘ অভিজ্ঞতা হিসেবে ঃ

' এই তো মানুষ জন্ম, শেষ সত্য আমাদের
পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে বিস্মিত চোখের দেখা
ছাড়াছাড়িহীন' (দীর্ঘযাত্রা)।

তাহলে মিলনও সম্ভব? প্রকৃতির সঙ্গেও প্রদীপ একাত্মতা গড়ে তুলেছেন।

— " চৈত্রের বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে নিজের কথা
শোনো, শোনো আমি কি বলছি
আমি এক অতিকায় নিয়ম, উজ্জ্বল তারা
মেঘের গিঁট -" (গ্যাস স্টেশন - কাট্ আপ)। যদিও এ কবিতায়

শেষের দিকে তিনি বলেছেন, 'অসুস্থ দিগন্তরেখা কালো হয়ে যাচ্ছে
যথেচ্ছাচারী হাঁসের ঝাঁক।'

আবার যে ভবিষ্যৎ তাঁর সামনে তা ঘটনাহীন শূন্যতায় অর্থহীন। প্রদীপের প্রথম কাব্যগ্রন্থে তাঁর যে আত্ম-অন্বেষণ ছিল তা তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এক দীর্ঘ যাত্রার মাত্রালাভ করেছে। এইখানে আপাতভাবে তাঁর সঙ্গে মলয় রায় চৌধুরীর মিল। কিন্তু দুই কবিরই প্রকৃত উৎস 'চসারের' কবিতা। কারণ 'ক্যান্টারবেরি টেলা' স-এ এমনই এক অভিযাত্রার ছবি ছিল। যাই হোক, প্রদীপ বলেছেন, 'মানুষের দীর্ঘযাত্রা সমুদ্রের দিকে / ব্যাঞ্জো ও বল্লম হাতে' (দীর্ঘযাত্রা)। তবে প্রদীপ যাত্রার ইতিহাস বা দ্বান্দ্বিকতা কোনোটিকেই শেষ পর্যন্ত পরিস্ফুটিত করতে পারেননি। যৌনবিকার ও অস্থিরতার বিশৃঙ্খলতায় হারিয়ে গেছেন। প্রদীপের নিজেরই ভাষায় বলা যায়,

"সমুদ্র প্রবল ক্রোধে পাথরের শত্রুতা
ভোলে না,তার সাদা ফেনণা বিজ্ঞাপিত
মুখগুলিকে
একবার মাত্র ভিজিয়ে দিয়ে মরে যায়।'
(বিরোধী প্রতিষ্ঠান)।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা একধরনের বৈপরীত্যের গ্রন্থন। একদিকে ব্যক্তি আমি অন্যদিকে সময় সভ্যতার বিস্তৃতি, একদিকে কলাকাতা মহানগরীর পটভূমি ও অনুষঙ্গ, অন্যদিকে সমুদ্র, পর্বত তথা দূরান্তীর্ণ প্রকৃতির সাহচর্য্য, একদিক তিক্ততা ও ঘৃণা, অন্যদিকে প্রেমের আততি। এ ভাবে বিপরীত ঊর্ণাজালে কবিকে দোদুল্যমান দেখা গেছে। তবে সেখানে দ্বন্দ্বের নকশা তৈরী হয়নি। কবি নিজেই বলেছেন, "এই সম্মোহন আক্ষরিকভাবে সত্য হতে পারত

এই বর্ণহীন মৃত্যু খুলে দিতেহ পারত
আকাশের চূড়ান্ত নীল রহস্য
এই মফঃস্বল প্রকৃতির মতো সত্য হতে পারত।"
(সম্মোহন)।

প্রদীপ চৌধুরী সম্পর্কে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "প্রদীপের 'চর্মরোগ' গ্রন্থের মলাটে ওর দুই পা ফাঁক দাঁড়ানো ছবিটি যেন ওর স্বভাবের 'ইমেজ'।[২৯] যেন ও

সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ...ওর অজান্তে দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কিছু পালিয়ে যাবে না?" তো ছবিটি স্পষ্টরেখ নয় বলে, সত্য সত্যই প্রদীপ অনেক সময় দিশাহীন হয়ে উঠেছেন। অমিতাভ দাশগুপ্ত ঠিকই বলেছেন, 'ওর লেখার মাঝেহ মাঝে প্রচন্ড ইল্যুমিনেশান আছে, সম্পর্ক আছে, মাঝে মাঝে অসম্ভব সত্যবাদী - কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔদাসীন্য, নির্লিপ্তি বা যে জরুরী নিষ্ঠুরতা ছাড়া, মোহিতের ভাষায়, কোনো বৃক্ষ মাটির বুক ভেঙে ওঠে না - সেই আলটিমেট জিনিসেরই মর্মান্তিক অভাব।"[৩০] একথা আমাদেরও সত্য মনে হয়।

(ঘ) ফাল্গুনী রায় ঃ

ফাল্গুনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। বাসুদেব দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও রাজলক্ষ্মী প্রেস, হাবড়া, ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। এখানে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ১৪। ফাল্গুনীর কাব্যে একজন তরুণের প্রতিবাদ, জ্বালা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। রাজনৈতিক প্রসঙ্গও চলে এসেছে সরাসরি। তবে কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ নির্ভরতা নেই। ধর্মের বিরোধিতা আছে, রাষ্ট্রের বিরোধিতা আছে, নন্দনতত্ত্বের বিরোধিতা আছে। সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতিও ঘৃণা আছে। অন্য হাংরি কবিদের মত তত্ত্ব বা বিমূর্ততার ধার তিনি ধারেননি। আবার তাঁর কবিতায় যে প্রবল চীৎকার লক্ষ করি তা মলয় রায়চৌধুরীর মত নিরাবেগ নয়। আবেগের উত্তাপই ফাল্গুনীর চীৎকারের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। তাঁর আবেদন মস্তিষ্কের প্রতি তত নয়, যতটা হৃদয়ের কাছে। তাই ফাল্গুনীর প্রকাশভঙ্গী অকপট, সরল। এতদ্ব্যতীত, তিনি যে মাদক সেবন করে কলকাতার পথে ঘাটে বা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন তারও ছবি কবিতায় চলে এসে একটা আলাদা মাত্রা রচনা করেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় যেমন একটা ঘোর লক্ষ করা যায়, তেমনই ফাল্গুনী রায়ের মধ্যেও। ফাল্গুনী 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' কাব্যের প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর বিষয় ও অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়েছেন,

'এইখানে সমুদ্র ঢুকে যায় নদীতে নক্ষত্র মেশে রৌদ্রে
এইখানে ট্রামের ঘন্টিতে বাজে চলা ও থামার নির্দেশ
এইখানে দাঁড়িয়ে চার্মিনার ঠোঁটে আমি রক্তের হিম ও উষ্ণতা
ছুঁয়ে উঠে আসা কবিতার রহস্যময় পদধ্বনি শুনি - শুনি
কবিতার পাশে আত্মার খিস্তি ও চীৎকার এইখানে
অস্পষ্ট কুয়াশার চাঁদ এইখানে ঝরে পড়ে গণিকার রক্তস্রাবে' (এইখানে)।'

সমুদ্র ও নক্ষত্রের বিশালতার সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর ধাতব যান্ত্রিকতাকে কবি যেমন এখানে মিশিয়েছেন, তেমনই, কুয়াশার চাঁদ, গণিকার রক্তস্রাব দুটি আপাতবিরোধী দৃশ্যময় বাস্তবতাকে

morbid metaphor হিসাবে প্রয়োগ করেছেন। এভাবে আধুনিকতা স্পষ্টতা পেয়েছে। এ কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা 'আমার রাইফেল আমার বাইবেল।' কবিতাটির বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে উৎকট যৌনতা ও ধর্মবিরোধিতা থাকলেও তার উপসংহৃতি ঘটেছে রাজনৈতিক ইশারা দিয়ে। সমকালীন সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে এখানে। সাধারণ কৃষকদের কথা আছে, দরিদ্র মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গ আছে, ভারতের মেকি স্বাধীনতার কথাও আছে। ফলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক লেখা হিসেবেও একে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর ভাষায় -

'চে গুয়েভারাও মুক্তি চেয়েছেন এবং পরাধীন,
ভারতের কবি লিখেছিলেন, যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষী চাষ, কাটছে, পথ কাটছে
বারোমাস সেখানেই দেবতা আছেন দেবতা নাই ঘরে - এই
ধরনের মুক্তিপ্রসঙ্গ লেখা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে আমি আজ
স্বাধীন ভারতের কবি - দরিদ্রতার হাতে বন্দী অগণন শিশুদের নির্ভেজাল

হাসি দেখে তাঁদের মুক্তির কথা ভাবি - পেটোর বদলে দুটো কবিতা পকেটে নিয়ে গল্প কবিতার দিকে হাঁটি, এই পথে একজন

অগ্নিযুগের বিপ্লবীর নামে রাস্তা ও বাজার আছে, সত্তর দশকের
একজন শহীদের জন্যে একটি শহীদবেদী এই পথে।'[৩১]

রাজনৈতিক নৈরাজ্যের সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত এ কবিতায় ভেঙ্গে গেছে। যাবেই কেননা ফাল্গুনীর মানস প্রকৃতিতে তারুণ্যের অস্থিরতা ও 'মেয়েছেলের' প্রতি আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। নাম কবিতায় বিপ্লব ও যৌনতার দ্বান্দ্বিকতাকে স্পষ্ট করেছেন ফাল্গুনী ঃ

'হিংসা ভালো লাগে না আমার বিপ্লব ভালো লাগে জোতদার ও কৃষকের
যুদ্ধময় ধানক্ষেতে আমিও খেয়েছি খুব ধানশীষের দুধ।'[৩২]

অতএব হিংসাশ্রিত বিপ্লবের চেয়েও প্রেমের দিকেই যে কবির টান তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই প্রেমও আবার রিরংসা ও ঘৃণার অর্থহীনতায় অলংকৃত।

অসামাজিকতার বিপথগামিতায় তিক্ত ঃ

'গণিকার বাথরুম থেকে প্রেমিকার বিছানার দিকে
আমার অনায়াস যাতায়াত শেষ হয় নাই - আকাশ গর্ভ
থেকে তাই আজো ঝরে পড়ে নক্ষত্রের ছাই পৃথিবীর বুকের উপরে

তবু মর্গের ড্রয়ারে শুয়ে আছি এক মৃতদেহ আমার আত্তশরীর নিয়ে
চলে গ্যাছে তার শাখাভাঙা বিধবার ঋতুরক্ত ন্যাকড়ার কাছে
প্রজাপতির চিত্রল ডানা দেখে বিরহ থেকে বিবাহের দিকে
চলে যায় মানুষেরা
আমি এক সৌন্দর্য রাক্ষস ভেঙে দিয়েছি প্রজাপতির গন্ধসন্ধানী শুঁড়'
(আমি এক সৌন্দর্যরাক্ষস)।

লক্ষণীয়, 'সৌন্দর্য রাক্ষস' শব্দটি এবং প্রজাপতির শুঁড় ভেঙে দেবার প্রয়াস। কিন্তু ফাল্গুনী যে বিপ্লবীর চেয়েও কবি, তার নৈরাজ্যের আড়ালেও যে রয়েছে সংবেদনশীলতা তার প্রমাণ রয়েছে অন্যত্র, —

'আমি এক উদোম ন্যাংটো ঘুরে বেড়াই বিশ্বাসবিহীন
খুব সহজ নিশ্বাসে
কিন্তু দীর্ঘ নিশ্বাস যখন লোকচক্ষুর আড়ালে ছাড়ি
তখন তুমি নারী
তুমি দেখো না সেই কামুক জন্তুটার চোখে কি রকম জল থাকে যার
অপর নাম অশ্রু।'
(আমি মানুষ একজন)।

এই ধরণের স্পর্শকাতরতা অন্যধরণের ভাষাতেও প্রকাশ পেয়েছে ঃ

'... আমি এক জরায়ু থেকে বেরিয়ে আরেক জঠরে
খুঁজে ছিলাম আমার সন্তানের মুখ
আমার মৃত পিতার শরীর দেখে আমি বুঝেছিলুম
বেঁচে থাকা জরুরী আমার মা'র হতাশা দেখে
বুঝেছিলুম মৃত্যুও দরকারী হতে পারে জীবনের' (ভ্রমরবিহীন কিছু ফুল)।

অর্থাৎ সামাজিকতার, গার্হস্থ্যের একটি চোরাটান যে ফাল্গুনীর মধ্যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আলবেয়ার কামুর 'আউটসাইডার উপন্যাসের মাতৃ অনুষঙ্গকে একটু উগ্রভাবে ব্যবহার করেছেন ফাল্গুনী ঃ 'মা, বিদেশভ্রমণের দিন তোমাদের অভিজাত সমাজের অনেকেই ভদকা, গিলেছেন, আমি নির্বিকার তোমার চিতা থেকে ধরাবো চার্মিনার যদিও শেষ রক্ষা হয় না। বলেন পরের লাইনেই - 'তোমার মৃত্যুর কথা ভাবলে আমার চোখে জল আসে' এবং '... মা, আমিও মরে যাবো একদিন।'[২৯] এই কবিতার অন্তিম পংক্তিগুলি বিষণ্ণতা ও নৈঃসঙ্গের মায়াবী আলোয় কোমল

ঃ 'আমার মুখের উপর এসে পড়ছে ডুবন্ত সূর্যের আঁচ আর সূর্যাস্তের রং পাখায় মেখে পরিবার পরিকল্পনাহীন পাখির দল ফিরে যাচ্ছে বনলতা সেনের চোখের শান্তিময় নীড়ের দিকে - ডিমে তা দেবার সময় এসেছে তাদের' (নির্বিকার চার্মিনার)। একদিক থেকে বলা যায়, বিপ্লব এবং প্রেমের এই দ্বন্দ্ব বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে নতুন কিছু নয়, বাঙালী মধ্যবিত্ত কবির মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। সমর সেনের কবিতাবলী তার সাক্ষ্য। মার্কসীয় চেতনা ও রবীন্দ্র ভাবকল্পনার মিশ্রণও করেছিলেন ঐ কবি। একই কাজ করেছেন ফাল্গুনী রায় ঃ

মাও সে তুঙের বই পড়ে আমরা যারা
এবার ফিরাও মোরে পড়ে
কম্যুনিষ্ট হয়ে যাই পরোপকার বৃত্তি থেকে স্বেচ্ছায় বিপ্লবী
সেই আমরাই হব কি রেজারেকশন
অথবা পাড়ার বাবলিদের টিটকিরি খেতে খেতে
গেঞ্জি লুংগী পরে রকে বসে বিড়ি খেতে খেতে আমরা শুনে যাবো নির্বিকার
রবীন ঠাকুরের গান (আমরাই রেনেশাঁ ও রেজারেকশন)।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসঙ্গতির দ্বন্দ্বকে ফাল্গুনী শেষ পর্যন্ত নিয়তিবাদের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন। জৈব প্রকৃতির আদিমতা, অন্ধতা তাঁকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাকেই তিনি জীবন বলে জেনেছেন। মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই, কবিতায় বলেছেন,

'আমি মরে গেলে দেখতে পাবো জন্মান্তরের করিডোর
আমি জন্মাবার আগের মুহূর্তে আমি জানতে পারিনি আমি জন্মাচ্ছি
আমি এক পরিত্রাণহীন নিয়তিলিপ্ত মানুষ
আমি এক নিয়তিহীন সন্ত্রাসলিপ্ত মানুষ
আমি দেখেছি আমার ভিতর এক কুকুর কেঁদে চলে অবিরাম
তার কুক্কুরীর জন্যে এক সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসিনীর স্বেচ্ছা কৌমার্য
নষ্ট করতে হয় উঠে তৎপর লম্পট, আর সে লম্পটের কাছে
গুঁড়ো হয়ে যায় এমনকি স্বর্গীয় প্রেম - শেষ পর্যন্ত আমি
কবিতার ভিতর ছন্দের বদলে জীবনের আনন্দ খোঁজার পক্ষপাতী
তাই জীবনের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই মানুষের সংগে
আমার কোন বিরোধ নেই।'

ফাল্গুনী রায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমি অপদার্থ' প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পনেরো বছর

পরে ১৯৯৬ সালে। প্রকাশক গ্রাফিত্তি। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত লিখিত কবিতাগুলোকে নানা পত্র পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এখানে মুদ্রিত করা হয়েছে। যাই হোক, এ কাব্যে সংকলিত কবিতার সংখ্যা ২৬টি। গ্রন্থটির কবিতাগুলি পাঠ করলে কবির তীব্র উন্মার্গগামিতা অনুভব করা যায়। মাদকদ্রব্য সেবনজাত অস্থিরতা শুধু নয়, মৃত্যুর সম্ভাবনাও এখানে উঁকি দিয়েছে। নিজের জীবন যে শেষ হয়ে আসছে তা কবি বুঝতে পেরেছেন। তবে, জীবন বা মৃত্যু কোনোটির প্রতিই তাঁর বেদনা দেখা যায়নি। বরং প্রতিবাদের ধরণটি এখানে আরও প্রখর; ধর্ম এবং রাজনীতি উভয়কেই এখানে তিনি আক্রমণ করেছেন। কখনও কখনও সেই আক্রমণ অসহ্য। এখানে ফাল্গুনীকে একজন 'অ্যানার্কিষ্ট' বলা যায়। সম্ভবতঃ সমকালীন নকশালদের আন্দোলন তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু ফাল্গুনীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সংঘ শক্তির চেয়ে ব্যক্তির জীবন সংগ্রামকেই প্রতিপাদ্য করে তোলেন। এবং নিজেকে একজন অরাজনৈতিক মানুষ হিসেবে দেখাতে ভালবাসেন। 'আমি অপদার্থ' কাব্যে ব্যক্তি ফাল্গুনী রায়কে খুঁজে পাওয়া যায় যিনি কখনও প্রেম, সৌন্দর্য, কবিতা ও সংগীতের জন্য আর্ত, কখনও প্রতিবাদে স্পষ্টভাষী ও কর্কশ, কখনও সাহিত্য ও কবিতার একজন আত্মধরণের তাত্ত্বিক (self styled theorist)। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা' কবিতায় তিনি জানিয়েছেন

দলীয় পতাকা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি মেয়ে মানুষের
ভালোবাসা ছাড়াই আমি বেঁচে আছি সাড়ে বারোটার
রোদ্দুরে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার জন্য আমি বেঁচে আছি।

জানিয়েছেন,

শোকের ভেতর গরীব বড়লোক বা বুর্জোয়া কম্যুনিষ্টের কোনো পার্থক্য নেই
তবু কারো মৃত্যু পাখীর চেয়ে হাল্কা
তবু কারো মৃত্যু পাহাড়ের চেয়ে ভারী'[৩৪]

রাষ্ট্রের এমনকি সমাজতন্ত্রেরও সীমাবদ্ধতা নিয়ে কবি

বলেছেন,

'রাষ্ট্র কি সব কিছু দিতে পারে
লাষ্ট বয়কে ফার্ষ্ট বয় করে দিতে পারে সাম্যবাদ?
বাজে কবিকে ভালো কবি করে দিতে পারে সমাজতন্ত্র?'[৩৫]

বোঝাই যাচ্ছে, সব ধরণের system -এ যারা প্রান্তিক মানুষ তাদেরই কথা বলছেন কবি, নিজেকেও একাত্ম করেছেন তাদেরই সঙ্গে। সেই জন্যই বিপ্লবেও আস্থাহীন ফাল্গুনী 'বিপ্লবের গান' কবিতায় বলেছেন 'বিভিন্ন ময়দানে নেতাদের ভাষণ শুনে শুনে আমাদের অনেকের পচে গ্যাছে

কান।' আরেকজায়গায় বলেছেন, 'নৈশ ভোজসভায় সস্ত্রীক সিদ্ধার্থ জ্যোতি করে থাকেন পরস্পরের ভেতর হাসি ঠাট্টা আর হে কলকাতার মানুষ আমরা কেবলি কি খাবো ইন্টারপার্টি কলিশনের বুলেটের গাট্টা' (বিসর্জনের মুক্ত ধারায়)। রাজনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতার পাশাপাশি সামাজিক কুসংস্কারেরও বিরোধিতা তিনি করেছেন। বৃষ্টি নামানোর জন্য সুদূর রাজস্থানে শিশুবলির ঘটনার উল্লেখও আছে এই কবিতাটিতে। এই হিংসা ও হননের পৃথিবী ফাল্গুনীর সহ্য হয় না। মানবসভ্যতার মুক্তিকামী আদর্শবাদীদেরও একই কারণে তিনি মেনে নিতে পারেন না। বলেন,

'আমি জানি না সার্ত্রে
বা মার্কস কেন
কেন শুধু ক্রোধ হিংসা ঈর্ষার অনুভব ছুঁয়ে বুঝি জীবনের স্রোতের
অন্তস্রোত এই সব অনুভূতি ঘৃণধরা জীবনের ভিতর নতুন জীবনের
বীজ বুনে দেয় কিন্তু সে সব জীবনের কথা লিখতে ইচ্ছে করে না
আসলে আমি ঠিক সেরকম বিশ্বাসী নই
আমি আমার মতন, বিশ্বাস করি' (আমি আমার মতন)।

বস্তুত সমগ্র 'আমি অপদার্থ' কাব্যটি ফাল্গুনীর 'আত্মনির্মাণ' ছাড়া কিছুই নয়। শুধু মানুষ নয়, একজন কবি মানুষের একখানি আত্মদর্পনও বটে। সেই মানুষটি কী রকম 'অনাবশ্যক কবিতা'য় নিজেই তা জানিয়ে দিয়েছেন,

'এখনো আমি মরতে ভয় পাই অর্থাৎ বাঁচতে ভালবাসি
তাই মেঘলা আকাশের তলায় এক হাতে রেড বুক
অন্য হাতে জীবনানন্দের কবিতা
নিয়ে আমি হেঁটে যাই।'
এবং 'তবু আমি ভালবাসি উলঙ্গ শিশুটির হাসি, পুরনো পৃথিবী
নতুন হয়ে ওঠা আমার ক্ষুধার্ত চোখের সামনে সুন্দরী রমণীর হাড়ের কাঠামো
সময়ের ভেতর দিয়ে চিতার দিকে চলে যায়, আমি দর্শনের মোটা
বই বিক্রী করে কিনি রুটি ও মদ শুধু বেঁচে থাকার, এমন কি কখনো
লিখে ফেলি, বিশ্বাস করুন অনাবশ্যক কবিতা।'[৩৬]

এই কবিতার মধ্যেই কবি বেঁচে থাকতে চান। অদ্ভুত সেই বাসনা। কেননা তাঁর অন্য কোন বাসনা নেই আর। 'কবিতা বুলেট ঃ ১ - তে জানিয়েছেন, 'রক্তমাংসের শরীর আমার মরে

যাবে একদিন নিশ্চিত তবু শব্দের শরীরে থাকবে বেঁচে আমার চেতনা।' একই ধরণের কথা পাচ্ছি 'কবিতা হঠাও' — কবিতায়, 'আমি যেন আমার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকি, নারীর যৌনতা থেকে উৎসারিত সন্তানের মধ্যে নয়, কিন্তু শব্দের শরীরে থাকুক বেঁচে আমার চেতনা।' রক্তমাংসের শরীরে মধ্যেই মুক্তি ও মৃত্যু চেয়েছিলেন যে হাংরিরা, তাঁদেরই অন্যতম প্রতিনিধি ফাল্গুনী কবিতার মধ্যে আপন চেতনার যে অমরত্ব দাবী করছেন তা তাঁর স্বধর্মচ্যুতি কিনা জানিনা, কিন্তু সংবেদশীল একটি কবি আত্মার যে জয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন যে, প্রতিবাদ নয়, সামাজিক অসঙ্গতি নয়, কাব্যসাধনার তাড়নাই তাঁর জীবনের মূল শক্তি, নিয়ন্ত্রক। বলেছেন,

সকলের আনুগত্য অস্বীকার করেও আমি শেষ পর্যন্ত
নিজের আত্মার কাছে ক্রীতদাস থেকে যাচ্ছি
অথচ আমি মুক্তিপ্রার্থী মুক্তি উপায় বোধ হয়
কিছু লিখে যাওয়া, কিন্তু কিছুই লিখতে পারছি না
লিখতে পারছি না, লিখতে পারছি না আর
কুকুর ও বেশ্যার চীৎকার, হাসাহাসি হিজড়ের উপহাস
(কিছু লিখতে পারছি না)।

ফাল্গুনীর কবিতার উচ্ছৃঙ্খল দাপাদাপি, গালিগালাজ ও কটুতার পর এই স্বীকারোক্তি ও সহজ জীবনের কাছে আত্মসমর্পনে অন্য হাংরিদের থেকে আলাদা হয়ে উঠেছেন। তাই ফাল্গুনীর কাছেই আমরা পেতে পারি এরকম লাইন ঃ

হঠাৎ কান্না পায়
না ব্যর্থ প্রেম বা ক্ষুধার জন্য নয়
আমি মরে যাবো মরে যাবো এই চেতনায়
জীবনের গভীর থেকে উঠে আসে ক্রন্দনের স্বর
এতদিন বুঝিনি, আজ বুঝি বেশ ভাল ভাবে
জীবনকে বেসেছিলুম ভালো
দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের ভেতর
অসফল যৌনতাড়নার তীরে
সেই আত্মপ্রেমী ভালোবাসা

ছিল শুধু আলো হয়ে

মৃত্যুর উপত্যকার তীরে' (তিনটি কবিতা)।

ভালোবাসার এই মায়াময় আলো হয়ত ফাল্গুনীর কবিতায় তেমন দেখা যায়নি, হাংরিদের জীবনানুভূতি এবং কবিতায় তার বিপরীতমুখী প্রকাশ দেখে মনে হয় সচেতন ভাবেই তাঁরা যেন হৃদয়ধর্মকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই তাদের লেখায় ছড়ানো নানা অশালীন শব্দ, চেষ্টাকৃত ভাবে মানসিক সৌজন্য ভেঙে ফেলার প্রয়াস। ভালোবাসাকে ধ্বংস করে আত্মঘাতী ঘৃণার তাপ ও জ্বালা এভাবেই ফাল্গুনীর কবিতায় তীব্রতা পেয়েছিল। তবু তো শুরু করেছিলেন এ ভাবে ঃ

'অজস্র জাম ও জারুলের বৃষ্টি ধোয়া পাতায় ঝলমলে রোদ্দুর

আমি বৃক্ষাকাশময় হাত রেখে বলি

মাটির সোঁদা গন্ধে নিঃশ্বাস নিয়ে বলি আমি

নারীর জন্য এখনো প্রকৃত পুরুষ হতে পারি' (আকাশ ধোয়া বৃষ্টির পর)।

ফাল্গুনীর কবিতা পড়তে পড়তে সেখানে কবির আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখে বিষন্নতা জাগে। তিনি বলেছিলেন,

কালই বুঝি শেষ দিন

পৌঁছে যাবো শেষ জংশন শ্মশান চিতায়

অথচ অনেক কাজ বাকী

থিভ্‌স জর্নাল পড়া বাকী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমার কাঁচ দিয়ে পৃথিবী দেখা বাকী

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুকারী রং পাল্টানো ট্রামে বসা বাকী' (শেষ বিবৃতি)।

তবে ফাল্গুনীর কবিতায় ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ কোনো আবিলতা সৃষ্টি করেনি। তাঁর স্বীকারোক্তি বিবর্ণতা ও তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে কবিতা হয়ে উঠেছে।

(ঙ) সুবো আচার্য ঃ

সুবো আচার্য হাংরি আন্দোলনের প্রথম পর্বের একজন অন্যতম সংগঠক। এই ধারার কবিতায় তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁর জন্ম ১৯৩০ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মহারাজপুর গ্রামে। খুবই শিশুকালে, ছ'বছর বয়সে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৩ সালে হাংরি মামলা চলাকালীন ত্রিপুরায় গিয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা

করেন। পরে কলকাতায় হিন্দুস্তান কেবলসে কিছুকাল চাকুরি করেন। পরে ব্যাঙ্কের কর্মচারী। কবিতা রচনা পরিত্যাগ করে তিনি অনুকূল ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন। এখন 'সৎসঙ্গে'র ঋত্বিক, অন্যকে মন্ত্র দীক্ষিত করেন। তাঁর একমাত্র কবিতার বই 'সুবো আচার্যের কবিতা' এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর কবিতাগুলি ষাটের দশক থেকে শুরু করে আশির দশক পর্যন্ত রচিত হয়েছিল।

সুবো আচার্যের বিখ্যাত কবিতা 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৬৭ সালে 'জেব্রা' পত্রিকায়। আত্ম-অস্থিরতার উচ্চাবচতায় এবং বিস্ফোরণের লাভা শক্তিতে অসতর্ক পাঠক কবিতাটির মধ্যে মলয় রায়চৌধুরী প্রভাব খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। সুবো আচার্যের অনুভূতিলোক ও বক্তব্য প্রতিপাদন প্রণালী স্পষ্টতই আলাদা। মলয়ের লক্ষ্য মস্তিষ্কের দিকে, সুবোর হৃদয়ের দিকে। মলয় যন্ত্রনির্ভর, সুবো নিসর্গনির্ভর। মলয় বস্তুর বিরুদ্ধে কথা বলেও বস্তুতেই ফিরে যান। সুবো বস্তুতন্ত্র থেকে আধিবিদ্যক জগতে। বিষন্নতা, কোমলতা, আলো আঁধারির রহস্য মলয়ের মতো সুবোর কবিতা থেকে চলে যায় নি। উপরন্তু সেগুলো তাঁর কবিতার অন্যতম আকর্ষণ। সুবোর সমস্ত কবিতা সম্পর্কেই এ কথা সত্য। 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' কবিতায় সুবো বলেছেন,

আমি অস্তিত্বের ঝড় অন্যরকম পরাজয়ে রূপান্তরিত করে নিতে পারি কিনা
হোক না তা শিলীভূত, ঠান্ডা চুপ নিঃসঙ্গ, পাথর।'

বলেছেন,

প্রবল চেষ্টা করেছিলাম আমি শক্ত হয়ে, আমি শরীর কাঁপিয়ে
চীৎকার করেছিলাম, প্রতিবাদ, কিন্তু ভ্রষ্টতা
এমনই জিনিস, দারুণ শক্তিশালী বাতাসের ধার আমায়
এলোমেলো করে দিচ্ছে।[৩৬]

যে সুবো তীব্র স্বরে জানান, —

আমি সূর্যের আগুন খেয়ে ফেলেছি
আমি চাঁদের অন্ধকার খেয়ে ফেলেছি
আমি দুই বিশাল ব্যারেজ খেয়ে ফলেছি

তিনিই শেষে বলেছেন,

আয়না ভেঙে আগুন উড়ে আসছে আমার আত্মার দিকে আজ ভোরবেলায়
না আ আ আ আ আ আ আ আ আ

কিছুতেই আমার বেঁচে থাকা হল না পৃথিবীতে।[৩৭]

এই পরাজয় বরণ মলয়ের মধ্যে নেই। সুবোর মধ্যে আছে। আছে এই জন্যে যে, মলয়ের মতো তিনি শুধু বাইরের জগতের অসঙ্গতির মধ্যেই পরিভ্রমণ করেন নি। অন্তর্জগতের আলোড়নও ছিল তাঁর মধ্যে ঃ

'কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে বিষন্ন আমরা হেঁটেছিলাম একদিন, আমরা
গঙ্গার পাড়ে বসে আত্মার কথা বলেছিলাম, সত্য ঈশ্বরের
চেয়ে বড়ে অথবা সত্যই শেষ
ধূসর বিকেলে আমাদের মাথায় এই জ্ঞানের জন্ম হয় হৃদয়ে।'[৩৮]

'জেব্রা' ২য় সঙ্কলনে ১৯৬৭ সালে 'মড়ক' নামে গদ্যপ্রতিম কবিতাটি রচনা করেন সুবো আচার্য। এখানেও বাইশ বছর বয়সী আধুনিক এক যুবকের অস্তিত্বের বিপন্নতা পরিস্ফুট করা হয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক অসহায়তা, রাজনৈতিক বিতৃষ্ণা ও অন্তঃসারশূন্যতা, মানবিকতার বিলুপ্তি, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, নারী সম্পর্কে অনীহা কবিকে নৈরাশ্যকাতর করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, 'মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই অপবিত্র অস্তিত্বের ভার আমাকে বহন করতে হচ্ছে।'[৩৯] এই অস্তিত্বের স্বরূপ 'মড়ক' - এর শেষ লাইনটিতে এ রূপ ঃ 'বাবা মা আমি জন্ম চাইনি মৃত্যু চাইনি এসব কিছুই আমি চাইছি না, আমি জানি না জানি না জানি না জানি না আমি কিছু জানিনা।' পশ্চিমী অস্তিত্ববাদী দর্শনেরই যেন ভাষারূপ, হয়ে উঠেছে পংক্তিগুলি। ১৯৬৯ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় সুবো আচার্যের 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিবাদী সুবোর চেয়ে জীবনযন্ত্রণাকাতর সংবেদী এক কবিকেই বেশী পাওয়া যায়। জীবনের রহস্যবিধুরতা ও অনির্ণেয়তাকেই যেন দু'চোখ মেলে তিনি দেখছেন। তিনি বলেছেন,

কিম্ভূতকিমাকার জীবন নিরাকার রহস্যের মধ্যে
আমার নিঃসঙ্গ আত্মা বাঁধা পড়ে যায় আমার
ভালবাসা ও ঘৃণা ভেদ করে দৃষ্টি চলে যায়
আমি ক্রমশ শীতের মধ্যে খুব বেশী সিগ্রেট খাচ্ছি

আচমকা কখনও ' কি সুন্দর এই জীবন'
তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকার
মাথা কেঁপে উঠে নিচু হয়ে যায়।'
বলেছেন, 'চূড়ান্ত ঘৃণার পরেও

কিছু ভালবাসা অবশিষ্ট থেকে যায়' এবং 'ট্রেনের শব্দ দিগন্তের দিক ভেঙে দেয়

পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই আমার

হৃৎপিন্ডের শব্দ ছাড়া।'

সুবো এখানেও শেষ পর্যন্ত নিজের আত্মার কাছেই ফিরে এসেছেন। তাঁর 'হৃদয় অস্বাভাবিক অন্ধকারে ভরে গেছে।' অনেকটা জীবনান্দ দাশের 'বোধ' কবিতার মতো। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত শীর্ষক লেখাটিতেও সুবোর একই চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছে এই ভাবে

'স্বাভাবিক চেতনা বা জাগরণ মাঝে মাঝে ভেঙে যায়

অতি স্বাভাবিক নিশ্বাস ও রক্ত চলাচলের সময়েও

সহসা কি যেন এক বিস্ময় বুক থেক উঠে আসে

সেই বিস্ময় আমার জীবনের মধ্যে একাকী দাঁড় করিয়ে রাখে।'

এবং এ কোনো স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, দৈববাণী নয়

প্রেম ও স্বপ্নের চেয়ে অতীব অমোঘ

ঐশী থাপ্পড়ের মতো সহসা সমস্ত বাস্তব

গুমোট ভেদ করে ঝলসে ওঠে

আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যায়

আমি খুবই অন্ধকার ভেদ করি।'

সুবো আচার্য তাঁর কবিতায় এক আশ্চর্য অন্ধকার পৃথিবীর ছবি আঁকেন। অ্যাবসার্ড চিত্রকল্প একাত্মতা পেয়ে যায় অ্যাবসার্ড কবি ব্যক্তিত্বটির সঙ্গে। শুধু মানুষ নয় প্রকৃতিও অ্যাবসার্ড হয়ে ওঠে। যেমন, —

নিরুপায়, ধুন্দুমার আবহওয়া

'চারিদিকে, চরাচর ভরে যায় পর রাত্রির নিঃশব্দ চীৎকারে

মনুষ্য শরীর রূপ পায় কবন্ধের, কথা বলে দীর্ণ ভাষায়

পিশাচেরা পরেছে পোষাক, জন্মান্ধের হাতে দায়িত্বভার

অর্থনীতির, উড়ে যায় অচেনা বাতাস

মনে পড়ে অজানা নদীর কথা, চতুর্দিকে মূর্তি নয় সেতু ভাঙে' (গ্লানি)।

প্রকৃতি ও জীবনের নৈরাশ্য, নিরর্থকতা ও ভয়াবহতাকে সুবো যে ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেখানে জীবনানন্দের একটা বিশেষ পর্বের ছায়াপাত আছে। যেমন,

'রাতের সমুদ্র বড়ো স্তব্ধ শব্দে ভরে আছে
রাতের আকাশ ভরা কালো মেঘ জন্মমৃত্যুহীন
যে মানুষ জীবনের নেশা থেকে সরে এসে
এখানে দাঁড়ায় তার শরীর ভরে যায় রাতের সমুদ্রে' (রাতের সমুদ্রে)।

সুবোর কবিতায় যে চ্যালেঞ্জের ভাব তা মলয় বা ফাল্গুনীর মতো নয়। নানাবিধ বৈপরীত্যের সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়াতে চান না। বরং কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সেই বৈপরীত্যের রূপ ও তাৎপর্য অনুধাবণ করতে চান। বলেন,

'আমি নিজের বাইরে দাঁড়াতে চাই
দাঁড়িয়ে দেখতে চাই আগুন বাতাস জলের গূঢ় হাসাহাসি (শাতন)।
কিংবা
দেখি একাকীত্ব কতো মিঠে,কতোখানি তেতো আত্মগ্লানি
মধুময় পৃথিবীর মধুতে মিশেছে কোন বিষ
এসো, শুধু নরম বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাবে
দেখবে না হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া' (এসো দেখি)।

আরও ক'বছর পর সুবো আচার্য যেন বাস্তবতার কার্কশ্যকেও মানিয়ে নিয়েছেন। অন্তর্দ্বন্দ্বগুলির রহস্য অনেকখানি যেন উন্মোচন করতে পেরেছেন। 'তাঁর 'ভূয়োদর্শন' কবিতায় তিনটি মানুষের কথা আছে। একজন বাস্তবতার ঘূর্ণিতে তলিয়ে যায়, দ্বিতীয় জন গড্ডালিকা প্রবাহকে মেনে নেয়, তৃতীয়জন ,স্থিতপ্রজ্ঞের মতো একটু হেসে জীবনের সমান্তরাল হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই তাঁর কবিতার শেষ পর্বের সুবো আচার্য। তাই তিনি যে সভ্যতার বিরুদ্ধে আত্মবিস্ফোরণে প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনিই বলেন,

'সভ্যতাকে হাত নেড়ে চলে আসি
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মার কাছে সে যেন জলের অতল
নিম্নে আরও জল (আপাত স্তব্ধতায়)।[৪০]

ফলে অনেক নেই-এর পৃথিবী, প্রকৃতি, মানবসমাজের মাঝখানেও কবি সুস্থতার দিকে ফিরতে চান 'তবু সুবাতাসে ফিরে যেতে চাই, ফিরে যেতে চাই' (জীবন কাহিনী)। বলেন, —

আমি এই বহু বিস্তৃত সভ্যতা চিনি না
আমি এই ধুলোবালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া

মানুষকে দেখি আর তার কষের রক্ত দেখে আমার মনেহয়

আমি কবিতায় 'মানবতা' শব্দটি ব্যবহার করেছি (ছদ্মবেশী)।

আসলে, হাংরি কবিদের মধ্যে সুবো আচার্যকেই সবচেয়ে দ্রুত প্রচলিত মানবতাবাদের দিকে হেঁটে যেতে দেখি।

(চ) দেবী রায় ঃ

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সংগঠনের প্রথম পর্বে দেবী রায় উল্লেখযোগ্য ভাবে যুক্ত ছিলেন। হাংরি বুলেটিনে দু' একটি কবিতা লিখলেও, হাংরিদের মুখপত্র 'জ্রেব্রা' ২য় সংকলন ছাড়া, 'জেব্রা' (১ম সংকলন), 'ক্ষুধার্ত', 'ফুঃ' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর কোনো লেখা বেরোয়নি। আবার হাংরি উত্তেজনা স্থিতু হয়ে এলে সব রকমের প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁকে লিখতে দেখা গেছে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত দেবী রায়ের কবিতার বই এখন কোথাও পাওয়া যায় না। তবে তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা' সংকলনে কালানুবিক্রমিক ভাবে নিজের নানা বয়সের কবিতার একটি সংগ্রহ আমরা পেয়ে যাই। বিশেষ করে দেবী রায়ের 'আমি ও কলকাতা', 'মানুষ-মানুষ', 'ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে একা', 'উন্মাদ শহর' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি এখানে রয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় এই কবিতাগুলিকে হাংরি অভিধা দিয়েছেন।[৪১] এই কবিতাগুলিতে নগরজীবনের বর্ণনা ও নগরের সঙ্গে কবির সম্পর্কের অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে। খুবই ব্যক্তিগত স্তরের কবিতা। প্রেমের কবিতাও বটে। যেমন,

— ঘৃণার সান্নে তোমার থুতু, তোমার থুতুর সান্নে আমিই ঘৃণা
তোমার আমার দূরত্ব আজ মানা — হোক না অশ্রুজলে।[৪২]

কিংবা

স্কাইস্ক্র্যাপারের জানালা থেকে পথের দিকে চেয়ে আছে মানুষ
রাস্তায় দাঁড়িয়ে, রাস্তার খোঁজে এদিক সেদিক মানুষ।[৪৩]

দেবীর 'ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে, একা' কবিতায় প্রথমে একটি ক্রেনের বর্ণনা, তারপর ভীড় বাসের, তারপর হাইওয়ের, এরপরে পথের উপর মানুষের ছবি, শেষে করাতের আওয়াজ। বোধ হয়, তিনি বলতে চান যে যন্ত্রসভ্যতার ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। 'উন্মাদ শহর' কবিতায় কবির অবলোকন "উন্মাদ শহর, কারুর জন্য করুরই আর সময় নেই।" দেবী রায় কলকাতার নগরজীবনকে এভাবেই দেখেছেন। মেনেও নিয়েছেন নগরের যন্ত্রণাগুলো। প্রেম ও মানবতাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। স্বপ্ন দেখেছে ইতিবাচক পরিণতির

যেমন, — আমি অপমানের
গলা জড়ি যে
গেয়ে উঠি
বেঁচে ওঠার গান
অথবা
অন্তর বাহির সব বেবাক বন্ধ
নাকে এসে লাগে ভাতের গন্ধ ..... [৪৫]

দেবী রায়ের কবিতার মধ্যে কখনই কোনো তীব্র ক্ষোভ, অস্থিরতা, প্রতিবাদ দেখা যায় না। অত্যন্ত সংবেদনশীল নরম একজন মানুষকে পাওয়া যায়। কাজেই হাংরি আন্দোলনের সূচনাপর্বের একজন সদস্য হলেও প্রাণধর্মে দেবী রায় ও তাঁর কবিতাকে হাংরি জেনারেশন কাব্যধারায় যাচাই করা যাবে না।

(ছ) সমীর রায় চৌধুরী ঃ

দেবী রায়ের মতই সমীর রায় চৌধুরীও হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের শুধু কিছুটা জড়িয়ে ছিলেন। সম্ভবতঃ ছোট ভাই মলয় রায়চৌধুরী এবং বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি প্রীতিবশতঃ। নিষিদ্ধ হাংরি জেনারেশন, পত্রিকাটি ছাড়াও, দু' একটি বুলেটিনে তাঁর কিছু লেখা বেরায়। কিন্তু 'জেব্রা', ক্ষুর্ধাত', 'ফুঃ' 'এসব কোনো পত্রিকাতেই তিনি লেখেন নি। নিজেকে হাংরিও তিনি মনে করেন নি। 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের 'বয়ান' অংশটিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনায় এটা স্পষ্ট। আসলে, সমীর পঞ্চাশ দশকের কবি। মূলতঃ 'কৃত্তিবাসে'ই সে সময় তাঁর সাহিত্য চর্চা হয়েছে। তাঁকে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীরই বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে সমীর অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন — "কৃত্তিবাস হাংরি পোষ্ট মডার্ণ .... এগুলোকে জেনেছি একই উৎস থেকে রওনা দিয়ে অবলোকন ভঙ্গীর প্রসারণে। নিজস্ব বুঝের বিস্তারে। নিজস্ব দ্বন্দ্বের সমাধায়। .... যুক্ত থেকেছি বা প্ররোচকের ভূমিকায় থেকেছি এই ত্রিমাত্রিকে।"[৪৬] হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে সমীরকে একজন প্ররোচক বলা অসংগত নয়।

(জ) উৎপল কুমার বসু ঃ

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে উৎপল কুমার বসুরও কিছু অবদান আছে। কারণ, দু একটি বুলেটিনে তিনি লিখেছিলেন। তাছাড়া, 'জেব্রা' - ২য় সংকলনেও তিনি লিখেছেন। ঐ লেখাটি চিঠি হলেও শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পর্কে মূল্যায়ন আছে, হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। বলা দরকার, হাংরি জেনারেশন মকদ্দমায় জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর গার্লস কলেজের

অধ্যাপনার চাকরিটি চলে যায়। জীবিকার জন্য তিনি লণ্ডন চলে যান। চিঠিটি লণ্ডন থেকে ১০ই এপ্রিল ১৯৬৭ তে লিখিত হয়েছিল। তবে উৎপলের কবিতায় আঙ্গিক প্রধান। তাঁর কবিতায় আধুনিক জীবনের অসুখ, নাস্তিকতা, অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় প্রকাশিত। সেখানে কোনো অস্থিরতাও নেই। অশ্লীলতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

(ঝ) সুবিমল বসাক ঃ

সুবিমল বসাক ষাটএর দশকে গল্প রচনা করেই হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন। সত্তরের দশকে 'হাবিজাবি' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ বার হয়। সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঢাকার উপভাষায় মোট ৩০টি কবিতা। প্রত্যেকটি কবিতাই 'হাবি জাবি' শীর্ষনাম সংযুক্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে ব্যক্তির অস্থিরতার ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। খুবই বিবরণধর্মী কথাবার্তা রয়েছে, কোনও কাব্যময়তা নেই। তবে ক্রোধ আছে যা লক্ষণীয় ঃ

স্বাধীনতার কথা কইতে গিয়া, এক সভায়, হাতাহাতি
থিক্যা, মারপিঠ, মুখ কালাকালি হইয়া গেল কতজনের।[৪৭]

(ঞ) ত্রিদিব মিত্র ঃ

ত্রিদিব মিত্র 'জেব্রা' পত্রিকায় লিখতেন। দেবী রায় বা সুবিমল বসাকের চেয়ে তাঁর কবিতার উৎকর্ষ সহজেই চিনে নেওয়া যায়। 'গয়ের' কবিতায় তিনি লিখেছেন, —

তোমাদের ধূ ধূ সার্থকতার সামঞ্জস্য জানতে
অম্লান ছুটে গেছি শরীর নিয়ে শরীরের ভিতর
হাততালি দিয়ে বন্ধ করেছি রোমকূপের কর্ণবিদারী জলপ্রপাত
প্লুত রৌদ্রে বারবার চোখ মেলে দিয়
ওৎ-পাতা ধোঁয়া ও আবছা বিকেলের সূর্যোদয় রমণীর শরীরে
ঢুকে গেছি অনায়াসে ... [৪৮]

এখানে ব্যক্তির অপারশূন্যতা থেকে মুক্তি পেতে নারী শরীরে কবির আশ্রয় নেওয়া, নগর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এবং অনুভূতির নানা ইঙ্গিত অত্যন্ত কাব্যিকতা লাভ করেছে। আধুনিক সমাজ, জীবন এবং যান্ত্রিকতার সঙ্গে আধুনিক মানুষের টানাপোড়নটিও চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন ত্রিদিব, —

সমাজের ভুল চেতনা থেকে নিজেকে ঝুলিয়ে দিলাম শূন্যের বেতারে
টেলিফোনের মধ্য দিয়ে রোজ ৩ কোটি চুমু

এপার ওপার করছে পৃথিবীময়
রেলের মোটা তার বেয়ে উড়ে যাচ্ছে ৭ কোটি মাছি
আমার শরীরের চারদিকে অসংখ্য টোপ।[৪৯]

দুঃখের বিষয় ত্রিদিব পরবর্তীকালে আর বিশেষ কবিতা লেখেনি।

(ট) রবিউল হুসাইন ঃ

রবিউল হুসাইন 'ক্ষুধার্ত', 'স্বকাল', 'ফু' ইত্যাদি পত্রিকায় কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁকে একজন পরাবাস্তবাদী কবি বলা যায়। তবে শব্দ ব্যবহার ও কথন ভঙ্গীতে হাংরি বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। রবিউলকে একজন স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত শক্তিশালী কবি বলা যায়। তাঁর খুবই স্বল্প সংখ্যক কবিতা পাওয়া যায়। তাঁর কবিতার দুটি উদাহরণ কণা —

(ক) এই যে নিঃশ্বাস ফেলা এবং নেয়ার গাঢ় প্রচেষ্টা
ঘুমের ভিতর আর্তি

(খ) যেন কোন গ্রামের কোন মানুষের মুঠো ধরা ধানের বীজ
ছড়িয়ে আদিগন্ত শস্য ভূমি ঢেউয়ে দোলানো ধানের মাঠ
কিষান - বউয়ের ঢেঁকির পাড় থেকে গঞ্জের বস্তাবন্দী চালের
বাজার থেকে আবার বাড়ির রান্নাঘরে অগিন্নাত হয়ে
খাবার ঘরে এসে ধোঁয়ার পতাকা উড়িয়ে সেই সব চেনাজানা
পথ পেরিয়ে ..... লোহার পাইপ বরাবর নিরুদ্দেশ যাত্রা
অতঃপর।[৫১]

যতিচিহ্নহীন, আপাতঅন্বয়হীন শব্দ পরম্পরায় এভাবে রবিউলের বক্তব্যস্রোত পংক্তি থেকে পংক্তিতে বয়ে চলে।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, হাংরি কবিতার ধারাটি পর্যাপ্ত ফলবান ও বৈচিত্র্য পূর্ণ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায় চৌধুরী, অসীমাংসিত আবাস, শয়তানের মুখ / প্রকাশক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ ঃ ৯।

২. তদেব, (আমি), পৃঃ ১১।

৩. তদেব, (অধঃপতন), পৃ ঃ ১৫।

৪. তদেব, একিলিসের গোড়ালিতে নিক্ষিপ্ত তীরের প্রতি) পৃঃ ১২।

৫ তদেব, পৃ১ ১৩।

৬. তদেব, পৃঃ ১৪।

৭. মলয় রায় চৌধূরী, জখম (দ্বিতীয় প্রকাশ), কবিতীর্থ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১১।

৮. তদেব, পৃ ঃ ১২।

৯. তদেব, পৃ ঃ ২৫।

১০. তদেব, পৃ ঃ ১৩।

১১. তদেব, পৃ ঃ ১৬

১২. তদেব, পৃ ঃ ৩০।

১৩. মলয় রায়চৌধুরী, আমার অমীমাংসিত শুভা, প্রকাশক, কবি স্বয়ং, পাটনা, ১৩৭১, পৃঃ ৬।

১৪. মলয় রায়চৌধুরী, জখম, কবিতীর্থ, কলকাতা, ১৯৯৮ (২য় প্রকাশ), পৃঃ ১৬।

১৫. মলয় রায়চৌধুরী, আমার অমীমাংসিত শুভা, প্রকাশক, কবি স্বয়ং, পাটনা, ১৩৭১, পৃঃ ১১।

১৬. মলয় রায়চৌধুরী, আমার অমীমাংসিত শুভা, প্রকাশক, কবি স্বয়ং, পাটনা, ১৩৭১, পৃ ১০।

১৭. তদেব, পৃ ঃ ১৯।

১৮. তদেব, পৃ ঃ ১২।

১৯. শৈলেশ্বর ঘোষ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, (টার্মিনাস পার হতে গিয়ে), ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা পৃঃ ১।

২০. তদেব, (বৈদ্যুতিক ১৯৬৪), পৃঃ ৬।

২১. তদেব (প্রণতির জন্য রাস্তায়) পৃঃ ২৬।

২২. তদেব (আমার মুখ) পৃঃ ৪২।

২৩. তদেব, অপরাধীদের প্রতি, (অপরাধীদের প্রতি), ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ ১।

২৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, পূর্ণবাস, (অভিজ্ঞতা) ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪, কলকাতা, পৃঃ ৫২।

২৫. তদেব, (কালো বুদ্ধ), পৃঃ ৭৮।

২৬. তদেব (পথ) পৃঃ ৫২।

২৭. Arthur Rinband, Collected Poems, Penguin Books, Britain 1997, Page - 11.

২৮. প্রদীপ চৌধুরী, অন্যান্য তৎপরতা ও আমি। বিকল্প সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৩৪।

২৯. মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হাংরি লেখকদের কাছে প্রশ্ন ক্ষুধার্ত পত্রিকা, ১৩৭৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।

৩০. অমিতাভ দাশগুপ্ত, ক্ষুধার্ত ১ম সংকলন, ১৩৭৬ (ক্ষুধার্ত তরুণদে গদ্য বা তজ্জাতীয় কিছু) কলকাতা, পৃঃ চিহ্নিত নেই।

৩১. ফাল্গুনী রায়, আমার রাইফেল আমার বাইবেল / মনচাষা, আলিপুরদুয়ার, ২০০২, পৃঃ ৩১।

৩২. ফাল্গুনী রায়, (নষ্ট আত্মার টেলিভিশন আমার রাইফেল আমর বাইবেল, মনচাষা, আলিপুর দুয়ার, ২০০২, পৃঃ ১৮।

৩৩. ফাল্গুনী রায়, নির্বিকার চার্মিনার, আমার রাইফেল, আমার বাইবেল, আলিপুর দুয়ারে, ২০০২, পৃঃ ১২।

৩৪. ফাল্গুনী রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চশমা, আমি অপদার্থ, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃঃ ১,৮।

৩৫. তদেব, পৃঃ ৮।

৩৬. ফাল্গুনী রায়, অনাবশ্যক কবিতা, আমি অপদার্থ, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ১৯৯৬ পৃঃ ১৭।

৩৭. সুবো আচার্য, নিজস্ব বিস্ফোরণ, হাংরি জেনারশেন রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১০৬।

৩৮. তদেব পৃঃ ১০৭।

৩৯. সুবো আচার্য, মড়ক, জেব্রা পত্রিকা (২য় সংকলন), ১৩৭৪ পৃঃ ২৭।

৪০. সুবো আচার্য, আপাতস্তব্ধতায়, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, ৪র্থ সংকলন, কলকাতা ১৯৭৭ পৃঃ ২৬।

৪১. মলয় রায়চৌধুরী, জিজ্ঞাসা সংকলন, প্যাপিরাস, কলবকাতা, ১৯৯২ পৃঃ ৬৭।

৪২. দেবী রায়, আমি ও কলকাতা, নির্বাচিত কবিতা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ঃ ৩।

৪৩. তদেব, (মানুষ, মানুষ) পৃঃ ৬।

৪৪. তদেব (অপমান) পৃ ৩৭।

৪৫. তদেব (ভাতের গন্ধ) পৃঃ ৩০।

৪৬. সমীর রায়চৌধুরী, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ, কৃত্তিবাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৩১।

৪৭. সুবিমল বসাক, হাবিজাবি, জেব্রা বকুস, ১৯৭০, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া নেই, তবে অংশটি বইয়ের শেষ পাতায় রয়েছে।

৪৮. ত্রিদিব মিত্র, গয়ের, জেব্রা পত্রিকা (১ম সংকলন) কলকাতা ১৩৭২, পৃঃ ৩৭।

৪৯. ত্রিদিব মিত্র, হত্যাকাণ্ড, জেব্রা পত্রিকা (২য় সংকলন), কলকাতা, ১৩৭৪, পৃঃ ৯৬।

৫০. রবিউল হুসাইন, (ঘুমের ভিতর স্বপ্নের জুটমিল এবং তদীয় শ্রমিক সকল), হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৯৮।

৫১. তদেব (উষসীর প্রতিবেশে এক উর্বর সসেমিরা), পৃঃ ৪০৪।

বন্ধনী চিহ্নিত অংশে কবিতার নাম দেওয়া হল। কিছু কিছু বানানের ব্যাপারে কবিদের নিজস্বতা বজায় রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কথাসাহিত্য

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের কথা সাহিত্যের অংশটিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । হাংরি কথা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক তিনজন । এঁরা হলেন বাসুদেব দাশগুপ্ত , সুভাষ ঘোষ ও সুবিমল বসাক । তিন জনের লেখার বিষয় প্রকাশভঙ্গী ও ভাষা ব্যবহার তিনরকম । কিন্তু হাংরি প্রজন্মের কিছু সাধারন বৈশিষ্ট্য তিন জনের লেখাতেই উপস্থিত । এঁদের মধ্যে বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রবীন ও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত । প্রথমে তাঁকে নিয়েই আলোচনা করা হল ।

ক. বাসুদেব দাশগুপ্ত

বাসুদেব দাশগুপ্ত ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ সে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম ধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত , মাতার নাম সুরোবালা দাশগুপ্ত । বাবা প্রথম জীবনে জরিপ বিভাগের কানুনগো ছিলেন । পরে ব্যবসায় নামলেও ব্যাঙ্ক ফেল হবার জন্যে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন । ফলে , তৎকালীন ওরিয়েন্টাল জীবন বীমার এজেন্ট হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন । ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ হলে কলকাতায় চলে আসেন তিনি । ১৯৪৮ সালে তিনি পরলোকগত হন । বাসুদেব ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর হাইস্কুলে সরাসরি চতুর্থ শ্রেনীতে ভর্তি হয়েছিলেন । কলকাতায় এসে পার্কসার্কাসের লিংটন ষ্ট্রীটের 'এন্টালি একাডেমি'তে ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণীতে । সেখানে থেকে পরের বছর বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তখন ছিলেন মনীন্দ্র কুমার ঘোষ । ঐ সময় বাসুদেব রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক গান গাইতেন । গান গেয়ে পুরস্কারও জুটেছে । ১৯৫৪ সালে বাসুদেব স্কুল ফাইনাল পাস করেন । ১৯৫৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই - এস - সি পাশকরেন । রসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি .এস .সিতে ভর্তি হয়েও শেষে ড্রপ্ দেন । ১৯৬১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পরে তিনি বাংলা অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হন । কলেজে পড়ার সময় বাসুদেব district water company তে চাকুরি কড়তেন। ওদিকে যখন তিনি কলেজের ছাএ , সেই সময় পৃথবীশ শিকদারের সঙ্গে আলাপ ও বন্ধুত্ব ঘটে । কারণ তখন দুজনেই ছাএ ফেডারেশনের কর্মী ।

ঐ সময়ই পোস্টার 'একজিবিশান' করবার সময় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। বাসুদেব সে সময় কিছু ছবিও এঁকেছিলেন 'মৌচাক' পত্রিকায়। তাঁর ছবি ছাপানো হয়েছিল। কলেজে পড়বার সময়ই ১৯৫৯ সালে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে বাসুদেবের একটি গল্পটির প্রকাশিত হয়েছিল। বাসুদেবের সেই প্রথম গল্পটইর নাম ছিল 'চোরাবালি'। ১৯৬২ সালে তিনি একটি জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তখন মাসে বেতন পেতেন একশত টাকা। ১৯৬৪ সালে পানিত্রাস হাইস্কুলে ২১০ টাকার সহকারি শিক্ষকতার কাজ পান। ১৯৬৫ সালে হাবড়ার কল্যানগড় বিদ্যামন্দিরে স্থায়ী ভাবে শিক্ষকতার চাকুরি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করে।

বাসুদেবেরা পাঁচ ভাই, এক বোন। বড় দাদার নাম নির্মল দাশগুপ্ত, দিদির নাম - অনিমা দাশগুপ্ত (পরে সেনগুপ্ত)। তাঁর পরবর্তী দাদারা হলেন যথাক্রমে পরিমল দাশগুপ্ত, কমলেশ দাশগুপ্ত, চরন দাশগুপ্ত। বাসুদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৯৭০ সালে ইন্দিরা কুন্ডুর সঙ্গে বাসুদেব পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বাসুদেব ও ইন্দিরার দুটি সন্তান, ছেলে - আনন্দ দাশগুপ্ত, মেয়ে - অমৃতকণা দাশগুপ্ত।
১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের যোগসূত্রে বাসুদেব হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬২ সালেই 'উপদ্রুত' পত্রিকায় 'উৎপাত' নামে একটি নভেলেটের দুটি কিস্তি প্রকাশ করেন বাসুদেব। ১৯৬৩ সালে তাঁর বিখ্যাত 'রন্ধনশালা' গল্পটি বার হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে 'দেশ' পত্রিকায় 'রতনপুর' গল্পটি প্রকাশ লাভ করে। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে বিতর্কিত হাংরি জেনারেশন সংখ্যাটির উপর মামলা শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' শীর্ষক গল্পগ্রন্থটি উৎপল কুমার বসু প্রকাশ করেন। ১৯৬৫ সালে 'জেব্রা' পত্রিকায় 'রিপুতাড়িত' নামে একটি গল্প রচনা করেছিলন বাসুদেব। ১৯৬৭ সালের 'জেব্রা' পত্রিকায় 'অভিরামের চলাফেরা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালেই ক্ষুর্ধাত 'প্রতিরোধ' পত্রিকাতেই 'অভিরামের চলাফেরা' নামে আরেকটি গল্প তিনি লিখেছিলেন। ১৯৬৮ সালে কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের গল্প 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি 'লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে' নামে গল্পটি রচনা করেন। ১৯৭১ সালে 'ক্ষুর্ধার্ত' পত্রিকায় 'দেবতাদের কয়েক মিনিট' গল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালেই 'নিষাদ' পত্রিকায় 'আনন্দবাজার গোয়েন্দা আর্তনাদ রিপ রিপ' নামে আরও একটি গল্প বেরোয়।

১৯৭২ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় 'ডং ওয়াং এর গোপন সংকেত' গল্পটি মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় বাসুদেব দাশগুপ্ত লেখেন 'বাবা' নামে একটি গল্প। ১৯৮৬ সালে 'মৃত্যু গুহা থেকে প্রথম কিস্তি' ১৯৬৭ সালে 'মৃত্যুগুহা থেকে দ্বিতীয় কিস্তি' ও 'মৃত্যুগুহা থেকে 'তৃতীয় কিস্তি' গল্প তিনটি 'বিজ্ঞাপন পর্ব' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে 'বর্ণপরিচয়' পত্রিকায় 'বন্দী বাস্তবতা - আমার অলিখিত গদ্যের ছিন্নরূপ' নামে একটি অন্য ধরনের গল্পও বাসুদেব লিখেছিলেন। ১৯৮৭ সালে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় শেষ প্রহরের অভিযান গল্পটি প্রকাশ পায়। ১৯৯০ সালে 'এখন এই সময়' পত্রিকায় 'এসো' গল্পটি রচিত হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে 'এই সহস্রধারা' পত্রিকায় 'মৌন নগরীর ইতিকথা' এবং ১৯৯৬ সালে 'মৌননগরীর ইতিকথা' (২) গল্পটির রচনার মধ্যে দিয়ে বাসুদেব দাশগুপ্ত তাঁর লেখক জীবনের ইতি ঘটিয়ে দেন। তবে মাঝখানে ১৯৮৩ সালে বাসুদেবের 'রন্ধনশালা' গল্পগ্রন্থটির একটি সংকলন বরে হয়। এতে প্রথম সংস্করনের চারটি গল্প ব্যতীত নতুন একটি গল্প সংযুক্ত করা হয়। পুরোনো চারটি গল্প হল - 'রন্ধনশালা', 'রতনপুর', 'বমনরহস্য', 'বসন্ত উৎসব'। নতুন গল্পটি হল - 'দূরবীন'। এগুলির মধ্যে 'বমন রহস্য', 'বসন্ত উৎসব' এবং 'দূরবীন' কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। সরাসরি গল্প গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাসুদেবের অন্যান্য গল্পগুলো এখনও সংকলিত হয় নি। নানা পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এখনও সেগুলি ছড়িয়ে রয়েছে।

সাধারণভাবে বাসুদেব দাশগুপ্তের গল্পগুলিতে দুটি স্তর লক্ষ করা যায়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একটি স্তর এবং ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অন্য একটি স্তর। প্রথম স্তরের গল্পে বাসুদেব মানুষের ব্যক্তি সাল পর্যন্ত অন্য একটি স্তর। প্রথম স্তরের গল্পের বাসুদেব মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে প্রাধান্য দেয়েছেন। ঐ ব্যক্তিটি আবার এক নির্বিশেষ ব্যক্তি। দ্বিতীয় স্তরে সমাজ ও রাজনীতির প্রাধান্য দেখা গেছে। সেখানে একটি বিশেষ যুগ ও দেশ কালের পটভূমি প্রাধান্য লাভ করেছে। লেখকের একটি রাজনৈতিক দর্শনও স্পষ্টতা পেয়েছে।

বাসুদেবের প্রথম গল্প 'রন্ধনশালায়' হাংরি জেনারেশনের অনেকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। গল্পটির শুরু একটা ভেড়ার বাচ্চাকে খপ করে ধরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার বৃত্তান্ত দিয়ে। দুই ক্ষুধার্ত বন্ধু তাকে রান্নাও করে ফেলেন।

তবে শেষ পর্যন্ত সেই মাংস না খেয়ে তারা ভেড়ার বাতিল নাড়িভুঁড়ি, শিং, চামড়া ইত্যাদি খেতে শুরু করেন। লেখক বলেন,

> কত দিনের যেন কত রাতের যেন কত বছরের বুঝি হাজার বছরের ক্ষিধেয় শুন দিতে থাকি।১

শৈলেশ্বর ঘোষ গল্পটির সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,-

> ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ক্ষুধা এই ভাবে তৃপ্তি খুঁজছে। সর্বগ্রাসী এই ক্ষুধা ভারতবর্ষের আত্মার প্রতিটি কোষে আজ বিরাজ করছে। 'বাসুদেবের রন্ধনশালা' গল্পে সেই সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ লেখা এক কথায় আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শক্তির সেই হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাবে ক্ষুধা সম্পর্কে অতি সীমিত যে ধারণা দেওয়া হয়েছিল বাসুদেব এই লেখায় তাকে সুদূরপ্রসারী করেন দেন।২

লক্ষণীয়, 'রন্ধনশালা' গল্পে সর্ব অস্তিত্বগ্রাসী ক্ষুধা ব্যাপারটি কী? অস্তিত্ব বলতেই বা এখানে কী বোঝানো হয়েছে ? এখানে ছোট গল্প সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরীর একটি ধারণাও প্রাসঙ্গিক -

> আজকের ঠুনকো জীবনের আচ্ছন্ন সক্রিয় অরাজকতার স্ফটিক হয়ে উঠবে ছোটগল্প; দৃষ্টির অতীত যে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বাসঘাতী অথচ সম্ভাবনা পূর্ন উদ্ভাস তার এলোমেলো খাবল; এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা অস্তিত্বের আঘাত নেবার জন্যে নিজেদের ক্ষত তুলে ধরেছেন।৩

গল্পটিতে দুটি চরিত্র -কথক এবং রবীন। সম্পর্কে তারা পরস্পরের বন্ধু। তাদের দুজনের মধ্যেই একধরনের উৎকেন্দ্রকিতা আছে। কঠোরতা আছে। তারা দুভাবেই অনিকেত। মানব সমাজের থেকে বহুদূরে এক শীতল, ভয়ংকর আরণ্যক পরিবেশে এসে পড়েছেন তারা।

এ ছাড়া এ গল্পে একটা আতঙ্কের পরিবেশও আছে। বিকট চেহারাওয়ালা পাখির কান্নার প্রক্ষেপনে। সমবেত অচেনা মানুষের আক্রমণে, উত্তরসূরীদের নিরন্নতার সম্ভাবনায় তা প্রকট। এর যেমন একটা আর্থ সামাজিক দিক আছে, তেমনই ব্যক্তির নিরাশ্রয়তার দিকও। তাই এ গল্পকে যেমন জীবনানন্দ দাশের ১৯৪৬-৪৭ সাল কবিতার কিয়দংশের সঙ্গে মেলানো যায়, তেমনি মিলিয়ে নেওয়া যায় অস্তিত্ববাদের সঙ্গেও।

১৯৬৩ সালে বাসুদেবের 'বমনরহস্য' গল্পটি রচিত হয়। বন্ধু সুকুমারের বিবাহ-উৎসব গল্পের পটভূমি। বিয়েবাড়ির সামাজিকতা লৌকিকতা ও সৌন্দর্যকে প্রথম থেকেই লেখক আঘাত করে চলেছেন। লক্ষ্য করার যে সুকুমারের বাড়ির লোকেরা, সুকুমারের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এবং সুকুমারের বন্ধুরা - সবাই অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। বিয়ে, সামাজিকতা - এগুলিকে লেখক ভড়ং হিসাবে দেখিয়েছেন। বিয়ে বাড়িতে যখন বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত অবস্থা সেই মুহূর্তে একটি উদ্ভট ঘটনার অবতারনা করেন গল্পকার। পাড়ার ময়রার দোকানে সুকুমারের শ্বশুর মশাই রাজীববাবু ও বাবা মাতাল হয়ে ঢুকে পড়েন। তেল ভর্ত্তি লোহার কড়াইয়ে সুকুমারের বাবা মনোদুঃখে লাফ দেন। আনমনা কারিগর তাকে হাতা দিয়ে উল্টোপাল্টা ভাজতে থাকে। ফলে তার দেহ ফেটে গিয়ে কড়াই উপচে জলস্রোত হয়ে নীচে পড়তে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসে পুলিশ। সুকুমারের বন্ধু (কথক নিজে) ভয়ে ছুটতে থাকেন। ছুটতে ছুটতে তিনি পৌঁছে যান একটি চারতলা বাড়িতে। সেখানে গানের আসর বসেছে - যেন বাইজি বাড়ি। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হয় তিনি একটি মাংসের বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে খাসি, পাঁঠা, গরু, মোষ, শুয়োর, হরিণ, হাতি প্রভৃতি জন্তুর ছাল ছড়ানো বীভৎস দেহ গুলো ঝুলছে। শুধু তাই নয় মানুষের মাংসও পাওয়া যাচ্ছে। সাইনবোর্ডে লেখা আছে - এই খানে হৈমন্তীর মাংস পাওয়া যায়, এই খানে সুকুমারের মাংস পাওয়া যায়। এই খানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়। হৈমন্তী হচ্ছেন সুকুমারের বৈমাত্রেয় বোন, আর চম্পা হচ্ছেন তার শ্যালিকা। লেখক জানান,

> দড়িতে ঝুলতে থাকা ছাল ছড়ানো মানুষ গুলো এই বার আঙ্গুল দিয়ে চোখের উপর দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত মুছে নেয়। জিভ বার করে নিজেদের শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত চেটে খায়। তারপর সকলে এক যোগে আমার দিকে তাকিয়ে খলখল হেসে ওঠে।৫

কথক আর সইতে পারেন না। তাঁর শরীরের সব নালী প্রনালী পাক দিয়ে ওঠে। সব আলো পর্যবসিত হয় অন্ধকারে। শেষে মাংসহাটার রক্তাক্ত পথকর্দমে তিনি বমি করতে থাকেন। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো, সমস্ত জীবনভর ধরে খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগড়ে বার করতে থাকি।

'রন্ধনশালা' গল্পে যেন কিছুটা বিষন্নতারও পরিবেশ ছিল। কিন্তু 'বমনরহস্য' গল্পে বিদ্রূপে ও ঘৃণার প্রকাশ তীব্র হয়ে উঠেছে। জীবনভর খেয়ে যাওয়া মাংস মানে এতদিনকার অর্জিত সংস্কার ও শিক্ষাদীক্ষার কথাই যেন লেখক বলতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন সামাজিক ঐতিহ্য গুলির অন্তঃসারশূন্যতার কথা।প্রেম তো বটেই যৌনতাকেও বাসুদেব কটাক্ষ করেছেন এখানে। গল্পটি প্রসঙ্গে অমিতাভ দাশগুপ্ত লিখেছেন,-

> বড় দীর্ঘকালে বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে যুগ থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু ইনুনি বিনুনি ধ্যাষ্টামো বানানো উপর চালাকি ভ্যাজ ভ্যাজ সুখ, ধাপ্পাবাজ গৃহী মানুষের আচরণবাদে থিক থিক করছে তার দুর্গন্ধে টিকতে না পেরে বাসুদেব পয়লা চোট বমনরহস্য"গল্পে বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের উপর.....।"৬

বাসুদেবের 'রতনপুর' গল্পটিকে তাঁর গল্পধারায় আলাদা রূপে চিহ্নিত করা যায়। কারণ বাল্য প্রেমিকের জন্যে হাহাকার ও রোমান্টিক আত্ম-অবলুপ্তি বাসুদেবকে একটি ফ্যানটাসী রচনায় এখানে উৎসাহিত করেছে। মহানগরীর কফি হাউসে রতনপুর গ্রাম, নায়কের প্রেমিকা চুমকি, রুমকি ইত্যাদি সব কিছু সহ উঠে এসে এখানে একটি অ্যাবসার্ড জগৎ রচনা করেছে। রতনপুরের অপরিচিত তরুণদের হাতে নায়কের প্রহত হবার ঘটনাটিকে এখানে অবশ্যই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু চুমকি তাঁকে বাঁচানোর জন্য জল ছিটিয়ে ছোট করে চুলের মধ্যে গুঁজে রাখে। তখন নায়ক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ। আমাদের উপনিষদে অঙ্গুষ্ঠ প্রমান আত্মার কথা আছে। তবে নায়ক নায়িকার আত্মা নয়। বরং নায়িকাই নায়কের আত্মা স্বরূপে। আবার অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলাও' আছে। কফি হাউস থেকে বেরুনোর সময় হুড়োহুড়িতে চুমকির চুল থেকে ক্ষুদ্রাকার নায়ক গড়িয়ে পড়েন। চুমকিরা বুঝতে পারেন না। গাড়ি করে চলে যান। ফলে, পরিত্যক্ত হতে হয় নায়ককে। রতনপুর চুমকি সবই অধরা থেকে যায় তাঁর কাছে। প্রেম - সৌন্দর্য স্মৃতি একটি বিলুপ্ত দ্বীপের মত পড়ে থাকে।

'বসন্ত উৎসব' বাসুদেব দাশগুপ্তের চতুর্থ গল্প। এ কালের যুগ মনের বিকার ও অসুস্থতার একটি ভয়াবহ চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। আবার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ রোম্যান্টিকতার দিকে অভিযাত্রাও রয়েছে। মণিকার প্রেমিকা দুই-জন, কথক ও তাঁর বন্ধু শঙ্কর। মনিকাকে নিয়ে একটি দুঃস্বপ্ন দেখার পর কথক তাঁকে খুন করেন। কথক অসুস্থ ও শারীরক ভাবে অক্ষম হলেও আসঙ্গলিপ্সু। তাই মণিকা গায়ে হতে বুলিয়ে তাকে সান্তনা দেন। এতে লেখক গলে যেতে শুরু করলে মণিকা তাঁকে গামলায় বসিয়ে দেন। তিনি সম্পূর্ণ গলে গেলে মণিকা তাকে হাঁ করে রাক্ষসীর মতো চুমুক দিয়ে খেতে আসেন। আতঙ্কিত লেখক চেঁচিয়ে ওঠেন ভয়ে। ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙার পর ঐ সাত সকালেই মণিকার বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়েন। সেখানে মণিকাকে গলা টিপে হত্যা করেন। হত্যার আগে তাদের মিলনও ঘটে। লেখক মণিকার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে মণিকাকে লেখা তার বন্ধু শঙ্করের প্রেমপত্র আবিষ্কার করেন। মণিকার বাড়ি থেকে লেখক শঙ্করের বাড়িতে চলে যান। লোহার রড দিয়ে সুযোগমতো শঙ্করকেও হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু হত্যা করতে পারেন না শঙ্করের কুকুর টমের জন্যে। তার ঘেউ ঘেউ চীৎকারের জন্য। শঙ্কর তখন দাড়ি কামানোয় ব্যস্ত। শঙ্করের বাড়ি থেকে লেখক যখন বেরোন তখন কিছুটা বেলা হয়েছে। কমলালেবুর মতো রোদ ছাড়িয়ে পড়েছে। একদল যুবক, একদল শিশুর সাথে দেখা হয়। ওদের সাথেই এগোতে এগোতে লেখক পৌঁছে যায় একটি মেলায়। বাচ্চাদের সঙ্গে লেখকের নাগরদোলা ঘুরতে ঘুরতে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। সেখান থেকে দূরে দেখা যায় একটি হ্রদ। হ্রদের ভিতর সাদা পাল তোলা নৌকা ভেসে বেড়ায়। নৌকা গুলিতে ফুলের গয়না পরা অসংখ্য তরুনী। হ্রদের চারপাশে বড় বড় গাছ - তারই একটির নীচে ঘাসের উপর রুমাল পেতে বসে পড়েন লেখক। রুমালে রক্তের শুকনো কালো দাগ। তার দিকে নৌকা গুলো এগিয়ে আসে - যাদের একটি থেকে এক তরুনী - নীলুদা বলে ডাকে তাকে। সে হচ্ছে অমলের বোন আরতি। অন্য নৌকাগুলো থেকেও তরুণী, ফুল কুমারীরা যেন তাকে ডাকতে থাকে এসো, তুমি আমাদের নৌকায় এসো, আরতির নৌকা ক্রমশ ঃএগিয়ে আসে।৭

এই গল্পে, সৌন্দর্যের প্রতি গল্পকারের আর্কষণ প্রাধান্য পেয়েছে। সুস্থ রোম্যান্টিক আদর্শের প্রতি স্পষ্ট হয়েছে পক্ষপাত। তাই মণিকার ক্ষুধার্ত ব্যাদান ও ব্যাভিচারকে সহ্য করা হয় নি। অসুন্দরকে হত্যা করা হয়েছে তাই। ফুলকুমারীর, আরতি যেন বাসুদেবের ক্রিষ্টাবেলা বা রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ যাত্রার সেই চালিকা। রোম্যান্টিকতার অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্যাভিসারে গল্পের পরিণতি। বাসুদেব দাশগুপ্তের পঞ্চম গল্প 'দূরবীন'

জীবন ও জগতের মানুষের আসল রূপটি ? যা প্রতীয়মান তাই না কি, আপাত প্রতীয়মানতার আড়ালে তার অন্য কোনো মূর্তি ? এই প্রশ্নই এ গল্পে তোলা হয়েছে। শৈলেশ্বর ঘোষ তাঁর ইস্তাহারে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁদের লক্ষ হল ৭(খ) অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে লুকানো যা কিছু - যা ক্রমাগত মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। মুখোশের দিকে নিয়ে যায় তাকে প্রকাশ করা।

'দূরবীন' গল্পটই যেন হাংরিদের এই তত্ত্বেরই রূপায়ন। এ গল্পের অমল এক আশ্চর্য স্বভাবের মানুষ। বাস্তবতা নয়। কল্পনার জগতে তিনি বাস করেন। কল্পনাকেই তিনি সত্য মনে করেন, বাস্তবতাকে মায়া। মাসতুতো বোন তপতীর প্রতি তার নিষিদ্ধ প্রেম। এদিকে বন্ধু শোভনের বাড়ির প্রাচীন সিন্দুক থেকে একটা অদ্ভুত দূরবীন মেলে। সেটা চোখে লাগালে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হয়। সামনের বস্তুজগৎ পাল্টে অন্য জগতে রূপান্তিরত হয়। বন্ধুর কাছ থেকে সেটা অমল নিজের বাড়িতে এক সপ্তাহের জন্যে নিয়ে এসে চারপাশের অদ্ভুত কীর্তিকলাপ দেখতে থাকেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। দূরবীন তাকে যা দেখায় তা তিনি মেনে নিতে পারেন না। চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে তার কৌতূহল কিন্তু বেড়েই চলে। ক্রমে দূরবীন ছাড়াই তিনি মানুষকে নজর করতে থাকেন। তার এই উঁকিঝুঁকি মারা সাধারণ প্রতিবেশীরা মেনে নিতে পারেন না। একদিন দেখা যায় ঐ সব লোকজন সবাই মিলে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। এবার তপতী দূরবীনটা দিয়ে জ্বলন্ত অমলকে লক্ষ্য করেন। অমল যেন একটা বিকটাকার দৈত্য, মাথায় দুটো শিং, ঠোঁটে গজদন্ত, শরীর ধূসর লোমে আবৃত। এরপর তপতী দূরবীনটা নামিয়ে রেখে ঐ আগুনের মধ্যে অমলকে জড়িয়ে ধরেন। দুজনে পুড়ে যেতে থাকেন। 'দূরবীন' আসলে দেখবার ভঙ্গী-দূর থেকে, কাছ থেকে, সোজা করে, উল্টো করে। দূরবীনই এখানে বোঝায় যে, মানুষকে যে রকম দেখায়, প্রকৃতই সে রকম নয়। আবার এ গল্পে অবসেসনের মুক্তির ব্যাপারটিও আছে যা - থেকে হাংরি কবি লেখকরা মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। মাসতুতো বোনের সঙ্গে প্রেমের জ্বলন্ত আগুনে অমলের পুড়ে যাওয়া তাই এখানে স্বাভাবিক। দূরবীন যন্ত্রটিও যেন অমল, বা তপতীকে অবসেসন থেকে মুক্তিই দিতে চায়।

লেখকের ষষ্ঠগল্প 'রিপুতাড়িত'। যৌনতার তীব্র আর্তি দিয়ে গল্পের শুরু হয়েছে। সুন্দরী সুগায়িকা তরলাকে লেখকের প্রয়োজন তা যে ভাবেই হোক। অবশেষে বেলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি পান রেঁস্তোরা, সিনেমা হল প্রভৃতি জায়গায়। তাকে নিজের ঘরেও যেতে রাজী করেন।

এমনি সময়ে তীব্র প্রস্রাবের বেগ আসে। তরলাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নগরীর গলি পথে তিনি ছুটতে থাকেন। কোথাও প্রস্রাব করার জায়গা পান না। অনেক ক্ষণ বাদে একটা পার্কে পৌঁছে যান - সেখানে ঝোপের পাশে এক যুবক ও যুবতী প্রেমলীলায় মত্ত। ঐ ঝোপেরই এক পাশে দাঁড়িয়ে লেখক প্রস্রাব সেড়ে নেন। প্রেমিকটি নিশ্চিন্ত এই ভেবে যে, লোকটা পেচ্ছাব করছে বলবে না কিছু। লেখক নিশ্চিন্ত - ওরা প্রেম করছে। বলবে না কিছু। প্রেম ও প্রস্রাবের এ এক আশ্চর্য সমাপতন। দেবেশ রায় লিখেছিলেন,-

> গল্পটা নিহিত আছে কেমন করে একটি প্রেমের গল্প পেচ্ছাবের গল্প হয়ে ওঠে - এই স্তর পরম্পরায় যেটা বাসুদেব লাফিয়ে পার হন। ৮

লক্ষণীয় যে, যৌনতাকে প্রস্রাবের পাশে রেখে তাকে একটি তুচ্ছ প্রাকৃতিক কর্ম হিসাবেই লেখক বর্ণনা করেন। এমনকি প্রস্রাবের চেয়েও গৌনতা দেন তাকে। এতদিন ধরে বাংলা গল্পে প্রেমের যে শোভনরূপটি ছিল তাকে এখানে সচেতন ভাবে ধ্বংশ করা হয়েছে। সে দিক থেকে প্রেম, সৌন্দর্য, আবেগ এগুলির আর কোনো গুরুত্ব রইল না। দেবেশ রায় স্তরপরম্পরা বলতে ঐ ব্যাপারগুলিকেই হয়তো ইঙ্গিত করেছেন। হাংরিদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনন্দনে এই গল্পটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

'বাসুদেবের 'অভিরামের চলাফেরা' গল্পটি এক আধুনিক তরুণের মানসিক বিচ্ছিন্নতার কাহিনী। তবে সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তার মানসিক আদান প্রদান আছে। বিষাদ বিরাগ, ঘৃণা নয়। ভয়-ই অভিরামকে তাড়া করেছে। তবে মফঃস্বলের প্রকৃত চরিত্রটিকে স্পর্শ করে। তবু চরিত্রটি কেন বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতার শিকার তা এখানে স্পষ্ট করা হয় নি। একই নামে বা এই গল্পটির একটি দ্বিতীয় পর্বও আছে। একটি চরিত্র ও থিম সেখানে পুনারাবৃত্ত। আলাদা করে কোনো বিশিষ্টতা এই গল্প দুটিতে পাওয়া যায় না।

'লেনিব্রুস ও গোপাল ভাঁড়'কে গল্পে বস্তিজীবনের কদর্যতাকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। বিহারী দেহাতী জীবনের নিচু তলার ছবি পাঠকের কাছে অসহনীয় ঠেকে।

ঘাঁটাল, গোবরের দলা, লক্ষ মাছির ভনভনানির মধ্যে কালো মোটা বউয়ের সঙ্গে হরকিষানের উন্মুক্ত কুৎসিত রতিক্রীড়াটির ছবিটি মধ্যবিত্ত ভদ্রবাবু রুচি বোধকে আঘাত করবার জন্যেই। কয়েকটি মধ্যবিত্ত চরিত্রও আছে এখানে। আছে ১৩নং রামলাল আগরওয়াল লেনের নিষিদ্ধ পল্লী। গল্পটি প্রসঙ্গে দেবেশ রায় বলেছেন,-

> প্রথম অধ্যায়টি শেষ হয়েছে হরকিষান আর তার ধুমসী বৌয়ের রতিক্রিয়ায়, দ্বিতীয়টি পায়খানায়, তৃতীয়টি বাত কর্মে ..... শেষ অংশ গুলিতে এসে আমরা চমকে চমকে উঠে আবিষ্কার করি আসলে রতিক্রিয়া, মলত্যাগ, বাতকর্ম ইত্যাদি শারীরিক ঘটনাই যেন আমাদের মানবিক মনসিক সম্পর্কগুলির নিয়ন্তা। মন নিয়ে ছিচকাঁদুনির বিরুদ্ধে এটাই বাসুদেবের অস্ত্র। ৯

হাংরিরা মধ্যবিত্তের সীমানা যে অন্ত্যজ জীবনের অন্ধকারে দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, সমস্ত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে ভেঙ্গে ফেলার কথা বলেছিলেন; এই গল্পে তারই যেন কিছুটা প্রয়াস। মলয় রায় চৌধুরী লিখেছিলেন: —

> আমি চাই আমার লেখাকে রুক্ষ, কাঁচা খসখসে, অকাব্যিক, কুৎসিত, অশোভন, অভদ্র আর নিদানিক করে তুলতে। ১০

এই সংকল্প যেন বাসুদেবের গল্পে অনেকখানি প্রতিপাদন করা হল।

হাংরি জেনারেশন প্রজন্মের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হিসাবে বাসুদেবের 'দেবতাদের কয়েকমিনিট'কে চিহ্নিত করা যায়। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার প্রথম সংকলনের এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১,২,৩ এভাবে ক্রমান্বয়ে ২৫টি মিনিটে গল্পটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গল্পটির উপস্থাপনা, বর্ননা, চরিত্রচিত্রণ, বক্তব্য প্রক্ষেপণ - সবই খুব এলোমেলো। এই অবিন্যস্ততার মধ্যে দিয়ে এবং চরিত্র গুলির আচরণের মধ্য দিয়ে জীবনের শৃঙ্খলাহীনতার ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। ছয় বন্ধু মিলে বেশ্যাদের কোঠাবাড়িতে উপনীত। ছজনেই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, চালচুলোহীন যৌন বুভুক্ষু তরুণ। সব কিছুতেই তাদের ঘৃণা। লাম্পট্য নয় - যৌন কদর্যতা এখানে প্রধান। লেখক যৌনতাকে আক্রমণ করেছেন এখানে। গনিকাদের নাম এখানে ছবি নীলা, বাণী। আবার একই নারীর নাম এখানে পাল্টে যায় অন্যের নামে। যেমন ছবি হয়ে যায় নীলা, নীলা হয়ে যায় বাণী, বাণী হয়ে যায় ছবি-এ রকম।

লেখকের মতে, একই নারীর নানা নাম, নানা রূপ। যৌনতাকে একটি উপকরণ ও পন্য হিসাবেই যেন গণ্য করতে চান লেখক। আবার উন্মার্গগামী যুবকদের দেবতা নামে অভিহিত করে দেবতাদের হীন করা বা ব্যঙ্গ করাও লেখকের উদ্দেশ্য।

বাসুদেবের'আনন্দবাজার, গোয়েন্দা আর্তনাদ - রিপ - রিপ' একটি রাজনৈতিক গল্প। টুকরো টুকরো বক্তব্য, বর্ণনা, শ্লোগান, ছড়া, কবিতা, গান, রিপোর্টিং জবানবন্দী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি জুড়ে কোলাজের ভঙ্গীতে গল্পটি রচিত। কেউ কেউ বলেছেন যে মৃনাল সেনের কলকাতা ৭১ সিনেমার সঙ্গে গল্পটির সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির সঙ্গে এটির সুর ও স্বর এক নয়।

এক বছর পরে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত'ডং ওয়াং এর গোপন 'সংকেত' গল্পে ও রাজনীতির কথা আছে। সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের অতি-বাম রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। 'দেবতাদের কয়েক মিনিট 'গল্পে কতিপয় যুবকের যৌন বিক্ষোভ বিবৃত হয়েছিল; এ গল্পে রাষ্ট্র ও সমাজের সার্বিক নৈরাজ্যকে বাসুদেব চিহ্নিত করেছেন। ডং ওয়াং একজন ডিক্টেটর যার হাত থেকে কারুরই নিস্তার নেই। সৌন্দর্য, ঐতিহ্য, প্রেম, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনায়ক রাজনীতি সব কিছুই যেন সন্ত্রাসবাদী। যারা গল্পে সন্ত্রাসের আবহাওয়া সর্বাঙ্গীন এক নায়কতান্ত্রিকতার কবল থেকে মানব সমাজের বার হয়ে আসবার যে আর কোনো পথ নেই - লেখক সে কথাই এখানে বলেছেন। মানব সমাজের ধ্বংশাত্বক পরিণামগামিতাও এখানে সাংকেতিত । বাসুদেবের বাবা গল্পটি একদিক থেকে 'রিপুতাড়িত' গল্পের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। যেহেতু বাবা চরিত্রটিও 'রিপুতাড়িত' গল্পের নায়কে মতই যৌনতা অর্জন করতে প্রতিবন্ধকতা পাচ্ছেন। কারণ এ গল্পের নায়ক পরিতোষ ও তার স্ত্রীর মাঝখানে আড়াই বছরের ছেলে পাবলোর উপস্থিতি রয়েছে। স্ত্রী সহবাসের অভাবে পরিতোষের দুর্দশা নিয়ে যেমন ঠাট্টা রয়েছে, তেমনই দুর্ঘটনার পড়েও পাবলোর পুরুষাঙ্গ চোট না পাওয়ার তির্যকতায় গল্পকারের উদ্দ্যেশতমূলকতা স্পষ্ট হয়েছে । যে যৌনতাকে নিয়ে হাংরিরা তাঁদের ইস্তাহার কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ - সর্বত্র উচ্চকিত। তাকে এ গল্পের ফোকাস পয়েন্ট করা হয়েছে। তাছাড়া মা - মাসিমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক আক্ষেপ শুনে পরিতোষের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,-

> এই সব ভদ্রলোকের ভাষা, কাঁচা খিস্তি নয় - যা কিনা আসলে এক ভন্ডামীর ভাষা। শুনতে শুনতে পরিতোষের আবার বেশ্যাদের কথা মনে পড়ে যায়।

যৌন আকর্ষণ ছাড়াও আর কি যেন তাদের - কি যেন ? হ্যাঁ, ভালো সাজার কোনো চেষ্টা বেশ্যাদের নেই। ১১

ভাষা সম্পর্কে পরিতোষের এই ধারণা মলয় ও শৈলেশ্বরের মতাদর্শেরই সমার্থক ।

এরপর দশ বছর বাসুদেব কোনো গল্প রচনা করেন নি। ১৯৮৬ সালে 'বিজ্ঞাপন পর্ব' পত্রিকায় 'মৃত্যুগুহা থেকে প্রথম কিস্তি'গল্প দিয়ে নতুন করে,নতুন ভাবনায় গল্প লেখার জগতে ফিরে এসেছেন। রাজনৈতিক চেতনাকে অর্থাৎ বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের আলোয় জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন বাসুদেব। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার,অবক্ষয় ও বিপদ সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করেছেন। এই গল্পগুলির নাম ও প্রকাশ কাল আমরা এ আলোচনার শুরুতেই করেছি। কিন্তু গল্পগুলির আলোচনা জরুরী মনে করিনা এই জন্য যে, হাংরি আন্দোলন ও ভাবনার সঙ্গে এদের তেমন কোনো সংযোগ নেই।

বাসুদেব দাশগুপ্তের উপন্যাস 'খেলাধুলা' সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। তবু লেখাটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। কারণ হাংরি লেখকদের আর কোনো উপন্যাস নেই। আসলে - হাংরি লেখকদের বিজ্ঞাপিত উপন্যাস বলতে বাসুদেব দাশগুপ্তের 'খেলাধুলা'কেই বোঝায়। বিজ্ঞাপিত বলছি এ কারণে যে, উপন্যাস নামে ছাপানো হলেও এটির মধ্যে উপন্যাসের গুণ কম। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দন্দশূক' পত্রিকায় ১০২ পৃষ্ঠার এই লেখাটি বেরোয় সেপ্টেমবর ১৯৮৯ সালে। এখানে মূল চরিত্র পরিতোষ। তাকে বাসুদেবের গল্পে আমরা আগেই দেখেছি। তার স্ত্রী পদ্ম, পুত্র পাবলো। একটি কন্যাও আছে। এছাড়াও পার্শ্বচরিত্র আছে অনেক। যথা বিমল, নিবারনবাবু, কমল, বিপুল, প্রিয়ব্রত, শরদিন্দুবাবু, বাদল, প্রকাশ, লালমোহন বাবু ইত্যাদি। এরা সবাই টাইপ চরিত্র। এমনকি পরিতোষও। বিভিন্ন মত, গোষ্ঠীর এরা বাহক। অধিকাংশই ইস্কুল শিক্ষক। চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের গ্রন্থিবন্ধন নেই। চরিত্রগুলির কারুর মধ্যেই কোনো সজীবতা চোখে পড়েনা। এখানে কোনো কাহিনীও নেই। কারুর জীবনেই এমন কোনো ঘটেনা যা নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ দিতে পারে। আসলে চরিত্রগুলো গৌন। তাদের কোনো জীবন গৌরব নেই। পরিতোষ এই লেখায় সূত্রধারের ভূমিকায়। সময়ের সুত্রধার বা সময়ের একজন কথক। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ সামাজিক জীবনে যে একটা গড্ডল-প্রবাহ, ধান্দাবাজী ও তত্ত্বের মোড়কে কায়েমী স্বার্থের খেলা চলছে .

তারই একটি স্পষ্ট ছবি আঁকা হয়েছে। সময়ই এ উপন্যাসের চরিত্র। সময়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এই লেখাটির উপজীব্য। মধ্যবিত্ত পরিতোষ কিছুটা সামাজিক দায় থেকে বামপন্থী হবার চেষ্টা করেছিলেন। তার গনসঙ্গীতের দল গড়া রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ, রাজনৈতিক কলাম লেখা, শ্রমিক ও নিঃস্ব মজুর ও বস্তিবাসীদের নিয়ে গবেষণা ও তাদের সঙ্গে একজন হওয়ার চেষ্টা কোনোটাই সার্থকতা পায় নি। কারন ক্ষমতাসীন কম্যুনিষ্ট পার্টি দুটি তাকে সহযোগিতা করেনি। তাকে প্রতিবিপ্লবী ও অতিবিপ্লবী ভেবেছে। কঠোর ও শীতল আচরণ দিয়ে সর্তক করে দিয়েছ তাকে। পরিতোষ নিজেও কোনো তাত্ত্বিক সমাধান দিতে পারেননি। সমাজতন্ত্রের ও গণতন্ত্রের যে সমন্বয় অবৈজ্ঞানিক, শুধু আমেরিকা নয়, রাশিয়াও যে আমাদের দেশের প্রগতির জন্য অর্থহীন এটা পরিতোষ বুঝেছেন। কংগ্রেস ও সি পি এম যে একই পয়সার দুই পিঠ, বামফ্রন্ট যে মার্কসবাদের মুখোশ রিলিফ দেবার পার্টি এ সব বিতর্ক এখানে প্রবল ভাবেই আছে। আমলাতন্ত্র, পাতিবুর্জোয়া মধ্যবিত্তের কর্মবিমুখতা ও সুবিধাবাদ খেলাধূলার অন্যতম বিষয়। মধ্যবিত্ত পরিতোষও পশ্চিমবঙ্গের এই সামাজিক বাস্তবতায় শুধু পথ পায়নি বললে কম বলা হয়। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সেজন্যই হয়তো বা রচনাটি শেষ হয়েছে ফেলিনির লা স্ত্রাদা 'সিনেমার একটি দৃশ্যানুষঙ্গ দিয়ে। সেখানে সঙ্গী মেয়েটি বলে: We need more woods, the fire is dying. সেখানে নায়ক এ্যান্থনি কুইন মেয়েটিকে ফেলে পালিয়ে যায়। কারণ তার সম্বল কতটুকু ? রচনাটি শুরু করার আগে লেখক বলেছিলেন চিরন্তন গতিধর্ম সম্পন্ন বস্তুই যে সৃষ্টির প্রকৃত উৎস এটা বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন। কিন্তু বস্তুর আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব থেকেই যে গতি ও পরিবর্তন আসে এ তত্ত্ব তিনি আজও উপলব্ধি করতে পারেননি। লেখকও এই আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব থেকে পরিণতির সেই কাঙ্খিত ইশারা দেননি। বলেছেন, সেই স্তরে আমরা এখনও পৌছতে পারিনি। এবং না পারার সেই ট্রাপিজিই খেলাধূলার তত্ত্ব-বিশ্ব। বাসুদেবের নিজের ভাষায়,-

> কিন্তু বিরোধ ও সংঘাতের প্রতিটি স্তরকে বুঝে, তার সমাধান করে করে, ঐক্য ও সমন্বয়ের পথে এগোতে না পারা পর্যন্ত মূলপ্রবাহের সঙ্গে নিজকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। ততদিন আমাদের কেবলই মান-অভিমান, হাসিখেলা আর ... । অর্থাৎ খেলাধুলা ১২

বস্তুত বাসুদেবের 'খেলাধুলা' নামক রচনাটিতে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির একটি রেখাঙ্কণ মাত্র। লক্ষণীয় যে, সি.পি.এম., সি. পি. আই নকশাল সমস্ত মার্কসবাদী দলগুলির অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ, দুরাচার ও ব্যর্থতাকে খুব সংক্ষেপে লেখক এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে লেখকের পক্ষপাত যে শ্রেণী সংগ্রামের দিকেই তা স্পষ্ট। উপস্থাপনার দিক থেকে খেলাধূলা ব্যক্তিগত দিন লিপির মতো। আত্মজীবনীর মতো। কাহিনী নেই - পরিতোষের সঙ্গে তার পরিবার ও পরিপার্শ্বের মানুষজনের সম্পর্কের ছবি আছে কিছু। এই সম্পর্কগুলো খুবই সমতল স্বভাবের। কোনো দ্বন্দ বা সংঘাত নেই। প্রটাগনিষ্ট পরিতোষের মধ্যে যে প্রতিবাদী কণ্ঠ, কখনও বা মেনে নেওয়া, কিংবা ছেড়ে দেওয়া - সব কিছুর মধ্যে একটা অসম্পৃক্তি, উদাসীনতাও আছে । তবু যে পরিতোষ সব কিছু তে জড়িয়ে পড়েন তার কারণ জীবন সম্পর্কে তাঁর মায়া, আগ্রহ, কৌতূহল । জীবনটা যেন পরিতোষের কাছে একটা খেলাধূলা।

এই রচনাটির একটি অন্য গুরুত্ব আছে। বাসুদেব দাশগুপ্তের প্রৌঢ় জীবনের সঙ্গে পরিতোষের জীবনচর্যার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এখানে যে মফঃস্বল অঞ্চলটির প্রকৃতি ও মানুষজন-তার সঙ্গে বাসুদেবের বাসস্থান অশোকনগরের কোনো পার্থক্য নেই । পরিতোষের পেশা, চলাফেরা, কথাবার্তা সবই যেন ব্যক্তি বাসুদেবের জীবন থেকেই তুলে নেওয়া । বাসুদেব দাশগুপ্তের জীবনের একটি বিশেষ পর্বের ইতিহাস ও মানসিকতা জানতে 'খেলাধূলা' অপরিহার্য । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে এইখানে 'খেলাধূলা'র পরোক্ষ সম্পর্ক ।

খ . সুভাষ ঘোষ

হাংরি গদ্যকারদের মধ্যে সুভাষ ঘোষ অন্যতম। তাঁর জন্ম বাংলাদের বগুড়া জেলায়। পঞ্চাশের দশকে তিনি এদেশে চলে আসেন। ষাটের দশকে শৈলেশ্বর ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। টালা ট্যাঙ্ক এলাকায় ১৬বি শ্যামচরন মুখার্জী স্ট্রীটে একই ঘরে শৈলেশ্বরের সঙ্গে তিনি ভাড়া থাকতেন। সেখানে থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু। গ্রেপ্তার হন সেখানে থেকেই পরবর্তী কালে সুভাষের উদ্বাস্তু জীবনের অবসান ঘটে। কলেজ অব সেরামিক টেকনোলজিতে লাইব্রেরিয়ান হিসাবে কাজ পান।

সেখানে কেমিষ্ট এর চাকুরি করেন। তাঁর স্ত্রী কনক ঘোষও সাহিত্যচর্চা করেছেন। নব্বই-এর দশকে সুভাষ ঘোষের মৃত্যু হয়। সুভাষ আমার তৃতীয় ফ্রন্ট (১৯৬৭), অ্যামবুশ (১৯৮৩) নেশাকলোনী (১৯৮৭), গোপলের নয়নতারা (১৯৯৩), শীর্ষ অভিযান (১৯৯৭) প্রভৃতি।

সুভাষ ঘোষের প্রথম গল্প গ্রন্থ 'আমার চাবি' ১৯৬৫ সালে ক্ষুধার্ত প্রকাশনী থেকে বার হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩তে প্রকাশ করেন দন্দশূক প্রকাশনী। এই গ্রন্থে মোট ছটি গল্প অন্তর্ভুক্ত। যথা, হাঁসেদের প্রতি, খালাসী টোলার ৩ নম্বর, নৈশ টেলিগ্রাম, ব্যান্ড ডায়েরির পাতা, রেড রোড এবং ২৯ ধারা ও আমার রক্তের পরিণতি। সুভাষ ঘোষের নিঃসঙ্গতা এই প্রথম গ্রন্থেই ধরা পড়ে। তাঁর গল্পের মধ্যে কোনো কাহিনী থাকে না। অনেক সময় থাকে না চরিত্র। তিনি শুধুই বক্তব্য প্রধান। এ বক্তব্যও আবার বিবরণধর্মী নয়। ইঙ্গিত প্রধান। সমগ্র গল্পটি জুড়ে একটি ইঙ্গিতকেই বিস্তৃত করেন সুভাষ তাঁর ছন্নছাড়া বাক্যে। কিন্তু বাক্যগুলি দিয়ে চিত্রের একটি পরম্পরা তিনি তুলে ধরেন বলে লেখকের জীবন সম্পর্কে একটা ধারণার প্রতিভাস পাঠক চিত্তে আদল পায়। ছোটগল্প তো জীবনের কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে একটি প্রতীতির প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছু নয়। এভাবে ভাবলেই সুভাষের লেখাগুলো গল্প। কাহিনী বা ঘটনারসের দিক থেকে নয়। না হলে এগুলিকে কবিতা ও ইস্তাহারের মিশ্রণই বলতে হতো। যাই হোক, তাঁর প্রথম গল্প 'হাঁসেদের প্রতি'তে একটিই চিত্রপট লক্ষণীয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে লেখক কলকাতার রাস্তার বার হয়েছেন। কী দেখেন ? -না, চারিদিকে থৈ থৈ করা হাঁস। হাঁসেদের পাখা, পালক, পালকের সাদা বিস্তারে রাস্তাঘাট, ফুটপাত, গাড়ি বা রান্দা, ট্রামলাইন ছেয়ে যায়। ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি হয়ে হাঁস গুলি পদ্ম খায়, ছেঁড়ে; ছেঁড়ে ও খায় তারা পরস্পরের গায়েও ছুঁড়ে মারে সেই সব ফুল। এর পরে লেখক নীল শিশি বার করে প্রতিটি হাঁসের গায়ে ফ্লুইড ছিটিয়ে দেন। হাঁসগুলি শুধু বশ নয়, সম্মোহিত হয়। তাদের পুরো নিয়ন্ত্রণ এসে যায় লেখকের হাতে। তাদের যথেচ্ছ মাতাল করার পরে লেখকের কেবলই মনে হতে থাকে কত উপায়ে কত বেশি সংখ্যক উপায়ে তাদের থেকে কত ডিম, কত বেশি সংখ্যক ডিম পদ্মদীঘি থেকে টেনে বার করে দেবেন। সমগ্র গল্পে এই যে উদ্ভট একটি ছবি লেখক এঁকেছেন তার মধ্যে অনেক বিমুর্ততা সত্ত্বেও বলা যায় যে, এখানে সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ নয়, উপযোগিতার বাস্তবতাই গ্রাহ্য হয়েছে। সৌন্দর্যের প্রতি নির্স্পৃহতা এমক কি কঠোরতা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রতীকার্থে ঐ হাঁসগুলিকে সুন্দরী নারীরূপেও ভাবা যেতে পারে। তাদের জলকেলি নাগরিক যৌনতার নির্বিকার উদ্দামতার অর্থবোধক। সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে সিনিক।

দ্বিতীয় গল্প 'খালাসী টোলার ৩ নম্বর'-এ এক অসুস্থ ও অস্থির যুবকের মনোলোক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। খালাসী টোলার ৩ নম্বর হচ্ছে একটা বিশেষ বাংলা মদের বোতল। সেটি যুবকটি বাড়িতে এনে রেখেছে। বাড়িতে সে একা। কোনও ব্যাপারে মন বসাতে পারছে না। প্রথমে সে 'নাইট মেয়ার' নামে তাসের একটি বিশেষ খেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে চেষ্টা করে খবরের কাগজ পড়তে পারে না। এর পরে সেই ৩ নম্বর বোতল নিট পান করে। তারপরে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে চেহারায় এবং চেতনায়। সেই মাতাল উন্মত্ত তরুণেরই চেতনার বিস্তার এই গল্পে। এই চেতনা আসলে ভয়ের চেতনা। ঐতিহ্যের প্রতি ভয়। ইতিহাসের প্রতি ভয়, রাষ্ট্রকে ভয়, আইনকে ভয়। নিরাপত্তাহীনতাবোধের আতঙ্ক এবং ভয় মৃত্যুর। গল্পের শেষে যুবকটি বহু সংখ্যক দলবদ্ধ শকুনকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছে। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। শকুনের অবাধ দৈর্ঘ্য গলা বিস্তার করে তার মাথা মুখ হাত পা গলা পাকড়ে ধরে। সে সাদা পিরিচ থেকে খসে পড়ে।

তৃতীয় গল্প 'নৈশটেলিগ্রাম '- এ নিজেই যেন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া। সব অপারগতার শেষে মৃত্যু একমাত্র পরিণতি। গল্পের প্রথম অংশে দেখি এক যুবক কোথাও যেতে পারছে না। ট্রেন, ট্রাম, বাস কিছুই তাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে না। অথচ তাকে নীরার কাছে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু এত দেরী হয়ে যায় হয়তো নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে নীরা চলেই যাবে। নির্দিষ্ট স্থান হল মনুমেন্টের পাদদেশ। সেখানে পৌঁছে যুবকটি নীরাকে খুঁজে পায় না। উপরন্তু সেখানে ব্যাজ পরা স্বেচ্ছাসেবকদের ভীড়। নীরাকে পাওয়া যায় না। গল্পের দ্বিতীয় অংশে ভীড়ের মাথায় একটি নীল রুমাল উড়তে দেখা যায়। তখন সেটিকেই ধরতে চায় যুবক। এতে এক সময় ভীড়ের চাপে সে পদদলিতও হয়। নীরাকে সে পায় নি। কিছু একটা পেতেই হবে; অন্তত একটা নীল রুমাল। কিন্তু হঠাৎ বিস্ফোরণ। জনতার হৈ হৈ , কলরোল মহিলা সমাবেশ হারিয়ে যায়। মাউন্ট পুলিশেরা চাবুক হতে ছুটে আসে। নীরা এই ডাক পিছনে রেখে সে ছুটতে থাকে। রাত বাড়ে, উপরে নীল তরল আকাশ। হঠাৎ যেন চাঁদ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়। তার একটি অংশ নীচে নেমে আসতে থাকে। সে ধরতে যায়, পারে না। হাত বাড়ালেই উঠে যায় থালার মত চন্দ্রাংশ। সে লাফায়। চাঁদও লাফায়। হাত নামালে চাঁদও নেমে আসে। কখনওবা হাত পিছলে যায়। তার সঙ্গে দ্বৈরথ চলে। তারপর ইঁদারার গভীর কলো গর্ভে চাঁদ নেমে যায়। যুবকটিও হাত ইঁদারার দিকে বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়ে। 'ব্যান্ড ডায়েরির পাতা' গল্পে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের জটিলতায় এক ব্যক্তি মানুষের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রেশন কার্ডের জন্য ফুড ও সাপ্লাই অফিসে গল্পের মূল চরিত্রটি ঘুরে মরছে। নির্ধারিত সার্টিফিকেট ও কাগজ পত্র কিছুতেই সে যোগাড় করতে পারছে না। তার কৈফিয়ৎ ও যুক্তি কেউই শুনছে না। আবার দালালকেও সে টাকা দিয়েছে - যে তাকে নানা সার্টিফিকেট করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিন্তু ঐ দালালের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রাত বাড়ে। সেখানে দমকলের গাড়িও ঘুরে যায়। যদিও কোথাও আগুন লাগে নি। সম্ভবত কেউ মিথ্যে ফোন করেছিল। ঐ দালালটি অবশ্য আসে না আর। বরং একসময় Protected প্লেসে থাকার জন্যে যুবকটিকে হাতকড়া পরানো হয়। এই গল্পে রাষ্ট্রযন্ত্রের যান্ত্রিকতা, প্রশাসনিক অন্ধতার প্রতি বিদ্রূপ যেমন আছে, তেমনই ব্যক্তিসত্তার অসহায়তা ও আতঙ্কের ছবিও প্রস্ফুটিত। কাফকার গল্পের অনুষঙ্গ এখানে মনে এসে যায়।

'২৯ ধারা ও আমার রক্তের পরিণতি' গল্পটিও আধুনিক নগর সভ্যতায় একজন সামাজিক মানুষের কোণঠাসা হবার বৃত্তান্ত। গল্পের একমাত্র চরিত্রটি দক্ষিণ কলকাতার রাস্তাগুলোকে চিনতে চেষ্টা করেছে, বাস ট্রাম জানতে চেষ্টা করেছে। দক্ষিণের অঞ্চল, গ্রন্থাগার, মেরিন হাউস এমনকি আলোর রহস্য জানতে চেষ্টা করেছে যুবকটি। জানতে অবশ্য সে পারে না, বরং একদিন তার সম্পর্কেই নানান জ্ঞাতব্য জানতে চাওয়া হয়। এভাবেই নগর জড়িয়ে ফেলে তাকে। লেখকের প্রতীকী ভাষায় বলা যায়'চারপাশে ধক ধক করে তীক্ষ্ম লাল হানাদার আলো।' ১৩

'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট 'সুভাষের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'জেব্রা' পত্রিকার ২য় সংকলনে ১৩৭৮ সালে গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায়। লেখক এটিকে ডায়েরি বলেছেন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৬'র জানুয়ারী পর্যন্ত এটির সময়সীমা বিধৃত। গল্পটির আকারও বেশ বড়। একটিই চরিত্রই কথা বলেছে ১৬টি পরিচ্ছেদে। আত্মকথক পরিকল্পিতভাবেই একা। কোনো সংঘের অন্তর্ভুক্ত হতে নারাজ সে। নারী শরীরের প্রতি লোলুপতা, মাদকাসক্তি, লাম্পট্য সবই চরিত্রটির স্বাভাবিক বৃত্তি। তথাপি নানা ধরনের জিজ্ঞাসা তার মগজকে কুরে কুরে খায়। রাষ্ট্রে, সমাজে, সংসারে তার স্থান কোথায় তা সে খুঁজে পায় না। তাই শুধু ঘুরে বেড়ায় আর আতঙ্কে ভোগে, আতঙ্ক থেকে আক্রমণ করে। নতুবা যুবকটির এত আক্রমণাত্মক হবার কারণ নেই কোনো। কী যে সে চায় তা একেবারেই স্পষ্ট সে করতে পারে নি এত দীর্ঘ একটি ডায়েরিতে। সহজ ভাবে বলা যায়, একধরনের হীনম্মন্যতাবোধ থেকে চরিত্রটি সৃষ্ট।

এ ধরনের উদ্বাস্তু দারিদ্র্য থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজের চাকচিক্যকে না পাবার ঈর্ষায় তার এই অস্থিরতা। লেখকের ভাষায়,-

> কৃতকার্যতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজও ঠিক কালের মতই - ভয় ও বিঘ্ন, যারা মণ মণ ওজনের শেকল দিয়ে আমার পা কালও বেঁধেছিল আজও তারা একই রকম কাজে, কেন আমি ভালোবাসার দিকে গোঁ গোঁ করে এগিয়ে যেতে পারি না - কি সেই মধ্যবিত্ত থামপোষ্টগুলি করুণা, ইরা, অরুণা বা নীলার সঙ্গে - তাবৎ মানুষের সঙ্গে যখন নিজেকে জড়াতে যাই মৃত্যু হঠাৎ-ই ঝণাৎ বেজে ওঠে ঠিক মাঝখানে ... আজ একবার কখন যেন সেই পুরনো ভয় - যৌনরোগ, ক্যানসার - সিরোসিস ইত্যাদির ঘূর্ণির ভিতরে আমি। ১৪

আক্রমণাত্মক যুবকের যখন মৃত্যুভীতি জেগে ওঠে আক্রমণাত্মক তীব্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার যখন যুবকটি বলে,-

> এখন যুদ্ধ, এখন জরুরী শুধুই জনগণমন ...। এখন কিছুদিন অষ্টারিটি পালন করুন, ব্যবহার সংযত করুন কিছুদিন আপনারা ১৫

তখন তাকে খুবই রাষ্ট্রসচেতন বলে ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' গল্পে উদ্দেশ্যহীন এক যুবকের অস্থিরতা, অস্থিরতার বেদনা ও বিদ্রোহ নৈরাজ্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। একারণে দীর্ঘ দিনাতিপাতের মত গদ্য ভাষাও এখানে দীর্ঘায়িত, পূর্ণ যতি চিহ্নহীন - শুধু কথার তোড় - যে তোড়ে শুধু বক্তব্যের ঘূর্ণি। উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনের মতই কেবল উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা।

সুভাষ ঘোষের তৃতীয় গ্রন্থ 'অ্যামবুশ' গল্পের বই নয়। আক্রমণের একটি ইস্তাহার সংকলন। ৯টি ইস্তাহার আছে এখানে। প্রথম ইস্তাহারের নাম অভিযান।

যুদ্ধের জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। শ্রেণীমুক্ত সমাজের ডাক দেওয়া হয়েছে। বুর্জোয়াদের আক্রমণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তালি লাগাও, ঈশ্বর পাটনী, ১ কোটি, ১০ কোটি টিবি ভিত্তি, বাবা নাম কেবলম, টেলিলিংক হারপুন, দ্য এ্যামবুশ ও লিফট এই আটটি ক্ষুদ্রাকার ইস্তাহারে ছন্নছাড়া লেখকের হালটি ফুটে উঠেছে। 'দ্য এ্যামবুশ' বাদে বাকি প্রত্যেকটি রচনায় এই বুর্জোয়া সভ্যতার নিন্দা করা হলেও, যৌনতার প্রতি লেখকের সঘৃণ টান লক্ষ করা যায়। 'দ্য এ্যামবুশ' গদ্যটিতে ভারতের চীনযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের দেশ প্রেম ইত্যাদির বিরোধিতা করা হয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলন, মতি নন্দী প্রভৃতি ব্যক্তি ও বিষয়কে আক্রমণ করা হয়েছে। লেখক ঘোষণা করেছেন যে, বৈঠকী গল্পের দিন শেষ। এই গ্রন্থের গদ্যগুলি ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের নানা সময়ে লেখা। লেখকের অস্থির মনের কিছু মুর্হূত ও দৃষ্টিভঙ্গীর অব্যবস্থিত দৃশ্যায়ন ছাড়া অন্য গুরুত্ব নেই এগুলির। সুভাষের পরবর্তী বই 'নেশা কলোনী' ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। মোট তিনটি গদ্য এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটির নাম 'নেশা কলোনী'-১৯ পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত। নেশা কলোনী একটি প্রতীক। যেখানে পৌঁছে গল্পের তরুণটি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন। এখন পর্যন্ত তরুণটি এক সম্পূর্ণ অধিকৃত মানুষ।১৬ক. সভ্যতার মলিকুলর সিসটেমস ১৬খ. আখ্যানটির সূচনাংশে এই রকম একটি গঠনই চোখে পড়ে। কিন্তু আখ্যানের শেষে পৌঁছে দেখি তরুণটি কোথাও পৌঁছায় নি। কারন, মাতাল, পাগল, বা উদ্বাস্তুর প্রস্থান বা মহাপ্রস্থান নাই।১৬গ.

শুধু আছে নেশা ঘোরের পরিবর্তন :

> আসলে, এক মাতাল কখনই একই ছবি ও কথামালার কাছে কখনই ফিরে যায় না। এক পাগল একই ছবি ও কথামালার কাছে কখনই ফিরে যায় না। এক উদ্বাস্তু একই ছবি ও কথামালার কাছে কখনই ফিরে যায় না।১৭

সুতরাং শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পাগল, মাতাল ও উদ্বাস্তুর নেশার ডেরা ছাড়া কিছু আর পাইনা আমরা। গল্পটি নেশাগ্রস্তদের একটি আখ্যান হয়ে ওঠে মাত্র। এই বইয়ের দ্বিতীয় রচনাটির নাম ব্যাক্তিগত 'ম্যানিফেস্টো'।এখানে মধ্যবিত্ত মানুষকে সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে মধ্যবিত্তকে লেখক বলেছেন ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ।

সচ্ছল জীবনের প্রাচুর্য ও আয়েশে সুবিধাবাদী জীবন কাটাবার পরও মধ্যবিত্তের তৃষ্ণা কখনই মেটে না। একটার পর একটা অনিশ্চয়তাও তাকে তাড়া করে। তখন সে কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে। লেখকের কাছে মধ্যবিত্তটি যখন আশ্রয় চেয়েছে তখন তিনি হাত ছাড়িয়ে নিয়েছেন। চলে গেছেন নেশার খোঁজে। পরবর্তী দুটি অনু গদ্যে লেখক কোনো স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারেন নি।

'গোপালের নয়নতারা'সুভাষ ঘোষের সবচেয়ে সুবোধ্য গ্রন্থ। ১৯৯৩ সালে এটি প্রকাশ পায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এর গোপালকে একটি প্রতীক চরিত্র রূপে গ্রহন করে তাকে নবরূপে নির্মাণ করেছেন লেখক। গোপাল সুবোধ বালক। কম বয়সে যখন সে পরীক্ষার পড়া পড়ছে তখনই মায়ের মৃত্যু ঘটে। তারা অত্যন্ত দরিদ্র, আত্মীয় পরিজনহীন। পাড়ার ছেলেরাই চাঁদা তুলে তার মার শ্মশানক্রিয়া সম্পাদন করে, মদ্য পানও করে, গোপালের মুখেও ঢেলে দেয়। এরপর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে গোপালের জীবনযুদ্ধ, বড় হওয়া শুরু হয়। কলকাতার ফুটপাত, ডক অঞ্চল, পুলিশ সবকিছুর সঙ্গেই সে পরিচিত হয়। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নেই। সে কিছু বলে না। সে কিছু ভাবে না। সে কিছু বোঝে না। সে সুবোধ বালক, ভালো মানুষ। তাকে কিছু বলতে, করতে নেই, ভাবতে নেই। অবশ্য একদিন পুলিশ সন্দেহবশে তাকে হাতকড়া পড়ায় কয়েদী করে। গোপাল নির্বিবাদে তাও মেনে নেয়। একদিক থেকে গোপালের মধ্যে নির্বিরোধ সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি। তাদের অসহায়তার প্রতিচ্ছবি। পরিস্থিতিকে সাধারণ মানুষ কতটুকুই বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গোপালও পারে নি। শুধু মেনে নিতে হয়। অথচ মানবিক অনুভুতিগুলি আর্ত হয়ে ওঠে। মাথা কুটে মরে। এই অনুভূতিরাজীর চিত্রমালা গ্রন্থটিতে আদ্যোপান্ত বিরাজিত। সুভাষের গল্পে যেমন আক্রমণের তীরগুলি থাকে এ গ্রন্থে তা নেই। প্রতিবাদের যে উচ্চকিত প্রবলতা থাকে, তা নেই। এখানে আছে অনুভূতি, বেদনা, মায়াচ্ছন্নতা। অথচ প্রতিবাদ তো আছে। এই আমাদের সমাজ, এই আমাদের সামাজিক বিধি ও আইনগুলির বিপরীতে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আমাদের দৃষ্টি কাড়ে গোপাল, গোপালের অনুভূতি আর গোপালকে কেন্দ্র করে লেখকের বক্তব্য ব্যঞ্জনা।

গোপাল হাঁটে - তার মাথার উপর সাদা মেঘ - কালো মেঘ
ছায়া ফেলে, গোপাল হাঁটে তাহার মাথার উপর ফৌজ,
ফৌজী বন্দুক ছায়া ফেলে, গোপাল হাঁটে তার মাথার উপর

নির্ভার অচিন পাখি ওড়াওড়ি করে - গোপালের ভেতর আসে যায় - যায় আসে - এই কথা - কথা এই - পাখি তুই অচিন পাখি - পাখি তুই বন্দী করিলি। ১৮

এই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সমান্তরাল ব্যবহার লক্ষণীয়। বাস্তবতা ও কাব্যময়তার সহাবস্থান লক্ষণীয়। যাদব, ভুবন, মাধবের পাশাপাশি নাদু, পানু, গদাই, ভাঙ্গামূর্ত্তি, বিয়ের পদ্য চাদ্দের (শ্রাদ্ধের) চিঠির পাশাপাশি,আকাশ প্রদীপ,প্রেতযোনি, ছায়াযোনি ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলিকে চমৎকার ব্যবহার করতে পেরেছেন লেখক। 'গোপালের নয়নতারা,' সুভাষ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ। এটিকে নভেলেট বলা যায়।

সুভাষ ঘোষের সবচেয়ে দীর্ঘগদ্য 'শীর্ষ অভিযান।' এটিকে লেখক উপন্যাস বলেছেন। এর প্রথম অংশ ক্ষুধার্ত পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনে ১৯৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশটি প্রকাশিত হয় 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে। সাধারণত উপন্যাস যেমন বিবৃতিধর্মিতায় (Narrative) বেড়ে ওঠে এ ক্ষেত্রে তা নেই। ১৯৯৭ সালে দুটি অংশ মিলিয়ে তিন ফর্মার এই উপন্যাসটি বই আকারে যখন বার হয় তখন লেখক এর একটি ভূমিকাও লেখেন। তাতে সুভাষ জানান, এখানে কাট আপ পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। কাট আপ পদ্ধতিটি সিনেমায় প্রযুক্ত হয়। দৃশ্য, অভিনয়, সংলাপ ও সংগীত দিয়ে সেখানে কাট আপের ফাঁকগুলো ভরে ওঠে। অর্থাৎ একাধিক শিল্প মাধ্যমের সমবায় হেতু দর্শক সেখানে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন না। এমনকি নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র সম্পর্কেও একথা বলা যায়। কিন্তু উপন্যাসে তা ঘটে না বলে এবং এ উপন্যাসেও ঘটেনি বলে পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর ঠেকে। সুভাষ কখনও দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কখনও সংলাপ, কখনও সওয়াল - জবাব, কখনও বা তত্ত্বের কচ কচি পাচ্ছি। ফলে 'শীর্ষে অভিযান' কোনোভাবেই দানা বাঁধে নি। ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। এক একটি অধ্যায়ের লেখক শীর্ষনাম দিয়েছেন।বেশিরভাগ নামই খুব চটকদার। যথা, রেডিও কার্টুন, মহাভারত, স্বপ্নে টিভি চিত্র, মণিমেলা, লেটারবাক্স স্বীকারোক্তি জলহাওয়ার দুঃখ, নির্বাসিতের শোক, বেগম বাহার লেন, কুকুরের জন্য ইজের, অভিযান ইত্যাদি। উপন্যাসের শুরুতেই রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ এসেছে,জনতাকে নির্বীর্য ও নিরস্ত্র করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সরকারী অস্ত্রের।

নইলে দমন, পীড়ণ চলবে। মহাভারতের অনুষঙ্গ এনে ইন্দ্রের মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আমানবিক হবার প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, মানবিকতার নানান দিকগুলো উপন্যাসে বাড়ি, সংসার, অর্থ, ভোগ্যপণ্য, যৌনতা, প্রতিবাদ, রিরংসা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রধান করে তুলে ধরা হয়েছে। প্রটাগনিষ্ট জানিয়েছে,-

"ক্ষমতায় আমার লোভ ছিল -
বহু আত্মা ক্রয় বিলাস ছিল
ওজনে আকাঙ্ক্ষা ছিল
সিংহাসন উপাস্য ছিল
আ মেন্ ! ..... ইনশাল্লা ! .....
হাঁটি, হেঁটে যাই" - ।[১৯] এই অগ্রগমণ দিনযাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি নয়, একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া। "আমি'র বিস্ফোরণ আমি, আমিই সেই কারণ, আমারই চাপে প্রেসারে বেরিকেড, বেরিয়ার ছিঁড়ে গেল, স্বাগতম; স্বাগতম হু হু ছুটে আসছে হাত পতাকা নেড়ে অঙ্গাত বাসের বন্ধুরা।"[২০]

অর্থাৎ অভিযান একক নয়, সম্মিলিত। আবার অভিযান শুধু বাইরের নয়, ভিতরেরও। ভিতরের সংস্কার ও অভ্যাস, বিশ্বাস, প্রথাগত ধ্যাণ ধারণাগুলিকে নষ্ট করে জেগে ওঠার ব্যাপারও আছে। লেখক এখানে আবার বঙ্গদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কদেরও প্রয়োগ করেছেন। ইতিহাস ও বিষয়ের সম্পর্ক বা তারতম্য মানেন নি। তাই বিনয় - বাদল - দীনেশও এখানে এঘ্ন পড়েছেন। তাঁদের, বীর শহীদের ঐতিহাসিক ইমেজকে সুভাষ এখানে ধ্বংশ করেছেন :-

> কেন্দ্রীয় তাঁবুর কাছাকাছি ফ্লাডেট লাইটের ভেতর আবিষ্কার করি নিজেকে, কখনও- দেখি বিনয় সেখানে অলরেডি এসে পড়েছে। সে দীঘির পাড়ে শাল মহুয়ার ভিতর চাঁদের মুখে ইপসিত মধু খুঁজে পায়নি - ওইখানে বাদল ক্রমাগত বোঝাচ্ছে কাউকে, টাওয়ারের মাথা কোনো নিরাপদ জায়গা নয়, দীনেশ তাঁবুর সামনে অনবরত বকে যাচ্ছে - আসলে নেশার দ্বারাই আত্মা চালিত হয় শেষ পর্যন্ত ... ২১ ইত্যাদি।

এ উপন্যাসে সাধারণ মানুষের নিপীড়নের ছবি আছে। এই নিপীড়ন সামাজিকতার, নৈতিকতার, অর্থনীতির, শাসনব্যবস্থার, বিচার ব্যবস্থার অবদমনের এমনকি প্রবৃত্তিরও। লেখক নিপীরনকে ঠাট্টা করেছেন, আঘাত করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। সবরকমের শ্রেনীচেতনা, ও নীতিচেতনা কে ধ্বংস করে মুক্তির কথা বলেছেন। যে মুক্তি হবে মনের, শরীরের, সংস্কারের - সব কিছুর। কিন্তু কিভাবে এই মুক্তি ঘটবে তার কোন দার্শনিক ভীত্তিভুমি নেই। উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় রাজার নির্দেশ ছিল - জনতার বীর্য ও অস্ত্র কেড়ে নাও - নিবীজ ও নিরস্ত্রীকরণের পর সরকারী অস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করো। কিন্তু উপন্যাসের শেষে পৌছেও দেখি বিনয়- দিনেশ, অনুপমদের অভিযান অব্যাহত। শতরকমের নিপীড়নের চললেও জীবনের গতিকে এখানে রুদ্ধ করা যায় নি। আবার যে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী তার মধ্যেও মাঝে মাঝে ভর করে অত্যাচারী। তাই উপনাসের প্রধান কথক বলেন, -

> আমারই অমোঘ টোকায় সন্তান পিতার জন্য খিল খুলে বেরিয়ে আসতো, কিন্তু সন্তানকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। বাবা ছেলের ডাকে বেরিয়ে নিজে কোথায় নিখোঁজ হত - মেয়ে মায়ের ডাকে বেরিয়ে কোথায় লোপাট হয়ে যেত - আমারই ভোজবাজিতে ভাই ভাইয়ের জন্য হাত বাড়িয়েও ভাইয়ের সহিত মিলিত হতে পারত না, বন্ধু বন্ধুর সহিত।২২

কিংবা

> এক ধাক্কায় ফেলে দেয় মাথা থেকে স্বস্তিকা ক্যাপ - ঝটিতে মস্তিষ্কের তার সংযোগ ছিন্ন করে খুলে নেয় নখ, আঙুল থেকে - কোটর থেকে আমার দুই চোখে উপড়ে নেয়।২৩

ইত্যাদি।

এসবের কারণ যে পরিপার্শ্বের চাপ, প্রচলিত সিষ্টেম, সিষ্টেমের নানা লোভ ও দুর্নীতি তা বহু ভাবে লেখক এখানে বলেছেন,-

> সব কিছু সহজভাবে নিন।তাইতো চেষ্টা করি, কিন্তু ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত ফাঁসটির দিকে তাকিয়ে জগৎ সংসারকে খুবই সহজভাবে নেয়ার কথা চিন্তা করা যায় ?২৪

অথবা

'অত্যাচারী শ্বেতকায়, অশ্বেতকায়। ঠোঁট ফাঁক করলেই অত্যাচার। আমাদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যা করেছে। প্রায় প্রত্যেকই অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান জন্মাবার আগেই মারা গিয়েছে কয়েকজন। জন্ম দিয়েই কেউ কেউ। আমিও অন্তঃসত্ত্বা,কিন্তু কী প্রসব করব আমি ?২৫

গ . সুবিমল বসাক

সুবিমল বসাকের প্রথম গল্পের বই 'অযথা খিটক্যাল' ।এবং' পত্রিকা থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। যদিও অধিকাংশ গল্প ১৯৬৪ - ৬৫ সালে প্রকাশ পেয়েছিল হাংরি জেনারেশন, জেব্রা, প্রতিদ্বন্দ্বী, উন্মার্গ, গল্প কবিতা প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়। এখানে মোট ১০টি গল্প সন্নিবেশিত। যথা, পরস্তাব, গিদরামি, জাবড়া, আপটামি, খতিয়ান,আপিলা চাপিলা, অযথা খিটক্যাল, ছুঁচুমুচু ইচার অঙ্গুটে, ভোগলামি। নামেই ১০টি গল্প। কিন্তু মূলত একটি চরিত্রের প্রেমকাতর মানসিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তের বর্ণনা। যৌবনের কামনায় যে অস্থিরতা ও নারীসঙ্গলিপ্সা তা গল্পের নায়ক চারুময় সহ্য করতে পারছেনা। অস্থির হয়ে উঠছে। তার প্রেমিকার নাম কৃষ্ণা। দু-জনেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। এটা ছাড়া তাদের আর বিশেষ কোনো পরিচয় জানা যায় না। প্রেম ছাড়া, স্পষ্ট করে বললে কামনা ছাড়া চারুময়ের দিবারাত্র আর কোনো ভাবনা নেই। সে দিক থেকে তাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত চলা যায়। সুবিমল চরিত্রের কোনো ধার ধারেন নি। শুধু মানসিক বাসনাকাতরতার বর্ণনায় কোনো চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, শুধু প্রেমের ধারণায় যদি চরিত্র দুটিকে দেখি তাহলেও এই গল্পগুলিতে কোনো অভিনবত্ব নেই। এরই মধ্যে নাম গল্প 'অযথা খিটক্যাল' কিছুটা উত্তীর্ন হয়েছে। পরিস্থিতি রচনার মধ্যে কিছুটা কৌতুক সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাকে নিয়ে চারুময় কিছুক্ষণের জন্যে নিভৃতি খুঁজছে। নিজের মেসে, বন্ধুর বাড়িতে, হোটেলে, রিকসাওয়ালার বস্তিতে, প্রতিটি স্থানেই সেই নিভৃতি পেতে গিয়ে নানা উটকো ঝামেলায় তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়। শেষে দুজনে চলে যায় ময়দানের ফাঁকা জায়গায়। ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে দুজনে। সেখানেও অন্য আগন্তুক- হতে পারে ছিনতাইবাজ বা পুলিশ। সুতরাং দুজনে দৌড় লাগায়। স্টেশনে এসে পৌছায়।

কৃষ্ণার মুখ থমথমে। ষ্টেশনে পিল পিল করছে লোক। ট্রেনে চড়ে ফিরে আসে দুজনে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ি তাদের। দুজনে ভিন্ন পথে বাড়ি ফিরে যায়। চারুময় জানে না কত রাতে তাকে একা একা বাড়ি ফিরতে হবে। এই গল্পে নায়ক নায়িকার কামনার অচরিতার্থতার জন্য সম্পূর্ন মেহনতকেই মনে হয়েছে অযথা খিটক্যাল বা অনর্থক জটিলতা। আধুনিক নগর জীবনে মানুষের এমনিতেই প্রাইভেসি নেই, তাই প্রেমিক প্রেমিকাদের আরও অসুবিধা। কিন্তু বাস্তবতার জন্যেই গল্পটির সমস্যা বা কৌতুক যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই গ্রন্থের'ভোগলামি'গল্পে অবৈধ প্রেমের কাহিনী পাই। পুরনো বান্ধবী রাণীর বিবাহ হয়ে গেছে। রাণী চারুময়কে প্রলুব্ধ করে। চারু বোঝে রাণী তাকে মুছে দিল, এবার সে স্বামী নরেনের সঙ্গে একাত্মা হয়ে থাকবে। চারুও নিজেকে অনুতপ্ত মনে করে না। তবু এ গল্পে মধ্যবিত্ত নীতি বোধের কাঁটা যেন কোথাও খচ খচ করে।

'গেরিলা আক্রোশ' সুবিমল বসাকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল দেওয়া নেই। তবে গল্পগুলির প্রকাশ কাল দেওয়া আছে। প্রথম গল্প 'গেরিলা আক্রোশ' 'জেব্রা' ১ সংকলনে ১৯৬৫ সালে প্রকাশ পায়। এ গল্পে সুভাষ ঘোষের প্রভাব খুব স্পষ্ট। তবে একজন আধুনিক তরুণের সত্তার অস্থির যন্ত্রণা কে নিপাট তুলে ধরা হয়েছে। তরুণটি ডায়েরি পঠন শেষ করতে পারছে না। নিজের ডায়েরি মানে তো সে নিজেই অনেকটা। নিজেকে কী করেই বা ঐ টুকু যৌবনে সে বুঝতে পারবে ? তরুণটি বলে,-

> আমার মাথার চুল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। অথবা চুল ভর্ত্তি মাথার খুলি থেকে কপাল থেকে হাড়ের পাত বেরিয়ে পড়তে চায়। শরীর থেকে হাত পা কান মুন্ডু চোখ চিঠি জঙ্ঘাস্থি পেলভিস আলাদা আলাদা ভাবে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো হয়ে সরে পড়তে চায়।২৬

সুতরাং ডায়েরি আর পড়া হয় না। এবার সে বেতার যন্ত্রের দিকে যায়। বেতার যন্ত্রটিও ডায়েরির মতো। বেতার যন্ত্রও অস্থির। সেখান থেকেও হাজার তথ্য ও শব্দ সংকেত আসতে থাকে। পরম্পরা হীন সেই বাক্যরাজীর মধ্যে দেখি হাংরি কবি লেখকদের বক্তব্যই গল গল করে বেরুতে থাকে। তরুণটিও বেতার যন্ত্রের কাঁটা নিজের ইচ্ছেমতো নানা দিকে ঘোরাতে শুরু করে।

একসময় বেতারযন্ত্র থেমে পড়ে। বাতি নিভে যায়। বহু চেষ্টা করেও তরুণটি তাকে আর সচল করতে পারে না। তখন সে আবার চলে যায় ডায়েরির দিকে। আলমারির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে ডায়েরি তুলে ধরলে তার রেক্সিনের লাল মলাট জ্বলতে থাকে। তবু ডায়েরি পড়ার আগ্রহ জন্মায় না। সে বেতার যন্ত্রের কাছে যায়। প্লেটের উপর চোখ পড়তেই মনে পড়ে আরো একটি বৎসরান্ত বৃদ্ধি পাবে। সে এবার ডায়েরির লাল মলাটের উপর মাথা রেখে ঘুমোতে চেষ্টা করে যতক্ষন না ঘুম আসে। এই গল্পে যে গেরিলাটির কথা বলা হয়েছে তা তরুণটির মধ্যে আছে, আছে বেতার যন্ত্রের মধ্যেও। আধুনিক মানুষ আর যান্ত্রিক জীবন গেরিলার বন্যতাকেই মান্যতা দেয়। সেখানে যন্ত্রেই একমাত্র নিঃস্তব্ধতার আশ্রয়।লক্ষ করার যে , সুবিমল গেরিলা আর গোরিলাকে এক করে ফেলেছেন ।

গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'অগ্রাসী অপকর্ম' 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিকায় ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটির নাম আগ্রাসী অপকর্ম হলেও আগ্রাসী শব্দদূষণের অত্যাচারই এর বিষয় বলা যায়। লেখক অতিরিক্ত শব্দদূষণের শিকার। আসলে, শব্দের বাহুল্য, অংযম এবং যথাযথ শব্দের অপ্রতুলতাই লেখককে এখানে বিপন্ন করে তুলেছে। শব্দের রহস্যময়তাকে লেখক খুঁজে বেড়াচ্ছেন,পাচ্ছেন না। জীবনের রহস্যময়তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন লেখক, পাচ্ছেন না। একঘেঁয়ে বিবর্ণ জীবনকে তাঁর ভয়, আতঙ্কের থম থমে পরিবেশ সারা গল্প জুড়ে বিস্তৃত। একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জীবনের অসারতা ও ভীতিকে জয় করা সম্ভব। কেননা মৃত্যুই শব্দহীনতা।২৭

গ্রন্থের তৃতীয় গল্প 'হাঁহাইশহীন ছোবল'। ১৯৭০ সালে আবহ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এই গল্পের তরুণটি একটি বেডরুমে শুয়ে আছে। সে নিঃসঙ্গ, একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে কড়িকাঠ, সিলিং, কালো ছায়া, বালব, চুনের কালি, সিগারেট ধোঁয়া, রহস্যময় ঘর। চোখের পিছনে, স্মৃতিতে পুরনো লোদীপুরের বাড়ি, দুপুরের স্কুল ফিটন, প্রেমিকার চোখ, দীঘার সমুদ্র সৈকত। নিজের এই দুটি বাস্তবকে চরিত্রটি মেলাতে পারে না। বরং বর্তমানের শূন্য নিরাবলম্বতায় ভীত হয়ে পড়ে। সহসা বেড়াল দেখে ভাবনাগুলো যেন ছড়িয়ে পড়ে। বেড়ালই হয়ে ওঠে পিতার পূর্ণ প্রতিকৃতি - যদিও কিছুক্ষণ পরে তা আবার বেড়ালই হয়ে যায়। তখন সে তাকে ঘাড়ে চেপে ধরে, বেড়াল পালিয়ে যায়। সে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু দরজায় সুতো বাধা জিভ - এই রহস্যময় ঘরে।

দরজা বন্ধ করে দিলে ঐ জিভ দরজায় আঘাত করে বলে, আমি এসেছি দেয়াল প্রতিধ্বনিত করে, বাবা এসেছে। তার চিন্তাভাবনা বিমূঢ়তা লাভ করে। তবু সে ঘুমোতে চায়, ঘুমোতে চেষ্টা করে। আসলে আবদ্ধ ঘর থেকে চরিত্রটি বার হতে পারে না। বর্তমানের প্রতীক এই ঘর। সেখানে থেকে বেরুনো সহজ নয়। অতীত তো সেখানে আসবেই - ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। অনিশ্চয়তার আতঙ্কই গল্পটির মূল বীজ।

'অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস'গল্পটি 'অধুনা সাহিত্য' পত্রিকায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘুমের ভিতর দুঃস্বপ্নেই বুঝিবা চেঁচিয়ে ওঠে তপন। ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে সে। আশঙ্কা করে যে কোনো মুহূর্তে অরুণিমা তার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তপন অরুনিণাকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে প্রেমিকাকে। তার যৌবনের প্রেমিকা, স্বপ্নের নারী, প্রমীলার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি আর্থিক ও সম্প্রদায়গত হীনতার কারণে। এখন প্রমীলা যখন স্মৃতিবাহিত হয়ে তপণের কাছে আসে, তখন অরুণিমার উপস্থিতি যেন রয়ে হয়ে উঠে। প্রমীলা দেবী, অরুণিমা রাক্ষসী। তপনের কাছে প্রমীলার সঙ্গে নিজের ব্যর্থপ্রেম যেমন অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস, তেমনই অরুণিমার সাহচর্যও অপ্রতিরোধ্য ভাইরাস। এটি চাওয়া ও পাওয়ার অসঙ্গতি ও অতৃপ্তির সঘৃণ উপাখ্যান। অরুণিমা কুশ্রীতার প্রতীক তপনের কাছে প্রার্থিতা নয় বলে, প্রমীলা সৌন্দর্যের প্রতীক তপনের কাছে কাম্যা বলে, এখানে লেখক সেই তথাকথিত 'Beauty and beast' র নক্শাই এঁকেছেন।

গ্রন্থের শেষ গল্প 'তেজস্ক্রিয় দুঃস্বপ্ন' 'গল্পকবিতা' পত্রিকায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বিশাল পৃথিবীতে গল্পের চরিত্রটি নিজেকে শুধু একা নয়, বিশ্বের একক প্রতিপক্ষ হিসেবেও দেখে। ফলে, তার যুদ্ধ বিশ্বের সঙ্গে কিভাবেই বা দাঁড়াবে ? তার যুদ্ধ নিজের সঙ্গেই রূপ পায়। সাঙ্কো পাঞ্জাও ছায়ার সঙ্গে একা লড়ছিল। সে ছিল যোদ্ধা। এ গল্পের নায়ক মেরুদন্ডহীন, অসুস্থ। তদুপরি যৌনকাতর। গোটা দুঃস্বপ্নটি চরিত্রটি ঘটিয়ে ফেলেছে একটি বাসের ভিতর। তার পাশে একটি স্বাস্থ্যবতী নারী বসে থাকাই এর কারণ। একটা সময় সে যখন দেখে তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে শ্বেতকুষ্ঠ তখন সে বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই অংশে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্তমাংস' গল্পের প্রভাব এসে পড়ে। তবে সন্দীপনের সর্বগ্রাসিতা সুবিমলে নেই। কেননা টার্মিনাসে বাসের হ্যাঁচকা টানে বস্তুজগতের জাগ্রত স্পষ্টতায় ফিরে আসে দুঃস্বপ্নের এই নায়ক।

'আত্মার শান্তি দু-মিনিট' গল্প গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত। মোট পাঁচটি গল্প এবং একটি ইস্তাহার এখানে সংকলিত। এদের নাম যথাক্রমে - গেষ্টাপো অভিযান, গোপন আঁতাত, আত্মার শান্তি দুমিনিট, মাংস খাওয়া হলে, মেফিস্টোফিলিসের হাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম গল্প, গেষ্টাপো অভিযান-এর নায়ক কীভাবে আমিত্বের অসুখ থেকে, ভালবাসার আকর্ষণে আরোগ্য পেল তাকেই ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। নায়কটি জীবনযুদ্ধে যখন ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যৌনতা, যৌনতার স্মৃতি তাকে উজ্জীবিত করে। নায়িকা কেয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয় বাসস্ট্যান্ডে। কেয়ার সঙ্গে প্রথমে তার শারীরিক সম্পর্ক ঘটে। কেয়া ক্রমে সঞ্চারিত হয় তার মনে। তার কর্মব্যস্ত জীবনের অনেকটা সময় সে নিয়ে নেয়। প্রথম দিকে কেয়াকে সে এতো সময় দিতে প্রস্তুত ছিল না। পরে কেয়ার কাছে, যৌনতার কাছে, ভালবাসার কাছে সে সর্বাংশে আত্মসমর্পণ করে। এ গল্প রুক্ষ্ম যুবকের প্রেমের কাছে আত্মসমর্পনের গল্প। তার ব্যাখ্যা এরকম,-

> ভালবাসতে বাসতে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন গতি পাইনা। নিজেকে ক্ষয় করা ছাড়া ভালবাসার অন্য কোনো স্বাভাবিকতা দেখা দেয় না।২৮

দ্বিতীয় গল্প 'গোপন আঁতাত'-এনরনারীর গোপন দ্বিতীয় সম্পর্কের রহস্য বিচার করেছেন সুবিমল। নায়ক অফিসের কর্মচারী। অবিবাহিত তরুণ। সে কারুর সঙ্গে সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। যে কোনো মুহূর্তে অন্যের ত্রুটি বিচ্যুতি, অসঙ্গতি, সৌন্দর্যের ব্যতয় তার প্রতি নায়ককে বীতস্পৃহ করে তোলে। ঐ বিরাগ সে প্রকাশিত করে চরম অভদ্রভাবে। এভাবেই সুচন্দ্রা, মণিকা, রমেন - সকলের সঙ্গে সে অস্বাভাবিক দূরত্ব রচনা করে ফেলেছে। এ সবের মধ্যেই সে ভেবেছিল সুচন্দ্রা তাকে ভালবাসে। একদিন সুচন্দ্রা তো তাকে অফিসেই যেতে দেবেনা। তাকে আদর করে, ঘরে ঢুকে রান্না করে খাওয়ায়। কত কি! যদিও শেষ বেলায় সে অফিসে যায়। সেখানে অফিস সহকর্মী নববিবাহিতা মনিকা তাকে কেবিনে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করে উপহার হিসেবে তাকে মনে রাখতে বলে। পরদিনই স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে যাচ্ছে সে। এদিকে রাত্রিবেলা বাড়িতে ফেরার সময় দেখে, ব্যালকনির একপাশে অন্ধকারে নতুন প্রতিবেশী যুবকের সাথে সুচন্দ্রা এলোপাথারি চুমু খাচ্ছে। পরদিন অফিস গিয়ে দেখে, মণিকা বেল বটম পরে রেকর্ড নিয়ে অফিসারের ঘরে ঢুকল।"একটু বাদে জিভ চাটতে চাটতে বেরিয়ে আসে কুক্কুরী।"২৯

জীবনের এই বাস্তবগুলোকে সুবিমল নীতি না হোক হৃদয় দিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। সে জন্যই গোপন প্রেম না বলে বলেছেন গোপন আঁতাত। আঁতাত মানেই অশুভ সম্পর্ক। প্রেম সম্পর্কের অতীব ঘৃণা এ গল্পের প্রাপ্তব্য। কিন্তু গল্পের কথন ভঙ্গী, প্রতিপাদন কৌশল খুবই আর্কষণীয় ও স্বাভাবিকতার গুণ সম্পন্ন।

'আত্মার শান্তি দু-মিনিট' গ্রন্থের নাম - গল্প। অফিসের এষ্টাবিলিশমেন্টের এক কর্মচারী শর্বরী গুহ ঠাকুরতা আগুনে পুড়ে মারা গেলে আর উদ্দেশ্য শেষ সভায় কথককে দু-মিনিট নীরবতা পালন করতে হয়। ঐ নীরবতার মুহূর্ত গুলিতে তার চিত্তে অনেকগুলি ভিন্ন দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠতে থাকে। ঐ টুকরো টুকরো ঘটনা ও ছবির মাধ্যমে আরও অনেকগুলি চরিত্র, গল্পাভাস পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। নির্মিত হতে থাকে কনকের মৃত্যু ভাবনার আদলটি। কাঁচের শোকগৃহে সকলের শোকপ্রকাশ হয়ে গেলে কথক একা রয়ে যায়। সে চারপাশে বাসি রক্তের গন্ধ পায়, তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে, বেজে ওঠে আর্তনাদ। দেয়ালে মৃত্যুর কথা, চারদিক থেকে শোনাতে শুরু করে তীব্র হাহাকারে।৩০

ভিতরের বাতিগুলো ফট ফট করে নিভতে গুরু করে। শেষ আলোটা নেভার পূর্বে কাঁচের দরজা ঠেলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। দু-মিনিটের পরে বেশীক্ষণ সেখানে থাকা উচিত নয়। শোকের জন্য সময়ের বরাদ্দ কম। লক্ষণীয়, কথক দু-মিনিট নীরবতার মধ্যে আতঙ্কের সরব উপস্থিতি-ই লক্ষ্য করেছে কেবল। রক্ত, মাংস, কান্না, আর্তি, দোমড়ানো মোচড়ানো শরীর, ফাঁসির মড়ার গলায় মোটা নীলের দাগ, চোখে অশ্রুর দাগ, নাকে জমাট রক্ত এই সব বীভৎস দৃশ্যবলী দিয়ে লেখক আত্মার জন্য শান্তি প্রার্থনার দু-মিনিটকে পরিপূরিত করেছেন। নিষ্ঠুর বাস্তব তার প্রগাঢ় অবিশ্বাস মৃত্যু ও শোককে ঘিরে এখানে একটি বিশেষ আকার ধারণ করেছে। তবে লেখকের অতি সংবেদনশীল চিত্ততা ও মানবিকতা ধারনাটিই তাতে পুষ্টি পেয়েছে। গ্রন্থভুক্ত চতুর্থ গল্পটিরনাম 'মাংস খাওয়া হল'। অত্যন্ত সাধারণ মানের রচনা। বাসুদেব দাশগুপ্ত, শৈলেশ্বর ঘোষের ক্ষুধার্ত প্রবণতারই ছবি অঙ্কিত এখানে। যথা,-

> ক্ষুধা যেন চর্চিয়ে বেড়ে ওঠে। আকণ্ঠ ক্ষুধার ভাবনা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ..... রাস্তা ক্রশ করে একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকে পড়ি ....

আমি নিবিষ্ট একাগ্রমনে খেয়ে চলি। আমার দু-চোখ মাংস ও পরোটায়। ঘ্রাণে এসে ধরা দেয় মশলার গন্ধ। পরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসের সঙ্গে মুখে পুরে ফেলি, পেঁয়াজ খাই কচ্ কচ্ শব্দে।৩১

অপরিসীম ক্ষুধায় চরিত্রটি এত খায় যে নির্জীব সাপের মত ঘাসের উপর শরীর এলিয়ে দেয়।

গ্রন্থের পঞ্চম গল্প 'মেফিস্টোফিলেসের হাত'। এটি বিচ্ছিন্নতা বোধের গল্প। চেতন ও অচেতনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই চরিত্রটির ভিতর। তাই সে আছন্ন, ভূতগ্রস্ত। পথে বিপথে সে একা একা হেঁটে বেড়ায়। শৈশবকালকে মনে করতে পারে না সে। প্রতিটি ঘটনাকেই মনে হয় আকস্মিক। শরীর একটু অসুস্থ হলেই বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকে। চারপাশের মানুষের সকলের সঙ্গেই তার আচরণ হয়ে ওঠে অদ্ভুত। অস্বাভাবিক। সহসা মনে হয়, অদূরে দাঁড়িয়ে গুপ্তঘাতক। কালো ছায়ার মতো ভয় তাকে পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে। প্রথমে সে হাঁটতে থাকে। তারপর দৌড়ায়, নিরুদ্দেশ, দিগ্বিদিকহীন। পায়ের তলায় মাড়িয়ে যায় নিজেরই ছায়া। সময় ও নিজেকে অতিক্রমণের একটি ব্যর্থ চেষ্টা যেন। দিশেহারা আধুনিক মানুষের এটাই নিয়তি, কাম্যুতে, কাফকায় এবং সেই প্রভাবে সুবিমল বসাকের মধ্যেও।

ষষ্ঠ রচনাটি - হাংরিদের দৃষ্টিতে সাহিত্যে কী তারই একটি প্রচারপত্র। ছোট ছোট দশ লাইনের রচনাটির নাম 'প্রতিদ্বন্দ্বী।' মানুষ এবং সাহিত্য যে আধুনিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ করি এমন কথাই সুবিমল এখানে বলতে চেয়েছেন।

সুবিমলের বসাকের 'ছাতামাথা'গদ্য গ্রন্থটি প্রথম ১৯৬৫ সালে বার হয়। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ২য় ২০০২ সালে। গ্রন্থটি আদ্যন্ত ঢাকাই কুট্টিতে লেখা। লেখক নিজে এবং সহযোগী লেখক অনেকেই এটিকে উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রায়ন, বাস্তবতা, দর্শনচেতনা এ গুলো কিছুই এখানে মিলবে না। শুধু লেখকের দৃষ্টিকোণ (point of view) ছাড়া। সুবিমলের গল্পের মধ্যে যে আত্মপ্রক্ষেপণ ও বিচ্ছিন্নতা বোধের অনুভবগুলি মেলে - তারই বিস্তার ঘটেছে 'ছাতামাথা'নামক গদ্য আখ্যানে। আখ্যানের চরিত্রটি স্বয়ং লেখক। তিনি একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকেন।

তার কেউ আছেন বলেও জানা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে বাবা ও মায়ের স্মৃতিচিত্রণ করা হয়। লেখক একটি অফিসে কাজ করেন। সেই অফিস সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায় না। তবে চাকুরিটি যে নিম্ন মধ্যবিত্ত তা অনুমান করা যায়। ফ্ল্যাটে একা থাকলেই তাঁর কেবল নরক তার শয়তানের কথা মনে আসে। নরক তাঁর সারা জীবনেই ছড়ানো, চারপাশে রয়েছে শয়তানেরাও। তাই বোধ হয় তিনি নিরুদ্বিগ্ন নন, সুস্থির নন। শয়তানকে তিনি খুঁজে পেতে চান। পানও। তাঁর নিজেরই মধ্যে শয়তানের বাস তারই মন চেহারা শয়তানের। শয়তানের অন্বেষণ শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে, আত্মানুসন্ধানের নামান্তর।

একদিন কেউ তাঁকে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। তিনি বেরিয়ে পড়েন। উঠে পড়েন বাসে। কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে যেতে থাকেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। তার পাশের সীটের লোকটি তাঁকে বলে- জানেন চিড়িয়াখানা থেকে জন্তুরা সব বেরিয়ে পড়েছে। কলেজ ষ্ট্রীটে নেমে একটি ঘরে পেইন্টিং একজিবিশান দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। এই বিস্ময় যেমন তার বিস্মরণশীল মনের জন্যে, তেমনই তার গেঁয়ো সাবঅল্টার্ন চরিত্রের জন্যে। সবিতা, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্ত্তী, শকুন্তলা, নীহার, অনিমা, অরুন্ধতী বলে ডাকেন। মেয়েদের খুবই অচেনা বলে মনে হয় তাঁর। নারীদের প্রতির এই উদাসীনতা বিদ্বেষ ছাড়া আর কী? যে ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন তার পাশের ফ্ল্যাটে নারীদেহের ব্যবসা চলে। একেক দিন একেক নারী সেখানে ভাড়াটে হিসাবে আসেন। তিনি তাদের সঙ্গে মেশেন না। কারুর সঙ্গেই মেশেন না। জনমানব থেকে নিজেরই মুত্রা দোষে কেবলই আলাদা হতে থাকেন। কিন্তু একদিন পাশের ফ্ল্যাটের জ্যোৎস্না তাঁর কাছে এসে আলাপ করে। তাঁরও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাঁর সব বায়োডাটা দেন, এমনকি শারীরিক মাপজোকও। কিন্তু নাম দিতে পারেন না। কারণ নিজের নাম খুঁজে পান না। তিনি নাম গোত্রহীন, জনসমাজে এক অচেনা আগন্তুক। তাঁর নিজের ফটোগ্রাফের প্রয়োগ একটি সংখ্যা পাওয়া যায় ৫৫৭৪৩, নামের বদলে সেটিই হয়ে ওঠে তাঁর চিহ্ন। তাঁর অস্তিত্ব একটি সংখ্যাচিত্রের বেশী কিছু নয়। এরপর তিনি তাঁর নানা দিনের দিনলিপি নানা অভিজ্ঞতা অনুভূতি, কয়েকটি জানা ঘটনার বিবৃতি দেন। ক থেকে ঞ পর্যন্ত ১০টি শিরোনামাঙ্কিত অনুচ্ছেদে। পরে আবার ধারাবিবরণীতে ফিরে যান। তখন আর জ্যোৎস্না নেই, এসেছে পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংখ্যা এবার পেয়ে গেছে নাম। শ্রী সুবিমল বসাক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। বেশীর ভাগই উদ্ভট - যে গুলোর কোনো অর্থ-ই নেই।

একটি অভিযোগ স্পষ্টগোচর - অধিক প্রহর রাত্রে পথে বিপথে একাকী ঘোরাফেরা করা। অভিযুক্ত হবার পর বিচারে তিনি নির্বাসন দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। এর পরে আসে ক বাবুর প্রসঙ্গ। সেও পাগল, অন্যমনস্ক, উৎকেন্দ্রিক। ক বাবু আচার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তিনি পুনর্বিশ্লেষণ করেছেন। এও বোঝেন, তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যু চেতনায় আক্রান্ত হন তিনি। জ্যা পল সার্ত্রের মৃত্যু ভাবনার মত দার্শনিক গঠন কিন্তু নেই এখানে: ,আবার রোম্যান্টিক, মৃত্যুচেতনাও নয়। উন্মার্গগামিতাই বুঝি; ঐর কারণ এবং নিঃসঙ্গতাও। যে কোনো নিঃসঙ্গতাই মৃত্যুকে ভয় পায়। লেখক এখন আর ফ্ল্যাটে, একদম তিষ্ঠোতে পারেন না, বিকেল হলেই বেরিয়ে পড়েন। অনির্দ্দেশ্য ভাবে মহানগরীর রাস্তায়, গলিঘুঁজি ময়দান নানা জায়গায় চড়কির মতো ঘুরে বেড়ান। তাঁর খিদে পায়। মিষ্টি খান। পরে সিগারেট খান। চেনা পরিচিত স্থানে হাঁটতে হাঁটতে একে তিনি সব গুলিয়ে ফেলেন। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় স্মৃতিকাতরতা, চোখে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এই ঘুম যেন মৃত্যুর ইশারা।

বাসুদেব, সুভাষ ও সুবিমলের কথা সাহিত্যের বিষয় সাধারনভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। প্রধানত যুব জীবনের অস্থিরতা, বিক্ষোভ ও জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে এরাঁ আবর্তিত হয়েছিল্ল।অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই যুবকেরা ভবঘুরে, উদ্বাস্ত, পেশাহীন। এঁদের পারিবারিক পরিচয় নেই, সামাজিক দায়িত্ব নেই, রাজনৈতিক পরিচয় নেই অথবা ক্ষীণ। উদ্দেশ্যহীন, দিশাহীন, ভবিষ্যৎহীন এই যুবকদের তাই নেশাগ্রস্ত, উন্মত্ত ও আত্মহত্যাকামী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, এই লেখকদের জন্ম চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, মারী, মন্বন্তর আক্রান্ত বঙ্গদেশে। এঁদের বড় হয়ে ওঠা স্বাধীনতা আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। যেমন শৈলেশ্বর, বাসুদেব ও সুভাষের পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। সুতরাং এঁদের অভিজ্ঞতা ও চেতনায় কালের করাল কালো ছায়া রয়েছে। ক্ষুধা, নিঃসঙ্গতা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা শৃঙ্খলাহীনতা - এই সব ব্যাপার তাই বার বার এঁদের লেখায় আসে। এ হল বস্তুগত কারণ। আবার একটি শৈল্পিক কারণও আছে। কারণ এই সমস্ত জৈবিকতার মধ্যে দিয়েই মানবমনের নানা দিককে উন্মোচন করা যায়। স্বাভাবিকতা নয়, অস্বাভাবিকতার মধ্যেই থাকে জীবনের অনেক অচেনা অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা অর্জনেরও চেষ্টা করেছেন এই লেখকেরা। জগৎকে বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। ভিতর দিক থেকে অন্যরকম। জগতের সেই আভ্যন্তরিন সত্যকে হাংরি লেখকেরা ফোটাতে চেয়েছেন। পোষাক খুলে মানুষের নগ্নতাকে একেবারে নির্মমভাবে তাঁরা তুলে এনেছেন। বাসুদেবের 'দূরবীন', 'রিপুতাড়িত' 'বমনরহস্য,' 'বাবা' ইত্যাদি প্রতিটি গল্পেই সেই অভিপ্রায় স্পষ্ট। সুভাষের 'হাঁসেদের প্রতি,' 'গোপালের নয়ন তারা', সুবিমলের 'অযথা খিটক্যাল' 'গেরিলা আক্রোশ', প্রভৃতির মধ্যেও ভিতরের মানুষটিকে টেনে বার করার প্রয়াস আছে। এই লেখকদের মধ্যে যৌনতার অতিরেক আছে।কারন হাংরি সাহিত্য মূলত পুরুষবাদী সাহিত্য - এখানে যৌনতাও পুরুষবাদী। যৌনতা দিয়ে হাংরিরা শুধু জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ নয়, সংঘাত এবং পুরুষবাদী আধিপত্যও প্রকাশ করতে চান। তাই নারীদের এখানে কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। নারী যৌন চিহ্নের বেশী কিছু নয় হাংরি সাহিত্যে। নারী হাংরি লেখকদের সেজন্য কোথাও উত্তীর্ণ করে দেয় না। উত্তরণের কোনো ব্যাপারই যে এঁদের লক্ষ নয়। নিরর্থকতার বোধও এঁদের মজ্জাগত।তাই এত শূণ্যতা, মৃত্যু চেতনা, আত্মহত্যার বোধ। মলয় বলেছিলেন,-

> বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নেই জানার পরেও মানুষ বেঁচে থাকে, মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য জীবনপাতী শ্রম করে যায়, বেঁচে থাকে ..... কিসের জন্য অপেক্ষা করছে তা সে কোনোদিনই জানতে পারে না সে কেবল অপেক্ষা করে থাকে অপেক্ষা করে যায়।৩৩

আবার যেটুকু সময় মানুষ বেঁচে থাকে - তার মধ্যে জেগে থাকে শরীর। অতএব শরীর সত্য। সেই শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কামনা, জিজ্ঞাসা সেগুলোও সত্য। এই শরীরের সব দিকগুলোকে জানার চেষ্টাই হাংরিদের লক্ষ। এই অর্থেই তাঁরা ক্ষুর্ধাত। এই অর্থেই তারা অপরাধী ও যৌনকাতর।

শৈলেশ্বর বলেছেন -

> মানুষ শরীরকেই চেনে না। শরীরই তার জীবন। শরীরই তার বন্ধনমুক্তি, শরীরই তার ঈশ্বর, শরীরই মৃত্যু, আবার মৃত্যু অতিক্রমও করে শরীর। ক্ষুন্নিবৃত্তিগত শরীরের মধ্যেই সমস্ত সত্য লুকিয়ে আছে। বুর্জোয়া কোনো অবস্থাতেই চায় না যে, এই শরীর জেগে উঠুক।৩৪

শরীরের অবদমন এঁরা সহ্য করেন নি। তাই পিউরিটানদের বিরোধিতা করেছেন। শরীর দিয়েই আক্রমণ করেছেন শরীর বিরোধীদের। হাংরিদের যৌন অতিরেক তাই প্রতিবাদের চিহ্ন। বাসুদেব অধিকাংশ গল্পে, সুভাষের প্রথম দিকের গল্প এবং সুবিমলের গল্প গুলিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

হাংরি কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলোর আচরণ ও সংলাপে কিংবা ঘটনা ধারার বর্ণনায় অসংলগ্নতা একটি পুনরাবৃত্ত ব্যাপার। এটা একদিকে যেমন চরিত্রগুলোর জেনেটিক, তেমনই তাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও ঐতিহ্যের পেষন বা প্রভাব জাত। শৈলেশ্বর লিখেছিলেন,-

> অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। অন্তহীন শূন্যতা পরিবেশের সন্তান আমরা। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের জন্ম।৩৫

বাসুদেবের গল্পে প্রতিটি চরিত্র অস্থির, দিশেহারা শেষে হিংস্র হয়ে ওঠে। সুভাষের গল্পের মধ্যে অস্থিরতা আরও বেশি ও চরিত্রগুলোর প্রতিবাদ ও সরাসরি রাষ্ট্র, সমাজ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকিত। সুতরাং এঁদের আপাতবিশৃঙ্খল তরে ব্যাপারটি প্রতিবাদের উদ্দেশ্যই নিয়োজিত। শুধু চরিত্রগুলোর আদল দেখানোর জন্য নয়। সুবিমলের গল্পে অসংলগ্নতার ব্যাপারটি খুবই কম বলা যায়।

তবে মৃত্যুর ব্যাপারটি তিনজনের লেখাতেই বহুবার নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। ১৯৬৫ সালে মলয় রায়চৌধুরী লিখেছিলেন,-

> অ্যাবসল্যুট আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্যে
> আত্মহত্যার অস্ত্র ব্যবহার করতেই হয়, অদৃশ্যকে
> নয়তো দেখা যায় না।৩৬

সুতরাং মৃত্যু হাংরিদের লেখায় একটি জীবন প্রকরণই নয় শুধু। শিল্প প্রকরণও বটে। লক্ষণীয়, এই তিন গল্পকার মৃত্যুকে তিন ভাবে ব্যবহার করেছেন। কারন তিনজনের উপস্থাপনরীতি এক নয়। বাসুদেবের গল্পের জগৎ রূপকের জগৎ, সুভাষের প্রতীকের আর সুবিমলের প্রত্যক্ষ বর্ণনার। অতএব 'বমন রহস্য' গল্পে সুকুমারের বাবা ও শ্বশুর মশাইয়ের মৃত্যু, 'দূরবীন' গল্পে নায়ক ও তরলতার মৃত্যু কিংবা 'বসন্ত উৎসবে'র গল্প মণিকার মৃত্যু যেন ঠিক মৃত্যু নয়, একটি চিহ্ন মাত্র। সুভাষের গল্পে মৃত্যু শোষণের একটি হাতিয়ার, প্রতিবাদের কণ্ঠরোধকারী, বিচ্ছিন্নতার একটি অস্ত্র। 'হাঁসেদের প্রতি' গল্পে হাঁসেদের ধ্বংশকরা হচ্ছে তাড়াতাড়ি অধিকাংশ ডিম সংগ্রহের জন্যে। 'শীর্ষ অভিযানের' মৃত্যু আহত চরিত্রেরা প্রকৃত পক্ষে শহীদ। 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' গল্পে বলা হচ্ছে :

> তাবৎ মানুষের সঙ্গে যখন নিজেকে জড়াতে যাই
> মৃত্যু হঠাৎ-ই বেজে ওঠে ঠিক মাঝখানে।৩৭

সুবিমলের গল্পে মৃত্যু একজন জীবিতের জীবনকে আলোড়িত করে। হয়ে ওঠে সংক্রামক। সুবিমল মৃত্যুকে ভয় করেন 'আত্মার শান্তি দু'মিনিট' গল্পে অফিসের একটি মৃত্যু সংবাদ লেখকের সমগ্র অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। আসলে আতঙ্ক সুবিমলের গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। তা অনেক সময়ই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়।

অনেক সময় এই আতঙ্ককে জয় করবার জন্য তিনি মৃত্যুকেই আশ্রয় করেন। 'আগ্রাসী অপকর্ম' শীর্ষক গল্পে জীবনের অর্থহীনতাকে মৃত্যু দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন সুবিমল। বলা যায়, সুবিমলের কাছে মৃত্যু একটা পালানোর পথ। মলয় আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্যে মৃত্যুকে প্রয়োগ করার কথা বলেছিলেন। সে দৃষ্টি অধিবিদ্যক। তত্ত্বে বা কবিতায় তাকে রূপায়িত করা সহজ হলেও গল্পে কঠিন। কাম্যু বা কাফকা এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছিলেন। সুবিমল তা পারেন নি।

হাংরি কথা সাহিত্যে সামাজিকতা, প্রেম, সৌন্দর্য ইত্যাদিকে প্রত্যাখান করা হয়েছে, প্রচলিত রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জনেই এটা তাঁরা করেছেন। এটা তাঁদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী। একটু চড়া সুরেই করেছেন যাতে মানুষ তাঁদের দিকে তাকান। তবুও কিন্তু শিল্পমূল্য অর্জন এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বাসুদেবের রূপক ও রূপকথার জগতে শুধু হাংরি চেতনা নয়, একটি চিত্তাকর্ষক পরিবেশও ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষারীতি, চিত্র নির্মাণ বা সংলাপ রচনাও প্রশংসনীয়। অনেক ক্ষেত্রে গল্পকার বাসুদেবের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সুভাষের গল্পে প্রতীকের ব্যবহার বেশী। চিত্রল বর্ণনা সমারোহ, কোলাজ - রীতি এগুলোও ছাড়াও নাটকীয় দৃশ্যকল্পনা সেখানে সুপ্রচুর। সুভাষই এই ধারার একমাত্র গল্পকার যিনি কোথাও একটুকু আবেগবিহ্বল হন নি। বাসুদেব ও সুবিমল কিন্তু হয়েছেন। সুভাষ বুদ্ধিপ্রধান গল্পকার। তাছাড়া রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ সরাসরি। একদিকে কলকাতা মহানগরীর তাঁর লেখার উপজীব্য - আর পটভূমি সারা ভারতবর্ষের। সুবিমলের লেখায় পটভুমি ও পরিবেশের গুরুত্ব নেই। নিঃসঙ্গতা, আতঙ্ক ও যৌনতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিচৈতন্যের একটি ছবি ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লক্ষ। শ্রেণী চরিত্রের বিচারে তিনজনের মধ্যে সুবিমলই সবচেয়ে প্রান্তিক। ছাতামাতা রচনাটির শুরুতে আছে ,-

> পূজা - পাইলের দিনে, তেহার পরবে, ঐ স্থানে গিয়া দুই একদিনের লাইগ্যা ঘুইরা আওন যাইতো - আয়েরও পথ হইতো ..... রোজ নিত্যি ধর্মের তিরিশো দিন ডাইল ভাত মাছ চরচৈটা পাতরি আর খাওন যায় না।৩৮

গ্রন্থের শেষ পাতার আগের পিঠে আছে ,-

> আদখা আমার ক্ষুধা পায়। টের পাই প্যাটের ভিৎরে ক্ষুধা চনমন কইর‍্যা উঠছে। হপার বাইরনের আগে প্যাট ঠেইস্যা খাইয়া উঠছি - অহন আবার ক্ষুধা পাইছে। ৩৯

যৌনতা যেমন অনেক সময় এঁদের একটা মানসিক প্রবণতাও বিশেষ; এক্ষেত্রে সুবিমলের ক্ষুধাও তাই। তাছাড়া, নিজেদের তত্ত্ব ও ভাবনাকে শিল্পরূপ দেবার ক্ষমতা বাসুদেব ও সুভাষের যতটা, সুবিমলের ততটা নেই। তবুও বাসুদেব ও সুভাষের সহযোগী কথাকার হিসেবে এবং হাংরি আন্দোলনের গঠনপর্বের একজন লেখক হিসেবে সুবিমলকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেই দেখতে হবে।

তথ্য সূত্র ঃ

১. বাসুদেব দাশগুপ্ত, রন্ধনশালা গল্প, রন্ধনশালা, কলকাতা, বিদ্বোৎসাহী প্রকাশ, ১৯৮৩ পৃ: ৯ ।

২. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, কলকাতা ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ১৯৯৫ পৃ: ২৬ ।

৩. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, কলকাতা, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা ১৯৮৫ পৃ: ৮ ।

৪. বাসুদেব দাশগুপ্ত, রন্ধনশালা গল্প, রন্ধনশালা, কলকাতা, বিদ্বোৎসাহী প্রকাশ, ১৯৮৩,পৃ: ১ ।

৫. বাসুদেব দাশগুপ্ত, বমন রহস্য গল্প, তত্রৈব পৃ: ৩৩ ।

৬. অমিতাভ দাশগুপ্ত, ক্ষুধার্ত তরুণদের গদ্য তা তজ্জাতীয় কিছু, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃ. পত্রিকাটি পৃষ্ঠা সংখ্যাহীন ।

৭. ক) বাসুদেব দাশগুপ্ত, বসন্ত উৎসব, রন্ধনশালা. কলকাতা, বিদ্রোৎসাহী প্রকাশ. ১৯৮৩, পৃ: ৪৫ ।

৭. খ) শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র. পাবলিকেশন, শিলিগুড়ি, ১৯৮৫, পৃ: ০২ ।

৮. দেবেশ রায়, বিলম্বিত সওয়াল, ক্ষুধার্ত পত্রিকা,কলকাতা, ১৯৭২-৭৩ পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই ।

৯. তদেব।

১০. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, কলকাতা, মহাদিগন্ত প্রকাশন সংস্থা, ১৯৮৫ পৃ: ৪৯ ।

১১. বাসুদেব দাশগুপ্ত, বাবা, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১৯৮৫ পৃ: ১১২-১১৩ ।

১২. বাসুদেব দাসগুপ্ত, খেলাধুলা, দন্দশূক পত্রিকা, চন্দননগর, ১৯৮১, পৃ: ২ ।

১৩. সুভাষ ঘোষ, আমার চাবি, দন্দশূক প্রকাশনী, চন্দননগর, ১৯৮৪, পৃ: ৪৪ ।

১৪. সুভাষ ঘোষ, যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট, হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, কলকাতা, কথা ও কাহিনী, ১৯৯৮ পৃ: ১৫৮।

১৫. তদেব, পৃ: ১৫৭ ।

১৬. ক) সুভাষ ঘোষ, নেশা কলোনী, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭ পৃ: ১ ।

১৬. খ) তত্রৈব পৃ: ১ ।

১৬. গ) তত্রৈব পৃ: ১৭ ।

১৭. তদেব পৃ: ১৭ ।

১৮. সুভাষ ঘোষ, গোপালের নয়নতারা, সেমিকোলন, শিলিগুড়ি, ১৯৯৩, পৃ: ৫৬ ।

১৯. সুভাষ ঘোষ, শীর্ষ অভিযান, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ: ৫৪ ।

২০. তদেব পৃ: ৫৫ ।

২১. তদেব পৃ: ৫৫-৫৬ ।

২২.তদেব পৃ: ৫৩ ।

২৩.তদেব পৃ: ৫৪ ।

২৪.তদেব পৃ: ২০ ।

২৫. তদেব পৃ: ১৯ ।

২৬. সুবিমল বসাক, গেরিলা আক্রোশ, জেব্রা বুকস, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ: ৫ ।

২৭. তদেব, পৃ: ৩০ ।

২৮. সুবিমল বসাক, আত্মার শান্তি দু-মিনিট, জেব্রা বুকস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ৬ ।

২৯. তদেব পৃ: ২৮ ।

৩০. তদেব পৃ: ৪৫ ।

৩১. তদেব পৃ: ৪৮ ।

৩২. সুবিমল বসাক, ছাতামাথা, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ: ১১ ।

৩৩. মলয় রায়চৌধুরী, ইস্তাহার সংকলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, কলকাতা ১৯৮৫, পৃ: ১৬ ।

৩৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র পাবলিকেশন, শিলিগুলি, ১৯৮৪ পৃ: ৭ ।

৩৫. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ: ১ ।

৩৬. মলয় রায়চৌধুরী, মৃত্যু মেধীশাস্ত্র : প্রথম ইনষ্টলমেন্ট ওরফে আমার জেনারেশনের কাব্য দর্শন, মলয় রায়চৌধুরী প্রকাশিত, পাটনা, ১৯৬৫ পৃ: ৪ ।

৩৭. সুভাষ ঘোষ /হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, কথা ও কাহিনী, কলকাতা, ১৯৯৮ পৃ: ১৫৮ ।

৩৮. সুবিমল বসাক, ছাতামাতা, গ্রাফিত্তি, কলকাতা, ২০০৫ পৃ: ৭ ।

৩৯. তদেব পৃ: ৪৭ ।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্যকৃতি

ক. মলয় রায় চৌধুরীর নাটক

১. ইল্লত

হাংরি সাহিত্য ধারায় নাটকের পরিমান অত্যন্ত কম হলেও তাদের কিছু বিশিষ্টতা আছে। হাংরি লেখকদের মধ্যে মলয় রায় চৌধুরী প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন। 'জেব্রা' পত্রিকায় ১৯৬৩ সালে তাঁর 'ইল্লত' নাটকটি প্রকাশিত হয়। এটি আকারে ক্ষুদ্র - দুই অঙ্ক বিশিষ্ট। আলাদা করে কোনো দৃশ্য বিভাগ নেই। প্রথম অঙ্কের শুরুতে যে মঞ্চ নির্দেশ আছে তা উচ্চকিত ও উৎকট। যেমন - মঞ্চের মাঝখানে দু মানুষ সমান উঁচু অর্থাৎ কমবেশী ১২ ফুট উঁচু একটি চারপায়া। ওরই দক্ষিণ দিকে বারান্দা যুক্ত একটি প্রাচীন সিংহাসন। মাটি থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে সিংহাসনের বাঁ দিকে। সিংহাসনের সামনের পায়া দুটো থেকে আরও দক্ষিণে একটি এক ফুট উঁচু বেদি সেটি গাঢ় লাল। ডান দিকে দুটি ঝুলন্ত দড়ি দৃশ্যমান। বোঝাই যাচ্ছে, মঞ্চ নির্দেশনা বাস্তবানুগ নাটকের অনুসারী নয়।

যাই হোক, এরপর নাট্যকার চরিত্রগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন। ছোটবড় মিলিয়ে এখানে চরিত্র সংখ্যা নয়টি। এরা হলো - ডোডোন, জম্বুক, রোমেশ, লোমেশ, ধঞ্জয় (ধনঞ্জয় নয়), রজন, ধূর্তক, টিকলু এবং গণেশ। ডোডোন রাজকীয় বেশে সিংহাসনে বসে নাক ডেকে ঘুমায়। ডান দিকের আবছা নীল বেদিতে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে জম্বুক। তার কাঁধে ঝোলানো পেট মোটা ব্যাগ। সিংহাসনের পায়াগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে রোমেশ ও লোমেশ। দু'জনেরই পোষাক ছিন্ন, অবিন্যস্ত, মলিন, বিসদৃশ ও উদ্ভট। দু'জনেরই গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রোমেশের পাকানো গোঁফ, মাথায় টাক। মাথায় স্বল্প কেশ কাঁচা পাকা, গোঁফ সম্পুর্ন সাদা।

লোমেশের গোঁফ নেই ; তবে চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে । মঞ্চের সামনের বাঁ দিকের কোণে গোল হয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারজন - ধঞ্জয়, রজন, ধূর্তক, টিকলু। ধঞ্জয় কোট পরিহিত যা এতো বেশী আঁটো যে , বোঝা যায় ছোট হয়ে গেছে । তবে চিকন জেল্লা রয়েছে । রজনের পোষাক ঢিলেঢালা । ধূর্তক ও টিকলুর পোষাক ও চেহারা সাধারণ , মাঝারিধরনের , নিষ্প্রভ । ডানদিকের দুটি মোটা ঝুলন্ত দড়ির মাঝখানের বিরাজমান ফাঁকের মধ্যে গনেশ পা ফাঁক করে পায়চারি করছে ।

বোঝাই যায় যে , নাট্যকারের এই প্রস্তাবনা অংশটি বাস্তববাদী নাটকের জন্য নয় । প্রতীকী বা অ্যাবসার্ড নাটকের উপযোগী । এখানকার মঞ্চোপকরণ বা চরিত্ররা সবাই এক একটি আইডিয়ার প্রতীক । এখানে রঙের প্রয়োগও অত্যন্ত সতর্কভাবে করা হয়েছে । এধরনের নাটকে বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় । এই নাটকে মলয় 'সিংহাসন' কে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন । সুতরাং ঐ বিশেষণ দুটি সুপ্রযুক্ত বলতে হবে । কেননা , যুগ যুগ ধরে অপ্রতিহত ভাবে তাতে কেউ বসে ক্ষমতা ভোগ করে চলেছে । সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের রূপান্তর পর্বেও তার কার্যকারিতা কমেনি ।

সিংহাসনের সামনের বাঁদিকের বেদিটি লাল এবং ডানদিকের বেদিটি যে আবছা নীল তার কারন দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থার পার্থক্য । সুতরাং আবছা নীল বেদিতে দন্ডায়মান অলস জম্বুক দক্ষিনপন্থী মোসাহেব বই কিছু নয় । সে স্থিতাবস্থার সমর্থক , সুবিধাভোগী । সিংহাসনের পায়াগুলিকে কেন্দ্র করে রোমেশ ও লোমেশকেও তো ঘুরতেই হবে । সাধারণ মানুষের প্রতীক তারা । রাজা বা মন্ত্রীর বা রাষ্ট্রের যে বৃত্ত তা থেকে সাধারণ মানুষের যুক্তি কোথায় ? ধঞ্জয় , রজন , ধূর্তক , টিকলু - এরাও সাধারণ মানুষ , সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছে । অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেনীর বিন্যাস মলয় প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এখানে করেছেন। গণেশ এই নাটকের 'প্রটাগনিষ্ট'। সেই একমাত্র সক্রিয় চরিত্র এ নাটকে। ডোডোন এখানে যেমন অনড়, অন্যেরাও তেমনি স্থাণু। গতিময় চরিত্র বলতে রোমেশ, লোমেশ ও গণেশ। নামেরও অনুপ্রাস আছে তাদের ।

প্রথম দুজন যেহেতু সিংহাসনের পায়াদুটোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ,তাই বলা যায় তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের খুব কাছেই আছে । হয়ত রাষ্ট্রের যান্ত্রিক কৌশলেরই তারা শিকার এবং বিভ্রান্ত। কিন্তু গণেশ ডানদিক থেকে নেমে আসা দুটো মোটা ঝুলন্ত দড়ির মধ্যিখানে , সিংহাসনের অনেকটা দূরে কিছুটা দৃপ্তভাবেই পায়চারি করছে । প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় পর্বেই নাট্যকার যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ তাদের মধ্যে রেখেছেন নাটকের পরবর্তী অংশেও তারই এক পরিণতি পর্ব রচিত হয়েছে ।
স্পষ্ট করে না বললেও ডোডোন এখানে রাজা । সে সিংহাসনে সমাসীন , রাজবেশধারী । প্রজা এবং রাজ্যের প্রতি তার কোনো দায় নেই । তাই নাক ডেকে ঘুমোনো । আবার সেই ঘুম থেকে উঠে সংলাপ " দেকচি সআবি ঠিকাচে "। ১
সে বলছে , -"মানুষকে এর আগে আমি এতো খুশী দেখিনি "। ২

ধঞ্জয় , রজন , ধূর্তক , টিকলু , জম্বুকেরা তাঁকেই সমর্থন করে । তাঁর সংলাপেরই অনুসরণ তাদের কণ্ঠে । ডোডোনের মধ্যে মলয় সামন্ত মানুষ এবং আধুনিক মানুষের যেন একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন । কখনও তাঁর কাব্যিক মেজাজ , কখনও চাষাড়ে গলা । সে মোসাহেবি যেমন পছন্দ করে তেমনই ব্যক্তির স্বাধীনতার কথাও বলে ; নানারকম আইনকানুনের কথা বলে । বলার পরে সবাইকে বলে সমর্থন সূচক হাততালি দিতে । জম্বুক তাঁকে সন্দেহের বিপরীতে বাতাসের আঁচ দেয় । ডোডোন বলে " হ্যাঁ , চাদ্দিকে চোক বুলিয়ে নাও দিকিনি (স্বগত) যা দিনকাল পড়েচে । সব ঠিক আচেতো ? " ৩ হাল আমলের অবস্থা দেখে নেবার আদেশ জম্বুকে দিয়ে ডোডোন আবার নাক ডাকতে শুরু কর । যেমন একজন আধুনিক শাসন কর্তা - আমলাদের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত বোধ করে ।

এরপর গণেশের সংলাপ । সে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রবক্তা । মৌলিক অধিকারের দাবিদার । শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও তার কাছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক । তবে একনায়কতন্ত্রেরও বিরোধী সে । শিল্প , সাহিত্য সংস্কৃতি সর্ব ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা গনেশ বলেছে তাতে মানবাত্মা, বুক্তের রক্ত ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি এসেছে । মনে হয় , একধরনের সদর্থক ব্যাক্তি স্বাধীনতার কথাই সে বলে ।

কিন্তু গনেশ যেহেতু যতিচিহ্নহীন এবং স্বাভাবিক অন্বয়হীন বাক্যে কথা বলে তাই তার ভাষায় দুটি তত্ত্বগুণ আসে : ১ - প্রবহমানতা ২ - সামঞ্জস্যহীনতা । তার অস্ফুট ও অর্ধস্ফুট কথা থেকে পাঠককেই অর্থ অনুমান করে নিতে হয় ।গনেশের লেকচারে জম্বুক চমকে ওঠে, ডোডোনও ইতিমধ্যে জেগে ওঠে । যদিও গনেশের উপস্থিতি টের পায়না । আবারও ঘুমিয়ে পড়ে । পুনরায় গনেশ বকতে শুরু করে । এবার তার বক্তব্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের দু'একটি ঝলক লক্ষ করা যায় । যেমন , " উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখো।তাতিয়ে রাখো কুড়ি বার্ষিকী বৃষ্টি উন্নয়ন আকাশ খাঁ খাঁ করছে মানুষের দুঃখ বিলাসের কাছে .....।"৪

এছাড়া "আমলাতন্ত্র" জনসাধারনের কণ্ঠরোধ , কোমড়রোধ , "নানান আইনকানুন নিয়মের আওতায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নানান আইনকানুন নিয়মপ্রনালী কোড সেসনের আওতা "৫

ইত্যাদি প্রসঙ্গও এসেছে । গণেশের বক্তৃতার প্রভাব পড়ে রোমেশ ও লোমেশের উপর । এতক্ষণ তারা সিংহাসনের পায়াগুলিকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল। এবার কথা বলতে শুরু করে ।বলে , দশদিক জাগিয়ে তুলতে হবে , বিপ্লব, বিক্ষোভ ,আন্দোলন করতে হবে । যদিও তাদের কণ্ঠস্বরে বাচালতা ও লঘুতার স্পর্শ আছে , তবু আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার নানা সংকটের প্রতিছবি মেলে সেখানে । যেমন :-

লোমেশ ।। .....জয় করতে হবে পৃথিবী। রোমেশ ।। যন্ত্রণাজর্জর সমস্যাসংকুল মানুষকে ।

লোমেশ ।। উৎপাদন শক্তির দাস মানুষকে (নীরবতা) মানুষের দাস উৎপাদন শক্তিকে ।

রোমেশ ।। শক্তির দাস সমাজকে ।

লোমেশ ।। সমাজের দাস মানুষকে ।

রোমেশ ।। দ্বন্দের দাস মানুষকে ।

লোমেশ ।। মনুষ্যত্বের দাস মানুষকে।৬

লোমেশ এখানে মুক্তির কথা বলেছে । সে চায় " উত্তাল মানুষ সাগর ধাপে ধাপে মানুষ নতুনতর ইতিহাসের নায়ক হবে "।৭

লোমেশ নিজেও সেই নায়ক হতে চায় নাকি ? বলে , " আর আমি নেতা । লোকে বলবে মহান লোমেশ"(সমগ্র মঞ্চ ঘুরতে থাকে গটমট করে । গণেশের কাছাকাছি এলে আচমকা দাঁড়িয়ে যায় ··। ভাবে। মাথা নাড়ে । ভাবে। দৌড়ে ফিরে যায় রোমেশের কাছে ।) বলে ,- " কিন্তু আমি তো বক্তৃতা দিতে জানি না।"৮

রোমেশ তাকে বক্তৃতার কেতা শেখায় । তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে । এমনি সময়ে মঞ্চে চারজন ব্যক্তি লাল , নীল , হলুদ , সবুজ রঙের কৌপীন পরা - ঢুকে পড়ে । মঞ্চের এক পাশ থেকে অন্য পাশে কৌণিকভাবে প্রস্থান করতে থাকে । দু'বার তারপর একযোগে সা - ব - ধা - ন বলে চেঁচিয়ে উঠে । এদের প্রবেশ মুহূর্ত থেকেই মঞ্চে চাঞ্চল্য দেখা দেয় । ডোডোন নাক ডাকা থামিয়ে উঠে পড়ে । সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসে । তাড়াতাড়ি জম্বুকের কাছে অধৈর্যের মতো দাঁড়ায় । নিজের সমস্ত পোষাক দ্রুত খুলতে থাকে । জম্বুক তার নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে এক প্রস্থ সামরিক পোষাক বার করে দিলে , ডোডোন তা দ্রুত পরে নেয় । জম্বুক ডোডোনের পরিত্যক্ত পোষাকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পোরে। নতুন পোষাক পরে ডোডোন মঞ্চময় কুচকাওয়াজ করে বেড়াতে থাকে ও মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে শ্যালুট করতে থকে । জম্বুক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে । ধঞ্জয় ও রজন সিংহাসনের পায়ের কাছে গিয়ে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে । রমেশ ও লোমেশ আগে যেদিকে ঘুরছিল তাঁর উল্টোদিক দিয়ে ঘুরতে শুরু করে । সাধারণ মানুষের অবস্থান যেমন হয় আর কি! রমেশ ও লোমেশ , ধূর্তক আর টিকলু তাদের মুখগুলো এক জায়গায় এনে গোপন আলোচনার ভঙ্গী করে , পরক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়ায় । গণেশের অবস্থান পূর্ববৎ থাকে । কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে কৌশলধারীদের দ্রুত আনাগোনা আগাগোড়া চলতে থাকে ।

আসলে গণেশের যে আদর্শবাদ ও তাত্ত্বিকতা - তাঁর প্রভাব স্তিমিত । মানুষের চিন্তা-চেতনাকে তা প্রভাবিত করে , সক্রিয় তত করতে পারে না । বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী মানুষকে । এখানে গণেশ ছাড়া সকলেরই সাজ - পোষাকের বর্ণণা দেওয়া হয়েছে । ডোডোন ছাড়া সকলেরই পোষাকে মধ্যবিত্তের স্তরগুলি দ্রষ্টব্য ।

রোমেশ ও লোমেশের পোষাক ভিখিরি বা ভবঘুরেদের মতো। গণেশের পোষাকের বর্ণনা নেই, তবে সে তাত্ত্বিক এবং একজন সংগঠক। নানারঙের কৌপিন পরা, চারজন মানুষ মঞ্চে আসতেই গোটা পরিবেশ পাল্টে গেছে। তাদের উচ্চনাদী সাবধান ধ্বনিতে দৃপ্ত পদচারণায় মঞ্চের মধ্যে আলড়ন পড়ে যায়। মলয় সম্ভবতঃ বলতে চেয়েছেন, নোংরামী (ইল্লত) দূর করতে হলে, নোংরামীপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টাতে গেলে এইরকম তত্ত্ব নিরপেক্ষ নিঃস্ব (কৌপিনধারী) বলিষ্ঠ ত্যাগী মানুষেরই প্রয়োজন। তত্ত্ব নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক দলমতহীন সমস্ত বিদ্রোহী মানুষকেই নোংরামী দূর করতে প্রয়োজন। এ কারণে ওদের কৌপিনের মধ্যে মূল সব রংগুলি আছে - লাল, নীল, হলুদ, সবুজ।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্যবর্ণনা পূর্বেকার মতই,শুধু কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ডোডোন এখানে সিংহাসনের বারান্দায় সামরিক পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। স্যালুটের ভঙ্গীতে। জম্বুক নীল বেদি পাল্টে লালটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধঞ্জয় ও রজনের স্থানে চলে গেছে রোমেশ ও লোমেশ এবং ধঞ্জয় ও রজন চলে এসেছে রোমেশ ও লোমেশের স্থলে। সুতরাং সিংহাসনের পায়াগুলোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তারাই। গণেশের অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। বস্তুত, রোমেশ ও লোমেশের মধ্যে সচেতনতার জাগরণ ও চার কৌপীনধারীর ঘোষধ্বনি ডোডোনকে সতর্ক করে তোলে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। তাই রাষ্ট্রের জন্যই তার এই সামরিক পোষাক পরিধান। প্রথম অঙ্কের শেষে নাটকে যে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তারই ফলে দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুটা হয় অন্যরকমভাবে। ডোডোনের মার্চপাস্টে ভুল হয়, তবু সে কুচকাওয়াজ করে। মার্চ করেই সিঁড়ি বেয়ে নামে এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে। সিংহাসনে ওঠে। সে সিংহাসনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ধঞ্জয়, রজন এবং গণেশ ছাড়া সবাই কুচকাওয়াজ করতে থাকে। সবাই যেন তটস্থ। ডোডোন যখন বলে ''সঅবি দেকচি ঠিকাচে''।৯

তখন তটস্থতা ত্যাগ করে কুচকাওয়াজকারীরা সহজভাবে দাঁড়ায়। জম্বুক, রোমেশ, লোমেশ, ধূর্তক, টিকলু একবাক্যে সমর্থন করে ডোডোনকে। আসলে রোমেশ ও লোমেশ তাৎক্ষণিক ভাবে গণেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল।

কিন্তু তথাকথিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আবার পূর্বতন মানসিকতায় অসহায়ভাবে ফিরে গেছে । ডোডোন যেহেতু স্তাবকদেরই কেবল দেখতে ও শুনতে পায় কিংবা বেশি সংখক মানুষের সমর্থন লাভ করে তাই নিশ্চিন্তবোধ করে । অথবা পরোয়া করে না । গণেশের সুদীর্ঘ বিদ্রোহী বক্তব্য তার ভালও লাগে না । জম্বুক ডোডোনকে সঙ্গত দেয়,-

কোথা থেকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি যেন !
মেরে অ্যাগবারে ঠান্ডা করে দেবো গুজুর
গুজুর ফিস ফিসানি করলে কেউ !ওসব
এখানে চলবে না ।১০

ডোডোন জম্বুককে বলে , 'ধুল ধাবড়ি উড়িয়ে দেবার কথা বলো' ।১১

জম্বুক শুধু ডোডোনের হুকুম আমিল করে না , সে বলে , 'ঘুম পাড়ানির অক্লান্ত যোদ্ধা আমরা । ঠেঙিয়ে তক্তা ফাটিয়ে দেবো কেউ আমাদের ঘুম ভাঙালে '।১২

এই উক্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যে অসাড় স্থাণুত্ব তারই প্রতি সে ইঙ্গিত করে । রাষ্ট্রনায়কেরা কিন্তু এই স্থবিরতাকে টিকিয়ে রাখতে চায় । একদিক থেকে তা মানুষের আর্থক ও আত্মিক অবরোধের অন্যরূপ । ক্ষমতায় থাকতে গেলে স্থবিরতা বজায় রাখা প্রয়োজন । ডোডোন বলে ,

আমি - মানেইয়ে - আমারই হলুম কি বলে গিয়ে
জাতির প্রাণসত্তা । আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন কোল্লে
চোটকিয়ে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো ।১৩

জম্বুককে নির্দেশ দেয় -'দেকো দিকিনি কেউ কোতাও মামদোবাজী কচ্ছে কিনা '? ১৪.
তারপর ঘুমোবার জন্য তৈরী হয় । এরপর অবশ্য ডোডোনকে আর কথা বলতে দেখা যায়নি ।ডোডোনের মতই গণেশের উপস্থিতিও নাটকে স্বল্পস্থায়ী । তারপর তারও কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি । এটাও তাৎপর্যপূর্ণ । গণেশ শব্দের অর্থ - গণের রাজা বা নেতা ।

এই গণেশ নেতা না হলেও জনগণের একজন প্রতিনিধি তো বটেই । মঞ্চে এই সর্বহারা মানুষটি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ উগড়ে দিয়েছে । আমলাতন্ত্র , আইনি কণ্ঠরোধ , দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতা সব কিছু নিয়েই গণেশর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ । খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতিবাদ স্বল্পস্থায়ী । গণেশের কণ্ঠ স্তিমিত হতে হতে নিভে যায় । রাষ্ট্রযন্ত্র তার কায়েমী ভূমিকা পালন করে । কিন্তু ততক্ষণে গণেশের ভূমিকা পালন শেষ । রোমেশ ও লোমেশকে সে অনুপ্রাণিত করে ফেলেছে । গণেশই নাটকের মধ্যে স্পষ্টভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য , ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলেছে । বলেছে যুক্তিবাদ ও আলোক প্রাপ্তির কথাও । সেদিক থেকে গণেশ নাটকের প্রটাগনিষ্ট বটে । ডোডোন আর গণেশের উল্লেখ নাটকে পরে না থাকলেও তারা যে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে উপস্থিত ছিল । তা অনুমান করা যায় । কেননা , এদের নিষ্ক্রমণের কথাও বলা হয় নি । তাদের যে নিষ্ক্রমণ নেই , তার কারণ বৃহৎ সমাজ পট থেকে কেউ নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না । তবে তারা নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে । তাই তারা অনুপস্থিত বা ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরের মানুষ হিসাবে তাদের অস্তিত্ব এখানে অননুভূত ।

প্রথম অঙ্কে , যেমন রোমেশ ও লোমেশ গণেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শেষ পর্যন্ত কথা বলে গেছে , দ্বিতীয় অঙ্কেও তেমনই ধঞ্জয় ও রঞ্জন শেষ পর্যন্ত কথা বলে গেছে । বিবিধ ইজম্ ,শিল্প ,সাহিত্য , সংস্কৃতি ,মানব সভ্যতার বিবর্তন , বিচার ব্যবস্থা , ব্যক্তিগত জীবনের গতানুগতিকতা , ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি সবই তাদের বক্তব্যের বিষয় । এসব কথাবার্তার মধ্যেই ডোডোন ঘুমে আড়মোড়া ভাঙে , নাক ডাকায় । অর্থাৎ এসব নিয়ে তার কোন চেতনা কাজ করেনা । এই সময় আকস্মিক প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে । বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ে । গ্রেনেড , মর্টার , রাইফেল গর্জে ওঠে । উপর্যুপরি বিস্ফোরণের মধ্যে যখন ধঞ্জয় ও রজন এগুলির জন্য পা বাড়ায় , তখনই সেই চার রঙের কৌপীন পরা চার ব্যক্তি মঞ্চের এপাশ থেকে ও পাশ কোণাকুনি প্রবেশ-প্রস্থান করে । বিভিন্ন রঙের আলোর বিচ্ছুরণ ও বিলয় ঘটে । ঐ চারজন চেঁচিয়ে ওঠে - সাবধান - ; নাটক শেষ হয় ।

লক্ষণীয় , যে বিস্ফোরণ ঘটেই । সামাজিক শৃঙ্খলার একটা ভাঙন ঘটেই । এ হয়তো বিপ্লব নয় , কারণ সামগ্রিক পরিস্থিতি এতে পাল্টে যায় না । বিপ্লব খুবই কঠিন - নাট্যকার তা দেখালে বাস্তবোচিত হত না ।

ধঞ্জয় ও রজন গনেশ দ্বারা যতই উদ্বোধিত হোক - যথার্থ বিপ্লব ঘটানোর ক্ষমতা তাদের নেই । এই মধ্যবিত্ত চরিত্র দুটির পোষাক আশাকও ইঙ্গিত পূর্ণ । ধঞ্জয় কোট পরিহিত । কোট এত বেশী আঁটো যে , চিকন জেল্লা সত্ত্বেও হাস্যকর । রজনের পোষাক সমস্তই ঢিলেঢালা মধ্যবিত্তের সামঞ্জস্যের অভাব জীবনযাত্রা ও জীবনসাধনা দু'ক্ষেত্রেই- এমনটাই হয়তো নাট্যকার বলতে চান । তবুও বিপ্লব তথা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । রজন ও ধঞ্জয় সেই ভূমিকাই পালন করে । তাদের সঙ্গে শেষে লাল , নীল , হলুদ , সবুজ রঙের কৌপীন পরা , উদোম গা চারজন মানুষের দৃপ্ত আবির্ভাব নাটকটিকে একটি আলাদা মাত্রা দেয় । এর সঙ্গে মেশে নানা রঙীন আলোর বিচ্ছুরণ ও চারজনের সাবধান বানী । এটা যেন এক ধরনের খেলা । সমস্ত নাটকে প্রাতিষ্ঠানিকতার একটি স্থান রূপ রচনা করে তার বিপরীত ক্রমে সেই প্রতিষ্ঠানিকতাকে ভেঙে ফেলার একটা খেলা যেন ।

আসলে এই ধরণের নাটকের এটাই বৈশিষ্ট্য । তবে, প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলার পর তাকে আর একটা রূপ দেবার সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় বোধের অভাবও নাট্যকারের রয়েছে । ডোডোনের রাজার পোষাক যেমন প্রয়োজনে সামরিক পোষাক হয়ে যায় - পুলিশ আর মিলিটারির আবির্ভাবে , তেমন কোনো রূপান্তরের ছবি জনতার মধ্যে নেই । আসলে প্রতিষ্ঠানের রূপ ফুটিয়ে তোলায় মলয় যতটা সার্থক , তার রূপান্তর বা ধ্বংশের চিত্রায়নে ততটা নয় ।

নাটকটির ভাষার মধ্যে কলকাতার উপভাষা যেমন আছে , তেমনই আছে তৎসম শব্দের আড়ম্বর । জম্বুক ও লোমেশের ভাষা পাশাপাশি রাখলেই তা বোঝা যায় যেমন জম্বুকের সংলাপ :'আট্টু দেকুন তালে । কতোদূর এয়েচি দেখে থ হবেন অ্যাগবার।'১৫

লোমেশ : 'ভাইসব আমার চিত্তদাহ সমগ্র মানবের পক্ষে ..... মানুষের দুর্মানবিক কু ন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ '। ১৬

এছাড়া সংলাপ দীর্ঘ , পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ বাক্যে কোনো যতিচিহ্ন নেই ।বাকপটু চরিত্রগুলো টাইপ ও একরৈখিক । আকস্মিকতা , দ্বন্দ্ব , আবেগ নয় , পুতুল চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে নিজস্ব বক্তব্যপ্রেক্ষণই লক্ষ নাট্যকারের । তবু ১৯৬৩ সালে ভারতবর্ষে যখন প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধেনি , তখন এই বিদ্রোহের আঁচ , প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার সুরটি এ রচনায় তুলে ধরার জন্য ইল্লত-এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে ।

২. হিবাকুষা

'হিবাকুষা' নাটকটি আরও ক্ষুদ্র । অঙ্ক বা দৃশ্য বলে কোনো নির্দেশিকা নেই । এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে । তবে মঞ্চের যে বর্ণনা আছে তাতে বাহুল্য ও অভিরঞ্জন বেশি । হয়তো নাট্যকার অতিরিক্ত তত্ত্বপ্রবণ হবার ফলেই এটা ঘটেছে। মঞ্চের মাঝখানে চৌকাঠসুদ্ধ একটা বন্ধ দরজা আড়াআড়ি ভাবে রাখা । দরজার কপাট দুটো ডানদিকের উইংসের দিকে মুখ করে খোলা যায় । খাপচা খাপচা আলো যেখানে সেখানে । ডানদিকে , একটা বিরাট টেবিলের পাশে নিচু চেয়ারে বসে আছে ষাভ । খালিগা , পরনে হাফপ্যান্ট । টেবিলে বা কোণে একটা জাহাজের চোঙ লাগানো । ষাভ বেঁটে , মোটা , প্রৌঢ় । তার পায়ে গামবুট । দুই হাঁটুতে দুটো খঞ্জনী বাঁধা । দু'হাত দিয়ে রুটি খাচ্ছে সে । খাওয়া শেষ হলে টেবিলের উপর থেকে রুটির টুকরো ও গুঁড়োগুলোকে সে ঝাড়তে থাকে । নিচে থেকে চারজন নোংরা শতচ্ছিন্ন পোষাকের হাফন্যাংটো লোক ডানদিক থেকে মাটি শুঁকতে শুঁকতে হামাগুড়ি দিয়ে মঞ্চে ঢোকে । হাত দুয়েক অন্তর ফাঁক রেখে একটা মোটা দড়িতে তাদের কোমর বাঁধা । রুটির টুকরোগুলো মেঝে থেকে খুঁটে খায় তারা , কাড়াকাড়ি করে । ষাভ তাদের হাত নেড়ে তাড়ালে তারা সরে যায় , একটু পরে আবার খেতে আসে ।

নাট্যকার তাদের আচরনে জন্তুর স্বভাব লক্ষ করেছেন । ষাভ আবার তাদের তাড়ালে তারা চলে যায় । এবার বাঁদিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢোকে শ্বস , লম্বা চওড়া , জোয়ান। ষাভের ছেলে । কান দুটো তার বিশাল - প্রায় মুখের মাপের । মাথায় তার বিচারকদের পরচুলা । বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে কলিং বেল খোঁজে । খুঁজে পেলে বাজাতেই জাহাজের ভোঁ বাজে । ষাভ চমকে ওঠে , জাহাজের চোঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে , হাত ঢুকিয়ে দেখে । ষাভ আবার একই ভাবে ভোঁ বাজায় । ষাভ দরজার ফুটো দিয়ে দেখে , দাঁড়িয়ে ভাবে । তারপর ফ্রেমের সামনে গিয়ে ঘুরে গিয়ে শ্বসকে দেখতে পেয়ে আনন্দে দু'হাত তুলে লাফিয়ে ওঠে , দরজা খুলে দেয় ।

এই নাটকে সাতটি চরিত্র । অর্থনীতির স্তর এখানে দুটি। ষাভ, শ্বস ঢপকে একটি স্তরে ফেলা যায় - মধ্যবিত্তের স্তরে । দড়ি বাঁধা লোকরা বিত্তহীনের দলে ।

লেলিন যাঁদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'শিকল ছাড়া তাদের হারাবার কিছু নেই।' এই দুটি স্তরের মধ্যে দ্বন্দ্ব না হলেও শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত দলটি বিত্তহীনের দলে যোগ দিয়েছে। এখানে ভিন্ন যে স্তরটি নাট্যকার উপস্থিত করেছেন তা প্রজন্মের ব্যবধান গত। পুরনো প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে যাভ ও ঢপ। নতুন প্রজন্মের শ্বস। পিতা হিসাবে যাভ পুত্র শ্বসের প্রতি স্নেহশীল। পুত্রের জিজ্ঞাসাকাতর মননের জন্য বিশেষত ঐ সব জিজ্ঞাসার রেফারেন্সগুলির জন্য যাভ বিশেষ গর্ববোধ করে। ইতিমধ্যে ঢপ প্রবেশ করে। নিজের পরিচয় সে দেয় জাতীয়তাবাদী খবরকার বলে। অর্থাৎ স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের সে সমর্থক। ঢপের আগমনের পর যাভ তাকে সমর্থন করে। ঢপ বলে, আমরা গুরুজন। এবং যার বয়স বেশি, তার কথা শুনবে। ঢপ ধনী ও বিদ্বান মানুষকেও সমীহ করতে বলে। যাভ বলে, বলবানের কথা শুনতে হয়। শ্বস অবশ্য এসব কথায় মজা পায়, বলে, যার হাত পা বেশি, যার নখ, লোম - দাড়ি বেশি তার কথাও কি শুনতে হবে? লক্ষণীয়, ঢপ ও যাভকে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠে। যাভ গর্বিত ভাবে জানায় 'এসব আমাদের সংস্কার'।১৮

ঢপ 'জানায় - আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য'।১৯ দু'জনের মধ্যে এই ঐতিহ্যের সময়কাল নিয়ে বিতর্ক শুরু হতে শ্বস নীলামওয়ালার ধাঁচে টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে তাদের মদত দেয়। আমাদের প্রাচীনতা, রেনেশাঁস, বল্লাল সেন, সেন রাজত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে খোটা দেয়। এস্টাবেলিসম্যান্টের বিরোধিতা করে লঘু ভঙ্গীতে। হয়ত সেজন্যই বাকী দু'জনের সঙ্গে করমর্দন ও নৃত্য করতেও তাকে দেখা যায়। যাভ ঐতিহ্যশালী সভ্যতার জন্য গর্ববোধ করে। তার পুরনো পন্থী, রক্ষণশীল মানসিকতাকে সঙ্গত দেয় ঢপ : বলে, 'আমাদের উন্নতি সবচে উঁচু'। ২০

শ্বস বলে, উন্নোতি ; গাদা গাদা টাকা।

যাভ বলে, তালতাল সোনা।

শ্বস বলে, খেতাব।

যাভ বলে, সেলাম।

শ্বস বলে, হারেম----কুলীন-----অবিবাহিত কিন্তু স্ত্রৈণ।২১

এভাবে তিন জনের সংলাপে আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক রূপের একটা স্থূল ছবি ভেসে ওঠে । লক্ষ করবার যে, এই অংশে তিনজনই সমালোচকের ভূমিকায় । তাদের মধ্যবিত্ত চরিত্র একেবারে স্পষ্ট এভাবে, জীবনের তিক্ততার অভিজ্ঞতায় তিনজনই সমান । যান্ত্রিকতার যন্ত্রণায় তিনজনেই ক্লিন্ন। ঐতিহ্যবাদী ঢপকে বলতে হয় - 'কল্যানময় সাহিত্য আর সুস্থতাবর্ধক কবিতার আশার বানী দিন।' ২২ কিন্তু শ্বসের কথায় ত্রয়ীর ঐক্য ভেঙে যায় । সে আচমকা বলে , 'খিদে! অ্যাঁক'? ২৩

ষাভ তাকে বলে , 'এ সব ভাল নয়।' ২৪

চপ বলে , 'এ সব অসামাজিক দাবীদাওয়া।'২৫

শ্বস অবশ্য তার স্থানে অনড় । তাকে চুপ করে থাকতে বলে দেওয়া হলে সে প্রকৃতির লীলাখেলার কথা বলে । মহান অতীত কিংবা সোনালী ভবিষ্যতের কথা বলে শ্বসকে নিরস্ত করা যায় না । সে শুধু এই ক্ষুধাময় বর্তমান ও প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাবিলাসকে বড় করে দেখায় । নাট্যকার ক্ষুধার সংক্রমনকেই বড় করেও দেখান । যেহেতু এই মুহূর্তে মঞ্চে সেই দড়ি বাঁধা চারজন লোক মাটি শুঁকতে শুঁকতে ঢোকে এবং ষাভ ও ঢপ হামাগুঁড়ি দিয়ে দড়ির বাড়তি অংশে তৈরী করা ফাঁসে নিজেদের গলা ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের মত করেই হামাগুঁড়ি দিতে দিতে বেরিয়ে যায় । শ্বস অবাক হয়ে এইসব দেখে । জাহাজের ভোঁ বাজতে থাকে । শ্বস জাহাজের চোঙে প্রথমে হাত ঢোকায় পরে নিজের মাথাটাই । জাহাজের ভোঁ থেমে থেমে নানান সুরে বাজতেই থাকে । মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে। নাটক শেষ হয় ।

'হিবাকুষা' নাটকটির অতিরঞ্জনই - এর বৈশিষ্ট্য ।নিকল বলেছিলেন, 'অতিরঞ্জন প্রহসনের ধর্ম।' ২৬

অথচ এ নাটকটি প্রহসন নয় । ষাভের পায়ে কেন গামবুট , হাঁটুতেই বা কেন খঞ্জনী বাঁধা তা স্পষ্ট নয় । মঞ্চের মাঝখানে আড়াআড়ি যে বন্ধ দরজাটি রাখা ছিল সেটি শ্বস ও ষাভের দুই পৃথিবীর একটি বিভাজক মাত্র ।

তাই ঐ দরজা খুলে শ্বসকে ষাভ তার জগতে নিয়ে এসেছিল । জাহাজের চোঙ্ যন্ত্রের নির্দেশক হতে পারে , হতে পারে সুদূরের বার্তাবহও । নাটকের শেষে দেখি ষাভের,ঢপের ঐতিহ্যবাদী পুরনো প্রজন্ম ক্ষুৎকাতর মৃত্তিকানিষ্ঠ জান্তব মানুষদের দলে ভিড়ে গেছে । শ্বসের যে তত্ব তাকে আত্তীকরণ করেছে । যদিও শ্বস তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে না । যন্ত্রের সঙ্গেই তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে ।

৩. ন পুং পং

মলয় রায় চৌধুরীর তৃতীয় নাটক 'ন পুং পং' ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। আর্থার আদামভের 'লে পিং পং' নাটকের সঙ্গে এর নাম সাদৃশ্য কিছুটা রয়েছে । অ্যাবসার্ড নাটকের ইতিহাসে 'লে পিং পং' কে মাষ্টারপিস বলা হয় । লক্ষণীয় , আদামভের নাটকে দুটি চরিত্র , মলয়ের নাটকেও তাই । যদিও মলয়ের নাটকের চরিত্র দুটি মানুষ নয় । যন্ত্র এবং মানুষ ও জন্তুর সমন্বয় । আদামভের নাটকে যন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ন , ফ্লাশ লাইটের ব্যবহারও তিনি করেছেন সেখানে । দেখিয়েছেন , Man engazed in purposeless exertions , in a futile frenzy of activity that is bound to end in senility and death ২৭.ক

মলয়ের নাটকেও যন্ত্র তার ব্যাপকতায় উপস্থিত ।ফ্লাশ লাইটের ব্যবহার তিনিও করেছেন প্রচুর।'Purposeless exeretions' এবং 'futile frenzy of activity' এখানেও মূল প্রতিপাদ্য । তবে মলয়ের নাটকটি এত ছোট যে , এটিকে একটি কবিতাও বলা যায় । তদুপরি বক্তব্য ও বর্ণনার অতিরেকে ভারাক্রান্ত । সুতরাং আদামভের শৈল্পিক মূল্যের ধারে কাছেও এটিকে রাখা যাবে না । তবে হাংরিজেনারেশনের প্রতিবাদী মনোভাব ও যৌন আনুষঙ্গিকতা এখানে সুপ্রচুর । যীশুখ্রীষ্টের একটি বাণী দিয়ে নাটকের শুরু ।

যে আমার মধ্যে নেই বা সঙ্গে নেই , সে - ই আমার বিরোধী । (He who is not with me is against me) অন্ধকারে ফেউ - এর কান্না , ঝিঁ ঝিঁ ও তক্ষকের ডাক , ভারী জুতার চলা ফেরার আওয়াজ । এভাবে কালবেলার একটি অশুভসূচক পরিবেশ রচনা করা হয়েছে ।

মঞ্চে স্বল্প আলোয় টোরসোকে দেখা যাচ্ছে - বাঁ দিকের কোনে মুষ্টিযোদ্ধার রিঙ , উপর থেকে ঝুলছে তালিম নেবার বস্তা । রিঙের মধ্যে স্ত্রীলোকের টোরসো দেখতে মোম মোম হলেও আদতে কাঠের । টোরসো'র স্তন দুটিকে ঢাকনির মতন বোঁটা ধরে বাইরে থেকে খোলা যায় আর লাগানো যায়। টোরসো তার ইচ্ছেমত যে কোন স্তনের ভিতর থেকে বা যোনির ভিতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ , পুরুষ কণ্ঠ বা পশুকণ্ঠে কথা বলতে পারে । মঞ্চের অন্ধকার সরিয়ে যখন সরাসরি কটকটে রোদ্দুর নিয়ে আসা হলো তখন য়লমের প্রবেশ । য়লম একেবারে ন্যাংটো । যখন য়লম অশ্লীলতা পছন্দ করে না , তখন ক্রিকেট খেলোয়ারদের অ্যাবডোমেন গার্ড পরে । বসন্তকালে য়লমের পেছনদিকে শেয়ালের লেজ গজায় । তার দুহাতে মুষ্টি যোদ্ধার দস্তানা । ডানদিকে কমোডের উপর বসে সে ভাবনাকাতর।

এ নাটকে প্রথম সংলাপ টোরসোর। সে জিজ্ঞাসা করে যে য়লম এতক্ষণ কোথায় ছিল ? যাহোক , এরপর য়লম মুষ্টিযুদ্ধের অনুশীলন করে নানান কায়দায় । কখনও তাড়াতাড়ি, দমাদ্দম, কখনও আলতো। টোরসো কিন্তু তাকে তাচ্ছিল্য করে । বস্তাটা নীচে নেমে আসে । য়লম হাওয়ায় ঘুষি চালিয়ে নানান পায়তারা কষে । বস্তার উপর ঘুষি কসাবার জন্য তৈরী - হয় । হঠাৎ টোরসের বাঁদিকের স্তনের ঢাকনি খসে পড়ে । একটা রোমশ হতে বেরিয়ে আসে স্তনের ঘুলঘুলির ভিতর থেকে । হাতটা য়লমের গালে কষে থাপ্পর জমায় । য়লম ছিটকে পড়ে যায় । রোমশ হাত টোরসোর ভিতর গায়েব হয়ে যায় । টোরসো তাকে উঠে বসতে বলে । য়লম উঠে দাঁড়ায় । তার দুই কষ দিয়ে মধু গড়ায় । স্তনের ঢাকনিটা হাতে নিয়ে সে টোরসার দিকে এগিয়ে যায় । চেঁচিয়ে বলে সেটা সে টোরসাকে লাগিয়ে দেবে কিনা ? এবার টোরসোর ডানদিকের স্তনের ঢাকনি খুলে যায় এবং সেখান থেকে একটি ডান্ডা বেরিয়ে এসে য়লমের মাথায় পড়ে ।

য়লম মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়ে যায় । টোরোসো বলে , নিরক্ষর , শালা । দু'হাতে স্তনের ঢাকনি নিয়ে য়লম উঠে দাঁড়ায় । মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় । শুধু দুই স্তনের ঘুলঘুলি (কেননা ঢাকনি নেই) আর যোনির ভিতর দিয়ে নীল রোম্যান্টিক আকাশ দেখতে পাওয়া যায় । মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে । মঞ্চে য়লম নেই । কিছুক্ষণ পরে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে য়লম প্রবেশ করে । ঢাকনি দুটো মেঝে থেকে তুলে টোরসের বুকে লাগিয়ে দেয় । চারদিকে অভিবাদন করে ।

তারপর বস্তাটাকে ঘিরে নানান মস্তানি প্যাঁচ ছুঁড়তে থাকে হাওয়ায় । সব দাঁও ফসকে যায় । পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় প্রতিটি ঘুষি । য়লম হাঁপিয়ে পড়ে । ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কমোডের উপর গিয়ে উবু হয়ে বসে গালে হাত দিয়ে দার্শনিকের মত ভাবতে বসে । পরে কিছুক্ষণ বকে । বলে ব্লাফ রাত্তিরটা থাকবো । এরপর মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় - শোনা যায় নানাধরনের শব্দ । কাঁচের বাসন ভেঙে পড়বার , পৃথিবীর সমস্ত নেতাদের বক্তৃতাধ্বনি , ঝড়ের শিস , মাদি শেয়ালের মড়া খাওয়ার হুহুক্কা হুয়া আনন্দধ্বনী ইত্যাদি । টোরসোর যোনির ভিতর থেকে তীব্র সার্চলাইটের আলো মঞ্চের উপর য়লমকে খুজে বেড়ায় , খুঁজতেই থাকে , নাটক শেষ হয়ে যায় ।

নারী নামক আইডিয়াটিকে মলয় এখানে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন । তাই স্ত্রীলোকের পূর্ণাবয়ব নেই , আছে টোরসো তাও কাঠের, কিন্তু দেখতে মোমের মত কোমল । তার মাথা নেই । তার স্তন দুটিও ফাঁকা গহ্বর মাত্র । কণ্ঠস্বরেও সে কখনো পুরুষ , কখনও নারী , কখনও বা জানোয়ার । সে স্বাধীনচেতা , কর্তৃত্বপরায়ণ । যখন তখন য়লমকে ঘুষি মারতে সে দ্বিধা করেনা । তার সংলাপে আছে , 'ভালবাসা হ্যান্ডগ্রেনেড বেনজেড্রিন ডাবলিং ডিয়ার ডিয়ার' ।২৭খ. টোরসো যেমন যন্ত্রসভ্যতার তৈরী, আধুনিক নারীও তেমনি এই সভ্যতার নানা অসুখে তাড়িত । পুরুষ চরিত্র ভাবনাতেও মলয়ের ধ্যানধারণা অন্যরকম ।

সুতরাং য়লমের দেহ এবং স্বভাবে মানুষ এবং জন্তুর সমন্বয় ঘটিয়েও টোরসো নামক এক যন্ত্রমানবীর থেকে তাকে সব দিক থেকেই নিকৃষ্ট করে উপস্থাপিত করা হয়েছে । মলয় বলেছেন , য়লম সবসময় অশ্লীলতা পছন্দ করেনা । মানে কখনও কখনও করে ।

তার শেয়ালের মতো লেজ , সে মুষ্টিযোদ্ধা কিন্তু ছাগলের বাচ্চার মতো লাফাতে লাফাতে রিঙের ভিতরে ঢোকে । টোরসোর প্রতিটি ঘুষিতেই সে কাৎ , একবারেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনা । লেখক জানিয়েছেন, য়লমের নানান মস্তানি প্যাঁচের প্রতিটি দাঁও ফসকে যায় । শুধু পৌরুষের অভাব নয় , ব্যক্তিত্বেরও অভাব রয়েছে চরিত্রটিতে । সে নানা ছন্দ , ছন্দের মাত্রা নিয়ে মাথা ঘামায় অর্থাৎ ব্যাকরণের বাইরে জেতে পারে না । বেড়াজাল ভাঙতে পারে না । তাই দুর্বল মানুষ ও জন্তুস্বরূপ য়লম পরাজিত হয় যন্ত্রমানবী টোরসোর কাছে । নাটকের শেষে তাকে দেখা যায় না ।

টোরসো হাজার খুঁজেও তাকে পায়না । যন্ত্রেরই প্রাধান্য নাটকে সূচিত হয় । সেদিক থেকে মলয় রায়চৌধুরীর 'ন পুং পং' মানুষ ও মানবতাবোধের বিপর্যয়ের নাটক । আর মানুষও তো এখানে ক্লীব । তার পৌরুষ নেই । ন পুং পং - সেরকম ইঙ্গিত দেয় । আরেক দিক থেকে মনে হয় , নাট্যকার নিজেকেই এখানে ব্যঙ্গ করেছেন । 'য়লম ' চরিত্রটির নাম মলয়েরই ওল্টানো রূপ দেখে আমাদের এরকম মনে হয়েছে।

খ . ফাল্গুনী রায়ের নাটক , চিত্রনাট্য ইত্যাদি

কালো খ্রীষ্ট

ফাল্গুনী রায়ের 'কালোখ্রীষ্ট' নাটকটি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় । এটি আবার এত ক্ষুদ্র যে এটিকে নাটক বলতে বাধে । রচনাটির কিছু কিছু অংশে কাব্যময় ভাষাও রয়েছে । প্রতীক ও ব্যঞ্জনাকেও বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সুতরাং সেসব দিক থেকে 'কালোখ্রীষ্ট' কে কবিতা বললেও বলা যায় । আবার ফাল্গুনী এখানে মঞ্চের কথা বলেছেন, যবনিকার কথা বলেছেন ।

দু'জন মানুষের সংলাপ , পরস্পরের মধ্যে বিতর্কের আভাস ; দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলা , উপহাস , অট্টহাসি - সবই রয়েছে এখানে । বাস্তবতা ও বাস্তবতাকে অতিক্রম করে প্রতীক সংরচন, ঘৃণা, ক্রোধ, প্রতিবাদ উচ্ছৃঙ্খলতার যে বয়ন তাতে একে কবিতা বা নাটক দুইই বলা যায় । মলয় রায় চৌধুরীর মতো ফাগুনী রায়ের এই নাটকটিও অ্যাবসার্ড নাটকের শ্রেনীভুক্ত । কেননা এই শ্রেণীর নাটকে ''তথাকথিত শৃঙ্খলাবদ্ধ এই বিশ্বে মানুষের যে জটিলতা ও উদ্বেগ বেড়েছে তাকে কতকগুলি প্রতিমান পরম্পরায় ধরবার চেষ্টাই - ই অ্যাবসার্ডবাদীদের উদ্দেশ্য । কাজেই এই নাটকে তথাকথিত কোন প্লট বা চরিত্র নেই যার মধ্যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠতে পারে । এবং সেই জন্যেই প্রচলিত অর্থে নাটকীয়তাও নেই ।সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাও নাটকীয় গতির বিরোধী , অর্থহীন স্বগতোক্তি ''।২৮.

ফাল্গুনীর নাটকে এসব বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই বর্তমান । তবে দ্বন্দ্বের ব্যাপারটি রয়েছে । নাটকের দুটি চরিত্রেই রয়েছে । নাট্য উপস্থাপনার সাধারণ রীতির অনেকগুলিই এখানে মান্য করা হয়েছে ।তাই মঞ্চ পর্দার আড়ালে কিছু ধ্বনি শুনিয়ে তিনি নাটক শুরু কড়েছেন । এই ধ্বনির মধ্যে আছে , করাতের কাঠ চেরা শব্দ , মাঝে মাঝে সম্মিলিত কণ্ঠের উপহাস, অট্টহাসি । এরপরে পর্দা সরে যায় । সব শব্দ থেমে যায় । দৃশ্য গোচর হয় মঞ্চের মাঝখানে গোল টেবিল । টেবিলের উপরে ইতস্তত মড়ার খুলি, খুলিদের চোখের কোটরে জ্বলন্ত মোমবাতি । পাশেই রয়েছে মদের বোতল , সোডা গ্লাস । মুখোমুখি বসে দু'জন মানুষ । একজনের মুখ দর্শকের দিকে যার মাথার চুল হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত আরবী আলখাল্লায় ঢাকা , চোখে কালো চশমা ।

অর্থাৎ একটি দীর্ঘ সাদা খোলের উপর একটি কালো চশমা নিয়ে একটি বিদ্‌ঘুটে মূর্ত্তি । দ্বিতীয় ব্যক্তি যে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে আছে সে সম্পূর্ন নগ্ন। চরিত্র দুটির উপস্থাপনার পিছনে নাট্যকারের বিশেষ পরিকল্পনা কাজ করেছে । বোধহয় , পাঠকদের সঙ্গে তিনি ইয়ার্কি করেছেন । প্রথমত ঃ এরকম দুটি আপাত বিপরীত , অস্বাভাবিক চরিত্র সৃজন । দ্বিতীয়ত নগ্ন লোকটির অঙ্গ প্রতঙ্গের উল্লেখ ও দৃশ্যগোচরতা নেই । পক্ষান্তরে সর্বাঙ্গাচ্ছাদিত লোকটির প্রতিটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে । এখানেও রয়েছে অ্যাবসার্ডিটি ।

দর্শক বা পাঠকদের সঙ্গে যেন ক্রীড়া করছেন ফাল্গুনী । কারণ দর্শক বা পাঠকের কাছে দুই চরিত্রই অচেনা (stranger) থেকে যাচ্ছেন । মুখাবয়ব যেহেতু কারুরই স্পষ্ট নয় , তাই নগ্নতা বা আলখাল্লা দিয়েই তাদের চিহ্নিত করতে হবে । আবার এর মুস্কিল হল ঐ স্থানে ওরকম ভিন্ন দু'জন ব্যক্তিকেও যদি স্থাপিত করা যায় , তাহলে তাদের আলাদা করে সনাক্ত করা সম্ভব হবে কীভাবে ? সুতরাং নগ্নতা বা পোষাক , সম্মুখভাগ বা পশ্চাৎভাগ কোনোভাবেই মানুষকে চেনা যায় না । যাইহোক , এই দুটি মানুষই খুন সম্পর্কে আলোচনা করে । নগ্ন মানুষটি নিজেকে খুনি মনে করে , কালো চশমা পরিহিত আলখাল্লাধারী বলে সে - ই খুন করেছে । বলে , 'পুলিশ হিসেবে সে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলের উপর গুলি চালিয়েছিল । শান্তি আনার জন্য , প্রশাসনের স্থিতির জন্য সেটা ছিল তার ডিউটি । তার ছোড়া বুলেটে একটা তেইশ বছরের মেয়ের দুই বুক ভরে উঠেছিল তাজা রক্তে ।' ২৯.

এসব কথা বলার সময় সে মাঝে মাঝে মদ্যপানও করে । ঐ ঘটনার পর লোকটি চাকরি ছেড়ে দেয় । জীবনবীমার দালালী শুরু করে । এখানেও ব্যঙ্গ - যে রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসাবে অন্যের জীবন ছিনিয়ে নেয় , সেই আবার অন্যের জীবনকে বীমার আধারে সুরক্ষার দালালীও শুরু করে । হয়তো বা এজন্যই এ চরিত্রটির পোষাক দরকার ছিল । নিজের স্বরূপকে ঢেকে রাখবার জন্য দরকার ছিল । মধ্যবিত্ত মানুষের দ্বন্দ্ব , বিবেকতাড়না এবং সেন্টিলমেন্টাল অভিব্যক্তি - সবকিছুই কালোচশমা, পরিহিত ব্যক্তিটির মধ্যে বিদ্যমান ।

উল্টোদিকে , নগ্ন মানুষটির কথাবার্তা দৃষ্টিভঙ্গী সোজা সাপটা । তার বাহ্য আচরণ, মুদ্রাদোষ সবই নগ্নতার মতনই যেন বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় । সে অন্য ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করে, পুলিশি চাক্রি অত সহজে ছাড়লেন কী করে'? তারপর মদ্যপান করে, একটি খুলির চোখের কোটর থেকে জ্বলন্ত মোমবাতি তুলে ফুঁ দিয়ে নেভায় , তারপর সেটা দুই আঙুলের ফাঁকে চার্মিনারের মতো ধরে থাকে । কালো চশমা অবশ্য জানায় , তার গুলি করার কারণ মেন্টাল ডিজ অর্ডার' বলে,"সে সময় আমি জিনা লোলোব্রিজিডার একটা দারুন সেক্সি ছবির ভিতর একটা রাক্ষুসীকে হাসতে দেখেছিলুম - তার দাঁতে আমার মা'র রক্ত - আমার

নিজস্ব ভ্রূণ আমার মা'র রক্ত খেয়েই বড় হয়েছে মা'র জরায়ুতে - তবু ঐ ছবিটার ভেতরের রাক্ষুসীটার দাঁতে দেখেছিলাম আমার মা'র শরীরের মাংস টুকরো - শত শত সহস্র শিশু এবং তাদের মা'র সব - মায়েদের স্বামীরা - পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে খেয়ে চলবে , ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে অই রাক্ষুসী - ওকে মারো - ওকে মারো - এরকম মনে হওয়ায় আমি নাকি সে সময়ে গুলি ছুঁড়ে লাইটহাউসের একটা বিরাট ব্যানার তছনছ করে দিয়েছিলুম ।''৩০.

এই অংশে চরিত্রটির মনোবিকলনের মধ্যে ফ্রয়েডের ইডিপাস কমপ্লেকসই মূর্ত হয়ে উঠেছে । আছে মধ্যবিত্ত মানুষের অনুতাপ ও অপরাধবোধের আতঙ্কও । নগ্ন চরিত্রটি তাকে তা স্মরণও করিয়ে দিয়েছে । এভাবে তাদের কথাবার্তার মধ্যেই আবার ফিরে আসে উপহাস , অট্টহাসি ও নৈঃশব্দ্য । নগ্ন মানুষটি কালো চশমার মানুষটিকে একটি কূট প্রশ্ন করে । বলে , গুলিটা তো অন্য কেউও ছুঁড়তে পারত । সুতরাং খুন সম্পর্কে কিছু বলা হোক । কালোচশমার ব্যক্তিটি বলে , ''হতে পারে নিয়তির পেছনে হাঁটা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই - তবু যখন ঘটনা ফর্ম করে - আরো খোলাভাবে বললে অনেক কোষ না ফেটে হঠাৎ একটি কোষ ফেটে ভ্রূণ বেরিয়ে আসে - বেড়ে ওঠে গর্ভে , তখনি জীবন শুরু হয় , নতুন আরো জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে ।''৩১.

নগ্ন মানুষ মদ্য পান করে এবং এসব যুক্তিতর্কের ব্যাপারে তার বিরক্তি প্রকাশ করে । অসহিষ্ণুতায় তার ব্যক্তিত্বের জোর প্রকাশ পায় , '' হয় কবিতা পড়ুন , নয় আমার কথা শুনুন - আর্গু করতে আসিনি , সারগর্ভ জ্ঞান একটু দূরে থার এখন ।''৩২.

কালো চশমা পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে বলে , 'কী বাবা, মদ খেলেই দেখছি তুমি বাচাল আর চপল হয়ে ওঠো - গাঁজাতে অত ইন্ট্রোভার্ট থাকা হয় ক্যানো ? ''৩৩.

বস্তুত এতক্ষণ প্রসঙ্গ ছিল খুন , এবার এল মাদকদ্রব্য । মদ তো ছিলই , এল গাঁজা । শুধু ফাল্গুনীর নিজের জীবনাচরণ নয়, এক্ষেত্রে আমাদের আমেরিকান ও ইংরেজ 'বিটনিক'দের কথা মনে পড়বেই ।

কেননা নগ্ন মানুষ বলে , 'আসলে , গাঁজা খেলে চামড়ার তলায় জেগে ওঠে অনেকগুলো চোখ ..... অত বেশি খোপ শরীরের ভেতর ..... এত জটিলতা , চিন্তার পিড়িং পিড়িং .....।' ৩৪.

লক্ষণীয়, কালো চশমা মাদকদ্রব্যের আলোচনায় উৎসাহী নয়, খুন বিষয়েই সে জানতে চায়। বলে, ''নার্কোটিকস নিয়ে থিওরি না করে জাস্ট টেল অ্যাবাউট মার্ডার ।''৩৫.

নগ্ন মানুষ বলে , থিওরি নয়, কেবল গাঁজাই তাকে একটা ভিশান দিয়েছে । কালো চশমা বলে তার ভিশান নেই , পেন্যানস্ আছে । এখানে বোঝা যায় যে , নগ্ন মানুষটি কল্পনাপ্রবণ, কবিতা প্রেমিক , ভাববাদী । আর কালো চশমা বাস্তববাদী , সমাজের সাধারণ মানুষেরই একজন । নগ্ন মানুষটির কথায় এরপর কালো চশমার মানুষটি আলোড়িত হয় । যখন নগ্ন মানুষটি বলে , পেট থাকলেই যেমন পেটের অসুখ , বেঁচে থাকলেই যেমন ক্ষুধা , তেমনই অপরাধ থাকলেই প্রায়শ্চিত থাকা স্বাভাবিক । ক্ষুধা শব্দটি কালো চশমার লোকটিকে উদ্দীপিত করে । বলে , ''বেড়ে বললে তো ; বেঁচে থাকলে ক্ষুধা - অ্যাঁ ? শালা খালি পেটে চাঁদের ভেতর আমি একটা চিতাকে জ্বলতে দেখেছিলুম হে ঃ।''৩৬.

তারপর লোকটা মদ খেয়ে একটা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে তার কোটের থেকে মোমবাতি উপড়ে ফেলে , সেই গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় । এরপরই কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে থাকে । নাটকের মধ্য থেকে বাস্তবতার অন্তর্ধান ঘটে । বীভৎস ও কদর্য কিছু চিত্রকল্প ফুটে ওঠে যেন কবিতার অথবা বলা যায় , অনেকগুলি প্রতীককে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে ফাল্গুনী গোটা পরিবেশটাই পাল্টে দিতে চান । মঞ্চের উপর এই দৃশ্য শুধু যেমন উপস্থাপনযোগ্য নয়, তেমনই যেন আবর্জনার স্তূপ স্বরূপ। অথচ ফাল্গুনী বোধহয় এখানে এভাবেই ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর যে বক্তব্য তাকে ব্যাখ্যাও করতে চেয়েছেন। যাইহোক, কালোচশমার আঙুল পড়তেই শুকনো খুলি থেকে রক্ত ছিটকে এসে ছড়িয়ে পড়ে নগ্ন মানুষের যৌনাঙ্গে। আর তখন সেখান থেকে এক দুই তিন চার করে বার হয়ে আসতে থাকে সরু সরু মাংসল সুতো।

সেগুলি ক্রমে পাল্টাতে থাকে, রূপ নেয় মানুষ, কুকুর, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদির অন্ত্রগর্ভনারী , অন্ডকোষ, যোনি, জরায়ুতে। ক্রমে, কালোচশমার আরবীয় পোষাকের চারপাশে জমতে থাকে রক্ত ল্যাপ্টানো বাদামী হলুদ নাড়িভুঁড়ি সব একটা জরায়ুর খোলের ভেতরে ঢুকে যায় সেই কালো চশমার কপাল সুদ্ধ মাথা। নগ্ন মানুষ টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ায়। ক্রমে তার যৌনাঙ্গ হতে নির্গত ঐসব দ্রব্যসামগ্রীতে প্রতিটি খুলি ঢাকা পড়ে, জেগে থাকে শুধু জ্বলন্ত মোমবাতি, আর এই বিবমিষাময় পরিবেশে নগ্ন মানুষটি টেবিলে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধভঙ্গীতে দাঁড়ায় । সঙ্গে সঙ্গে সেই সৃষ্টিশীল মাংসল সুতো তার যৌনাঙ্গচ্যুত হয়ে একটা কালো সাপে পরিবর্তিত হয়। সাপ নগ্ন মানুষটির দুই উরু, কোমর - বুক - গলা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরে ও ছোবলের ভঙ্গী করতে থাকে । নগ্ন মানুষ প্রার্থনা আর দোষ স্বীকারের সুরে কথা বলে চলে দর্শকদের দিকে চেয়ে ।

এই অংশে অনেকগুলি বিপরীতধর্মী ব্যাপার রয়েছে - যার সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না তবে লেখকের বক্তব্যের একটা গড় - আদল পাওয়া যায় । তাই বলা যায় যে , কালো চশমার হাতের ছোঁয়া পেতেই মৃত মানব শরীর থেকে রক্ত ছিটকে ওঠা অসম্ভব নয় । তার হাত যে খুনীর হাত , খুনীর হাত জীবিতদের হাতে পড়লে তো রক্ত ঝরবেই । সে যে খুনী ছিল , খুলিগুলিও ছিল জীবিত - উক্ত ঘটনা তারই ইঙ্গিত । আবার নগ্ন মানুষর যৌনাঙ্গ রক্তের স্পর্শে মানুষ ও নানা জীবজন্তুর নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করেছে ।

রক্ত এখানে জীবনের প্রতীক ঠিকই কিন্তু সে জীবন অসম্পূর্ন , বিকৃত । মনে হয় , পৃথিবীর প্রচলিত জীবন ধারাকে ফাল্গুনী প্রবলভাবেই ঘৃণাই করতেন , তাদের স্বাভাবিক ও সুস্থ মনে করতেন না । কারণ আরও সুন্দর , সুস্থ ও মহৎজীবনের প্রত্যাশা ছিল তাঁর । কালো চশমাও বিকৃত মানুষই বটে ; তাই ঐ সব নবজাত জরায়ুর একটির খোলে তাঁর কালো চশমা ও কপালসুদ্ধ মাথাকে ঠেসে দেওয়া হয়েছে । যখনই নগ্ন মানুষটি যীশুখ্রীষ্টের ভঙ্গী গ্রহন করল তখনই মাংসল সুতোর বিকৃিত ময় সৃষ্টি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আবির্ভাব হল কালো সাপ রূপী শয়তানের । বাইবেলের আদি শয়তান যেন । কিন্তু লোকটি তো যীশু নয় , সে কালো খ্রীষ্ট ; সুতরাং প্রার্থনা ও দোষ স্বীকার করতে হয় তাকে , বলতে হয় পুরনো প্রেমের কাহিনী , বলতে হয় প্রেমের স্বপ্নের কথা ,

এক অধরা স্বাধীনতার কথা - যা সে পেতে চায় , কিন্তু পাবেনা কোনদিনও । তার সেই সংলাপে জানা যায় সেই প্রেমিকার নামও , অনুরাধা । বোঝা যায় , সেই অনুরাধা খুন হয়েছে । কালো চশমাকে খুন করেছে সেই অনুরাধা । আবার নগ্ন মানুষের দাবী খুনী সে-ই ।

নগ্ন মানুষটির এই সংলাপে হত্যা রহস্যের কিয়দংশ যেমন উন্মোচিত (কিয়দংশ এইজন্য যে প্রকৃত হত্যাকারী কে তা বলা সম্ভব নয়) তেমনই কাব্যময়তারও এক চমৎকার প্রকাশ বিধৃত। আর আছে আবেগ , কোমলতা যা ফাল্গুনী রায়ের লেখায় সাধারণত প্রত্যাশা করা যায় না,-

> অনুরাধাকে আমি ভালোবাসি, আমাদের বিবাহ আগামি স্বাধীনতা দিবসে ঝাঁঝাঁর কাছে একটি পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হবে ..... সাক্ষী নক্ষত্র আর অন্ধকারে আদিগন্ত উধাও পাহাড়.....আমরে দু'জন সেখানে ..... সেই অন্তহীন আকাশের তলায় - মাটির থেকে একটু ওপরে , মাটিরই উপরে পাহাড়ের বুকে নক্ষত্রের নির্জনতায় শুয়ে থাকব আবরণহীন - অশ্রুত মন্ত্র পড়বে সবুজ উপত্যকা , যে সবুজ অন্ধকারের যোনির ভেতর স্তনের ভেতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকে - এরকমই ঠিক আছে আমাদের বিবাহ - অনুষ্ঠান সম্মর্কে- আগামী স্বাধীনতা দিবসের দিন গুনছি আমরা দুজন ।৩৭.

তার সংলাপের শেষ লাইনে ' ইয়া - আই - অ্যাম - আ - মার্ডারার!' বলার সঙ্গেই ভেসে ওঠে নাটকের শেষ দৃশ্য। নাটকের প্রথম দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয় কিছুটা । কাঠ চেরা করাতশব্দ, সম্মিলিত উপহাস আর উচ্চরোল ধ্বনি তরঙ্গের মাঝে মঞ্চ উজ্জ্বল আলোয় ভরে ওঠে । সেই আলোক উদ্ভাসে মুছে যায় কালোসাপ আর মানুষ কুকুর গরু ছাগল শূকর , শূকর শাবকের অন্ত্রগর্ভনারী, পাকস্থলী, অন্ডকোষ, যোনি ও জরায়ু। আরবীয় পোষাকে সজ্জিত কালোচশমা উঠে দাঁড়ায় টেবিলে, পেছন থেকে, সমকামী আবেগে জড়িয়ে ধরে নগ্ন মানুষকে। সব শব্দ থেমে যায় । পর্দা নেমে আসে।

ফাল্গুনী রায়ের 'জরায়ু' চিত্রনাট্যটি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। আসলে, এটিকে চিত্রনাট্যের আকারে কবিতা বলাই ভাল। নগ্নতা ও যৌনতার বাড়াবাড়ি ও রুক্ষতা থাকলেও আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার ছবি ও সমালোচনার যাথার্থ্যের জন্যে এটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। জরায়ুর'র শুরু রাত্রিবেলার তারা খচিত আকাশ দিয়ে , সমাপ্তি মৃত্যুতাড়িত রক্তাক্ত পায়রাদের মাটিতে অবতরনের দৃশ্য । সৌন্দর্য ও কদর্যতার এক অদ্ভুত মিশেল ফাল্গুনী এখানে ঘটিয়েছেন । দু'একটি দৃশ্যে লেখকের কল্পনাশক্তির অভিনবত্ব স্বীকার করতে হবে। মানুষ এবং জন্তু, প্রকৃতি এবং যন্ত্র, ধর্ম এবং প্রবৃত্তি সব এখানে একাকার, প্রচলিত ধ্যান ধারণা, সামাজিকতা, সম্পর্ক রীতিনীতি কোনকিছুতেই আস্থা নেই ফাল্গুনীর, তাই প্রতিটি ব্যাপারেই প্রবল আঘাত হেনেছেন তিনি। প্রত্যেকটি বিষয়, চরিত্র, উপাদানের ও ঘটনার বর্ণনার মধ্যে একটা বক্তব্য ছড়িয়ে দেবার চাড় লেখকের অতীব প্রকট।

চিত্রনাট্যটির শুরু একটি লং শটে। রাতের তারকাখচিত আকাশ । রাতের রাজপথ, ফাঁকা ট্রামলাইন, হলুদ আলো নিয়ে ল্যাম্পপোষ্ট। এসবের উপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান করে এসে এক জায়গায় স্থির হয়। একটা ডাকবাক্স। কালো বর্ডার শোক সূচক খামের পাশে প্রজাপতি মার্কা শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র। শব্দ; শানাইয়ের সুর এবং হরিধ্বনি। বোঝাই যাচ্ছে, মহানগরী কলকাতার একটি ক্ষয়িষ্ণু পটভূমিকায় ফাল্গুনীর রচনার শুরু । সমর সেন ও জীবনানন্দের বর্ণিত কলকাতারই একটি ভিন্নতর আধুনিক রূপ লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন । ডাকবাক্স মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম - তাই শ্রাদ্ধ ও বিবাহ দুইয়ের নিমন্ত্রণই তা বহন করে। বিবাহ এবং মৃত্যু এই মহানগরীতে , আধুনিক মানুষের জীবন এক অনিবার্য সত্য। তুল্যমূল্যও , দুইয়ে কোনো তফাৎ নেই - তাই দুটি ঘটনার আভাসকেই পাশাপাশি রাখা ।

কিছুক্ষন পরে ফাল্গুনী একই ভাবে দেখিয়েছেন, (মিড শটে) একটা ডাকবাক্স, একটা ডাস্টবিন। দেখিয়েছেন হাতপাহীন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে উঁচু দিয়ে ভেসে চলে দেয়াল ঘেঁসে , আর সেই ডাস্টবিন একটি যুবতী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে দেয়ালের মাথার উপর দিয়ে দৌড়তে থাকে। শব্দ হিসাবে নদীর জলস্রোত, সাপের হিসহিস , কোকিলের ডাক অনুরণিত হয়।

টপঅ্যাঙ্গেল শটে দেখানো হয় ময়ূর ময়ূরীর সঙ্গম - ও হাত পা হীন মানুষের ভেসে যাওয়ার দৃশ্য । প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোষ্ট নীচুতে নেমে আসে , ফুটপাতের উপর জ্বলে অসংখ বাল্‌ব - সমস্ত রাস্তা ভর্তি হয়ে যায় জ্বলন্ত বাল্‌বে। লং শটে দেখানো হয় একটা ছ'তলা বাড়ি হেলে পড়ে ক্রমশ, দ্রুত একটা ডবল ডেকার এসে বালবগুলোকে গুঁড়িয়ে যায়, বাল্‌বগুলো ফাটে, ডবল ডেকারও উল্টে যায়। উপরন্ত পটকা ফাটার আওয়াজও শোনা যায়। এরপরে, এতক্ষন ধরে ঘটে চলা ঘটনাবলীর একটি 'সিনথেসিস' রচনা করেন ফাল্গুনী। অবশ্য আরও কিছু উপাদানও সংযোজিত হয় । মিড শটে - দৃশ্যটির বর্ণনা এরকম :-

> শ্মশানচিতার আগুনে দেখা যায় একটা ষ্টিয়ারিং - উল্টানো ঘড়ি। একটা - হাত - পা হীন ধড় একটা চিতার সামনে এসে দাঁড়ায়। তার দুটি জলভরা চোখ। সেই চোখদুটিকে দেখা যায় সেই ডাস্টবিন রূপসীকে স্তন দিয়ে মুছিয়ে দিতে। তার (যুবতীর) নাভিদেশ হতে একটি বৃক্ষ বেড়ে উঠতে থাকে - বৃক্ষের প্রতি ডালে জোড়া জোড়া ময়ূর ময়ূরী - তলায় অসংখ্য পালক ছড়ানো - পালকের ওপর শোয়া - অধশোয়া অবস্থায় মানুষ - মানুষী শূকর শূকরী কুকুর কুকুরী সঙ্গমরত - হাতপা হীন মানুষটি বইয়ের ওপর ঝুঁকে , পড়ে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা ।৩৮.

গীতাপাঠের আওয়াজ শোনা যায়। ফাল্গুনী দেখিয়েছেন, এই বিকলাঙ্গ মানুষটি কত অসহায়। একটা ডাকবাক্স যার অভ্যন্তরে শুধু খস্‌খস্ করত অন্যের চিঠিপত্র, তথ্যাদি ; যে একটি নাগরিক যন্ত্র বৈ কিছুই ছিল না - সে মানুষ হয়ে গেছে , একটি অপূর্ণ মানুষ। আধুনিক মানুষেরই সে প্রতীক, ডাকবাক্সের মত ফোঁপড়া এলিয়টের ফাঁপা মানুষ । আধুনিক যুগের ঈর্ষা ও সন্দেহের , ঘৃণার সন্তান সে। যেন মহাভারতের কদ্রুর সেই অসমাপ্ত বিকলাঙ্গ সন্তান। এই মানুষের যৌনক্ষমতা নেই , সৃষ্টিশীল হবার উপায় নেই।

মানব নিয়তির কি অসহায় ও অনভিপ্রেত পরিণতি। পরের অংশেই চিত্রনাট্যকার একটি অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। "ক্লোজ শট - প্রচুর ময়ূরপুচ্ছ পোড়ে শ্মশানচিতায় - একটি জ্বলন্ত জাহাজ ডুবে যেতে থাকে সমুদ্রে। দূর হতে ভেসে আসে -save our soul (cut)"৩৯.

চিত্রনাট্যের পরবর্তী অংশে ফাল্গুনী দেখিয়েছেন , হাতপাহীন মানুষটির হাতপা গজিয়েছে । হাসপাতালে তার বাবাকেও দেখা যায় মারা যেতে । সেখানেই মধ্যবয়সী এক নার্স তার প্রতি আকৃষ্ট হয় । তার পিতার মৃত্যুর জন্য শোকজ্ঞাপন ও তার জন্য কামজ্ঞাপন নার্সটি একই সঙ্গে করতে থাকে । একদিকে মৃত্যুর আবহ , অন্যদিকে মাতৃবয়সী এই নারী - এই দুই আবর্তের মধ্যে পড়ে যায় নতুন হাত পা প্রাপ্ত মানুষটি । আবার যে ডাস্টবিন নারী আগে তাকে ভোগ করতে পারেনি অপূর্ণতার জন্য- সেও এবার লোকটির উপর অধিকার কায়েম করতে চায় । ফলে দুই নারীর মধ্যে চুলোচুলি শুরু হয় ।এভাবে চিত্রনাট্যের দ্বিতীয় অংশে hollow man কে যখন স্বাভাবিকতায় নিয়ে এলেন ফাল্গুনী , তখনও কিন্তু আধুনিক মানুষ পূর্ণতা পেলনা । এখানে সমস্যা বিচ্ছিন্নতার ।

যদিও ডাকবাক্স দুটি দূরের মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম এখানে সেই মানুষটি কিন্তু সংযোগস্থাপন করতে পারে নি । সবাই এখানে আলাদা আলাদা সময়ের ফসল । নগরীর রাজপথে পুরুষটির জন্ম এক রূপান্তর- সে চলতে শুরু করলে ডাস্টবিনের নারীতে রূপান্তর - পুরুষটির বিকলাঙ্গতা দূর হবার সময় নার্সের আবিভাব । লোকটি এই দুই নারী বা দুই ভিন্ন সময়ের দুই প্রতিনিধিকে মেলাতে পারেনি । ফাল্গুনী একটি প্রতীকের সাহায্যে এ কথা ব্যক্ত করেছেন :-

> ক্যামেরা প্যান করে (মিড শটে) দেখা যায় নগ্ন পুরুষ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে একটি দেয়ালঘড়ির দুই কাঁটাকে উপড়ে ফেলেছে ।৪০.

কাঁটা উপড়ানো গেলেও সময়কে তো বশ করা যায় না । অতএব ঘড়ি এক নাগাড়ে করতে থাকে ঢং ঢং। এরপর চিত্রনাট্যের তৃতীয় অংশ ।

রাত নেই , হাসপাতাল নেই , শ্মশানচিতা নেই, ডাকবাক্স - মানুষ , ডাস্টবিন - নারী , নার্স , চুলোচুলি - কেউ নেই ।

সকালের ঝকঝকে জ্যোতির্ময় আলোয় ট্রাম বাসে ভিড়ময় ব্যস্ত লোকের দ্রুত পা - লং শটে দেখা যাচ্ছে। স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েদের প্রাণবন্ত হাসাহাসি কথা বলার শব্দ শোনা যাচ্ছে । মিড ক্লোজ শটে দেখা যাচ্ছে দুটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ডাকবাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে চিঠি লিখছেন । তাদের একজনের চিঠিতে লেখা আছে : 'আমার একটি ছেলে হয়েছে' ।অন্যের চিঠিতে 'রমেশ মারা গেছে ।' চিঠি দুটি ডাকবাক্সে ফেলা হয় । পাশের ডাস্টবিনে বিয়েবাড়ির বাসি খাবার , ফুল ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে যায় একজন চাকর।

বোঝা যায়, রাতের ব্যাপারটি একটি স্বপ্ন ছিল যেন। ডাক বাক্স ডাকবাক্সেই আছে , ডাস্টবিন আছে ডাস্টবিনেই। রাতের অন্ধকারে আর দিনের আলোর মধ্যে, কলকাতায় তফাৎ অনেক। ফাল্গুনী রাত্রির ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় অলৌকিকতার মায়া বা ভূতের গল্প শোনান নি, দেখিয়েছেন একটি দুঃস্বপ্ন। যা এই সময়ের একটি ভয়াবহ তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। যাই হোক, ডাস্টবিনে কুকুর, কাক, ভিখারির খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির দৃশ্যের পাশে মোটরারোহী নরনারী যুগলের ছবি - শ্লোগানসহ লাল পতাকার মিছিল দেখিয়ে সমাজের অর্থনীতির বৈষম্যকেই প্রকট করে দেখানো হয়েছে পরবর্তী অংশে। ঐ মিছিলের শেষে একজোড়া ভিখিরি - মেয়ে ভিখিরিকে দেখা যায়। মেয়েটির রুখু খোঁপায় বাসি ফুলের মালা, শুকনো ঠোঁটে হাসি হাসি সাদা দাঁত। হঠাৎ প্রত্যেকটি দাঁত থেকে পায়রা উড়ে যায়। আকাশের দিকে ক্যামেরা প্যান করে। শব্দ শোনা যায় হাজার হাজার পায়রা ওড়ার। নিঃস্ব মানুষের এই প্রেমকে এই সমাজ ও অর্থনীতি বাঁচতে দেবে কেন ? যে প্রেম সহজ, স্বাভাবিক , অকৃত্রিম এই কৃত্রিম নগর সভ্যতা তাকে বেড়ে উঠতে দেবে কেন ? ফাল্গুনী জানেন এই বাস্তবতা। তাঁর নানা কবিতা, গল্পে সে কথা তিনি বলেওছেন বহুবার । বলেছেন এখানেও,-

টপ অ্যাঙ্গেল শট - কতকগুলো লোক অসম্ভব
লম্বা - মুখগুলো ঘোড়ার - দেহটি মানুষের - গুলি

করে পায়রা গুলোকে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে পায়রারা ওলট পালট খেতে খেতে নেমে আসে মাটির দিকে।৪১.

১৯৭২ সালে ফাল্গুনী রায় রচনা করেন, 'অন্তিম জরায়ু' চিত্রনাট্যটি। এটিকে 'জরায়ু' চিত্রনাট্যেরই দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। আসলে, জরায়ু আর কিছুই নয় সময়ের গর্ভ। এই বিকৃত সময়ের গর্ভ। ফাল্গুনী এই বিকৃত সময়ের গর্ভে ঘটে যাওয়া কিছু কাহিনীর ছবি এঁকেছেন মাত্র। সেই ছবি যে কার্যকারণ শৃঙ্খলায় রচিত নিটোল কাহিনী হয়ে ওঠেনি সে ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ওয়াকিবহাল। এ কারণে এখানে একটি ক্ষুদ্র উপক্রমণিকাও রয়েছে তাঁর । তাতে লেখক জানিয়েছেন, 'অনেকসময় প্রকৃত লেখার ভেতরে মানুষেরা মিশে গেলে ফের লিখে ফেলার ব্যাপারটাই ঘুচে যায় অনেক সময় , অনেক সময় বিমূর্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার ফলে মানুষ বিমূর্ত চিত্রকলা কবিতা সাহিত্য এবং বিমূর্ত চলচ্চিত্রের কাছে চলে যায় ।'৪২.

যাই হোক, 'জরায়ু' অপেক্ষা 'অন্তিম' জরায়ু অনেক বেশী সংহত একটি স্থান - বিন্দুতেই বিভিন্ন দৃশ্যগুলোকে লেখক এখানে চিত্রায়িত করেছেন। কবিতার রস ও প্রেমের বেদনাও এখানে বেশ নিবিড় । প্রথম দৃশ্যে দেখানো যচ্ছে - একটা জ্বলন্ত চিতা - চিতার চারপাশে এক দঙ্গল সুন্দরী ও কুৎসিৎ উলঙ্গ যুবতী - যুবতীদের জলভরা চোখ। দ্বিতীয় দৃশ্যে - একটা নিমগাছ - নিম গাছের পাতার ফাঁকে পূর্নিমার চাঁদ। তৃতীয় দৃশ্যে জ্বলন্ত চিতার লকলকে অগ্নিশিখা আকাশের দিকে আর যুবতীরা মাটির দিকে তাকিয়ে । চতুর্থ দৃশ্যে নিমগাছের ডালে ডালে গলায় দড়ি দিয়ে কতগুলি হাতপাহীন পুরুষ ঝুলছে, তাদের কোমড়ে ঝুলছে একটা করে টেলিভিশান সেট - তাদেরই নীচে রয়েছে উলঙ্গ যুবতীরা। পঞ্চম দৃশ্যে দেখানো হচ্ছে - ঐ নারীদের উলুধ্বনি দিতে। উলুধ্বনি দেবার সময় তাদের শরীর থেকে অসমাপ্ত কিছু ভ্রূণ মাটিতে থপ্ থপ্ করে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে । যুবতীদের মুখ কুঁকড়ে যায়। তারা চীৎকার করে। ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় টিভিগুলোতে সমকাম, আত্মকাম ও পশুকামের কিছু নীল ছবি।

সপ্তম দৃশ্যে উলঙ্গ যুবতী সম্প্রদায়কে জরায়ুচ্যুত ভ্রূণগুলিকে কুড়িয়ে নিতে দেখা যায়, তাদের চোখের জল শুকিয়ে আসে ও চোখের মণিগুলি সশব্দে ফাটতে থাকে। রক্তে ভেসে যায় তাদের মুখ। ফলে সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য ঘুচে যায়। অষ্টম দৃশ্যে - এবার টেলিভিশান সেটগুলোতে ভেসে ওঠে লেখাগুলো -

আমাদের খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান চাই
আমাদের স্ত্রী চাই কবিতা চাই
আমাদের মদ চাই নির্জলা খাঁটি মদ
শিল্প আমাদের মদ
সাহিত্য আমাদের মদ
আমাদের মদ ক্ষুধার অনুভব।৪৩

নবম দৃশ্যে উলঙ্গ মেয়েরা চিতার দিকে মুখ করে বলে ওঠে, 'আমরা থিওরি চাই না, শরীর চাই। শুধু আমরা শরীর ও শরীরের থিওরি চাই।'৪৪

এই স্থানে মৃত পুরুষদের বক্তব্যকেই টেলিভিশান সেটে পরিস্ফুট করা হয়েছে। সাধারণ সামাজিক, ও সংবেদনশীল মানুষের এই আদর্শ চাহিদার সঙ্গে বাস্তববাদী নারীদের শরীরবাদের একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পুরুষদের মৃত্যুর কারণ তারা ঐ জিনিসগুলি পায়নি বলেই - এটা যেমন অনুমান করে নেওয়া যায়, তেমনই নারীদের চোখে অশ্রুবিন্দু তাদের বাসনাপূর্তি হয়না বলে - এমনটা ভাবা যায় । দশম দৃশ্যে - জরায়ু নাটকের তত্ত্বই ফিরে এসেছে।

এরপরে ছোট একটি কবিতা শুনিয়েছেন ফাল্গুনী - 'রাস্তার মাঝখানে একজোড়া মানুষ মানুষী / মানুষ তার মানুষীকে কেন্দ্র করে পাক খায় / মানুষ তার মানুষীকে প্রশ্ন করে / মানুষী তার মানুষকে প্রশ্ন করে / মানুষ উত্তর দেয় / অথচ কেউ কথা বলে না কেবল ইঙ্গিত - / কেউ কথা বলে না কেবল চোখের ভাষা ।'৪৫.

সম্ভবত দুটি আলাদা সাইনবোর্ডের মতো নারী পুরুষের অবস্থানও দুটি আলাদা প্রান্তবিন্দুতে এবং একইভাবে তাদের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীও আলাদা। নর - নারীর পরস্পরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া এবং পরস্পরকে প্রশ্ন করে যাওয়ার এই পুরাতন ইতিহাসের সত্যই যেন কোনো শেষ নেই।

একাদশ দৃশ্যে - ঝুলন্ত টি.ভি গুলিতে পুনরায় ভিন্ন ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায় - মৃত পুরুষেরা হাতপাহীন। আর একটা টিভিতে দেখা যায়, পরিবার পরিকল্পনার বিরাট পোষ্টারের তলায় দু'জন মানুষ - মানুষী বসে আছে - তাদের কোলের উপর তিনটি শিশু কাঁদছে। আরেকটা টিভিতে দেখা যায়, মানুষ উত্তেজিত, তার চুলে পাক ধরেছে, মানুষীর চুলেও পাক ধরেছে। তবে তাদের সামনে একটি উলঙ্গ কিশোর। অন্য একটি টিভিতে দেখা যায়, মানুষীর সমস্ত শরীর কঙ্কালে পর্যবসিত - শুধু দুটি চোখ জীবন্ত - সেই দু'চোখে কেবল অশ্রু। আর মানুষের দুই চোখ অন্ধ, সমস্ত শরীর কুষ্ঠাক্রান্ত। তাদের সন্তান পূর্ণ যুবক কিন্তু বুকে মেয়েদের স্তন, মাথায় মেয়েদের চুল। পিতা এবং মাতা দু'জনেই তার কাছে যৌনতা দাবী করে এবং বলতে থাকে -

আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও
আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও।৪৬.

আর সেই যুবতী পুরুষসন্তান উদভ্রান্ত ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে যে ভয়ংকর কুশ্রীতা, বীভৎসতা ও বিকৃতির ছবি এঁকেছেন ফাল্গুনী, আমাদের মানবিক ও পারিবারিক সম্পর্ক গুলির স্বার্থপরতা, পচন ও অধোগতির উপর ঘৃণার আঘাত হেনেছেন - তাতে আমাদের আঁতকে উঠতে হয়। অস্বস্তিবোধ হয়। কদর্যতা ও অশ্লীলতার এই চিত্রায়নকে যে শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া যায়, তার কারণ ঐ মানবিক ধ্রুবপদটির উচ্চারন - আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও। দ্বাদশ দৃশ্যে আকাশে পুর্নিমার চাঁদ এবং ত্রয়োদশ দৃশ্যে - জলন্ত চিতার নীচে উলঙ্গ যুবতী সম্প্রদায়ের কোলে তাদের জরায়ুচ্যুত অসমাপ্ত ভ্রূণপিন্ড এবং অশ্রু ভারাতুর কণ্ঠে - ভালবাসা ফিরিয়ে দেবার প্রার্থনায় চিত্রনাট্যটির সমাপ্তি ঘটেছে।

'অন্তিম জরায়ু' তে বহু কথার মধ্যে এ কথাটিই প্রধান যে এই যুগে ভালবাসার মৃত্যু ঘটেছে বা নেই । সেই ভালবাসারই জন্য কাতর ফাল্গুনী এবং এই ভালবাসা অবশ্যই শরীর নির্ভর । ভালবাসাই পারে সমস্ত অসংগতি ও কুশ্রী তাদূর করতে । ভালবাসা নেই বলেই , ঐ পুরুষরা গলায় দড়ি দিয়েছে , যুবতীদের অসমাপ্ত ভ্রূণ প্রসব হয়েছে , মানুষে পরিণত হয়েছে কঙ্কালে , মানুষ হয়েছে কুষ্ঠে আক্রান্ত , অন্ধ । তাই তো ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার আবেদন । সেদিক থেকে - জরায়ু র চেয়ে অন্তিম জরায়ু কিছুটা সদর্থক রচনা । অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যও বলেছেন, ''যে অপজগতে ঘুচে যায় 'সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য' (অন্তিম জরায়ু) , তার তীব্রতম অন্ধকারেও চোখে পড়ে উলঙ্গ মানুষ - মানুষীর জলভরা চোখ আর সেই মৃত মানুষদের ওপরে 'নিমপাতার ফাঁকে পূর্নিমার চাঁদ' । শোনা যায় স্তোত্রের মতো অশ্রুনিবিড় উচ্চারণ :-

আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও
আমাদের ভালবাসা ফিরিয়ে দাও ।
এই বিশিষ্ট দৃষ্টির বিচ্ছুরণ আর উচ্চারণের অনুরণন সব প্রশ্ন ও সংশয় ডুবিয়ে দেয় ''।৪৭

ফাল্গুনী রায়ের 'মানুষ মানুষী' চিত্রনাট্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে । মোট পনেরোটি দৃশ্যে এটি গঠিত , যদিও সাত নম্বর দৃশ্যটি ফাঁকা রয়েছে । বিষয় , চরিত্র ভাষাভঙ্গী সব দিক থেকেই । বিমূর্ততা বা প্রতীকের তালগোল পাকানো জটও অনুপস্থিত । এখানে মূল চরিত্র চারটি । চারজনেই উচ্চশিক্ষিত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত । চারজনেই বুদ্ধিজীবি । দু'জন অধ্যাপিকা, একজন শিক্ষক ও অন্যজন গ্রাজুয়েট তরুণী । এই চারজনের মধ্যে দুটি প্রজন্মকে তুলে ধরা হয়েছে । অশোক ও স্মৃতিময়ী সিনিয়র প্রজন্মের প্রতিনিধি, সুধাব্রত ও অনিন্দিতা জুনিয়ার প্রজন্মের প্রতিনিধি, অশোক পেশায় অধ্যাপক , বয়স পঞ্চাশ । স্মৃতিময়ী তার প্রেমিকা, বয়স চল্লিশ । সেও পেশায় অধ্যাপিকা । অনিন্দিতা স্মৃতিময়ীর কন্যা , সে বি .এ পাশ , বয়স একুশ । সুধাব্রত অনিন্দিতার প্রেমিক । সে শিক্ষক , বয়স তার তেইশ । সুধাব্রতের বেডরুম দিয়ে প্রথম দৃশ্যের সূচনা । সময় বেলা তিনটা ।

ঐ ঘরের দেয়ালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, ছবির তলায় শোবার খাট । খাটের পাশে বই ভর্তি টেবিল , সেখানে জীবনানন্দের একটা বই ওল্টানো । আর একটা দেয়ালে ঝুলন্ত ঘুড়ি । দ্বিতীয় দৃশ্যে সুধাব্রতকে জীবনানন্দের একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। একসময় সে খাটের পাশে দাঁড়ায়, টেবিলের বইপত্র নাড়াচাড়া করে , খাটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে মাথায় বালিশ চাপা দেয় । পরমুহূর্তেই তৃতীয় দৃশ্যে মন্তাজে অনিন্দিতার হাসি , চিবুক , ঘাড় , বুক , চোখ , ঠোঁট , ইত্যাদি দেখানো হয় । সুধাব্রত উল্টে গিয়ে পা দাপাচ্ছে । চতুর্থ দৃশ্যে অনিন্দিতাকে রজনীগন্ধা ফুল শুঁকতে দেখা যাচ্ছে ।

ফুলের দোকানে ফুলওয়ালার মিশকালো চোয়াড়ে চেহারা চোখে পড়ে দেঁতো হাসি হেসে সে অনিন্দিতার কাছে পয়সা নেয়। একটা কুকুর রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে চলে যায় । এদিকে রজনীগন্ধার একটা গুচ্ছ সহসা সুধাব্রত'র মুখ হয়ে ওঠে । পাঁচ নম্বর দৃশ্যে দোতলা বাসের জানালায় অনিন্দিতার মুখকে দেখান হয় । ষষ্ঠ দৃশ্যে নিজের ঘরে সুধাব্রত ঘাড় নীচু করে সাদা পাতার উপর লিখে চলেছে। কবিতার কিছু লাইন, তার শরীর ঢেকে যাচ্ছে রজনীগন্ধা ফুলে ; চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায় অনিন্দিতাকে । বলে , 'আরে তুমি । অনিন্দিতা বলে - অন্য কারুর কথা ভাবছিলে'। বলতে বলতে খাটে বসে । সুধাব্রত - হাঁ , একটা মেয়ের কথা , তার শরীরের কথা , সে কিন্তু তুমি নও - অন্য কেউ । অনিন্দিতা - (চোখে বিষাদ) কে সে সুধাব্রত - সে তোমার শরীরে থাকে, তোমার দৃষ্টির গভীরে থাকে কিন্তু সে তুমি নও অন্য কেউ ।'৪৮

অনিন্দিতা জানায় সে সুধাব্রত'র কথা কিছু বুঝতে পারছে না । সুধাব্রত জীবনানন্দের বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তার পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করে । হঠাৎ থেমে গিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে অনিন্দিতার চোখের দিকে চেয়ে থাকে , তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে । এরপর আসে অষ্টম দৃশ্য । এক টুকরো বারান্দা - সামনে বাগানের আভাস মুখোমুখি স্মৃতিময়ী ও অশোক । এদের সংলাপ থেকে জানা যায় যে, অশোকের কাছে স্মৃতিময়ী সার্ত্রের একটি বই পড়তে নিয়েছিল, সেটি আবার মেয়ে অনিন্দিতা নিয়ে তার এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছে । সুতরাং বইটি স্মৃতিময়ী এখনও পড়ে শেষ করতে পারেনি।

অশোক মদের বোতলটার দিকে তাকায় - বোতলটা স্মৃতিময়ীতে রূপান্তরিত হয়। খিল খিল করে হেসে উঠে কেঁপে ওঠে একটা চল্লিশ বছরের সুগঠিত নারী শরীর । সেতার বাজতে থাকে জোরে , হঠাৎ সব থেমে যায় । শুধু কানে আসে ঘড়ির টিক টিক । দেখা যায় ঘুরন্ত পাখা , শূন্য আরাম কেদারা । ক্যামেরা অনেক উঁচুতে উঠে যায় । ফের অশোক ঘুরে দাড়ায় , বইটা চোখে পড়ে , তুলে এনে রেখে দেয় বুকশেলফে । বলে ওঠে , you bloody civilization ।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দেয়, দপ করে জ্বালায় এবার । আসলে , এই দৃশ্যে প্রৌঢ় অশোকের নিঃসঙ্গতা , অসহায়তা ও হতাশার একটি পূর্ণ চিত্র ফাল্গুনী অঙ্কণ করেছেন । অজস্র বইয়ের জগতে এক প্রৌঢ় অধ্যাপকের শূন্যতার ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । হয়ত মদ্যপান - এর কারণ হতে পারে, নাও পারে । স্মৃতিময়ীর সঙ্গে তার যথেষ্ট দূরত্ব - একদিকে সম্পর্ক ও বয়সের অন্যদিকে মানসিকতারও। স্মৃতিময়ী এখনও তরুণীর মতো হাসতে পারে , কিন্তু বিরক্ত অশোক তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না । সেতারের বাজনা সহসা থেমে যায়। সব থেমে যায়। অসহিষ্ণু অশোক সভ্যতাকেই গালিগালাজ করে। ঘড়ির টিক টিক, ঘুরন্ত পাখা , শূন্য আরামকেদারা এবং অশোক - একাকার। সে সভ্যতাকে গালি দিয়ে নিজেকেও কি ধিক্কার জানায় ?

ত্রয়োদশ দৃশ্যে স্মৃতিময়ীকে দেখানো হচ্ছে । তার ঘরে । টেবিল ল্যাম্পের আলোয় স্মৃতিময়ীর মুখ । পরীক্ষার খাতা দেখার ক্লান্তিতে মুখ ভরে আছে । আশেপাশে ছড়ানো ছিটানো পরীক্ষার খাতা , লাল পেন্সিলে নম্বরের দাগ । স্মৃতিময়ী উঠে দাঁড়ায় , এগিয়ে যায় দেয়ালের দিকে - সেখানে ফটোগ্রাফে স্বামীর সঙ্গে তার ছবি । প্রথম ফোকাসটা স্মৃতিময়ীর ছবির উপর স্মৃতিময়ীর শরীর - শরীর হঠাৎ লম্বা হতে থাকে , চুল বেড়ে যায় তরতরিয়ে , বুক ফুলে ওঠে বিরাট বেলুনের মতো , চোখের মণিদুটো বড় হয় - ছবির স্মৃতিময়ী - হাসছেন শান্ত বনলতা সেন - চোখ ।'৪৯

দ্বিতীয় ফোকাস অশোকের ছবির উপরে । সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিময়ী ছিটকে সরে আসে , তার বসন বিস্রস্ত হয়ে যায় , সে খাতাগুলো আঁকড়ে ধরে । কারন 'অশোক খালি গা , বুকভর্তি লোম , সেখানে স্মৃতিময়ী লাজুকমুখ ।'৫০

অশোকের মধ্যে বন্যতার প্রভাব - যা দেখে স্মৃতিময়ী আঁতকে ওঠে । এরপর ফাল্গুনী দেখাচ্ছেন যে স্মৃতিময়ী এগিয়ে গিয়ে , ক্রমে ছবির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে সে গীন্সবার্গ, কেরুয়াক পড়ে । স্মৃতি বলে, "কেন , অনিন্দিতা তো কাম্যু , কাফকা , বেদান্তদর্শন সবকিছু নিয়েই নাড়াচাড়া করে"। অশোকের মতে অধিকাংশ মেয়েই নীহার গুপ্ত বা আশাপূর্না দেবীর পাঠিকা। স্মৃতি বলে যে, অশোকের ইন্‌ফারেন্স তো ভুলও হতে পারে । তাছাড়া অশোক পড়ায় ছেলেদের কলেজে , একালের মেয়েদের ব্যাপার স্যাপার তার তো জানার কথা নয় । তবে কি সে ইদানীং মেয়েদের সঙ্গেও মিশছে । স্মৃতির কণ্ঠে এসব উচ্চারণের সময় থাকে লঘুতার আঁচ। অশোক উত্তরে বলে, 'ইদানিং নয় , আজীবন বলতে পারো । স্মৃতি - (হেসে উঠে) বাব্বা , ডুবে ডুবে এত জল খাওয়া হচ্ছে - কে সে নারীরত্ন শুনি ।'৫১

অশোক - "সে তুমি কিন্তু তুমি নও , সে তোমার শরীর , তোমার মন , কিন্তু ঠিক তুমি নও , অন্য কেউ " - এখানে অশোকের কণ্ঠে নবীন প্রেমিক সুধাব্রতেরই প্রতিধ্বনি । ফাল্গুনী দেখিয়েছেন , নারী সম্পর্কে পুরুষদের ধারণা সব প্রজন্মেই এক, অপরিবর্তিত । বস্তুত , ফাল্গুনীর এই নারীভাবনা নারী সম্পর্কে প্রচলিত রোম্যান্টিক রহস্যময়তারই দ্যোতক । এই চিত্রনাট্যের আর একটি কৌতুককর ব্যাপার হল,রবীন্দ্রচেতনার স্বীকৃতিদান।যে হাংরি প্রজন্ম এবং তাঁদের কুলবর্ধন ফাল্গুনী আধুনিক কবিদেরও নানা সময় নানাভাবে আক্রমন করেছেন- সেই কবি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহিষ্ণু হয়েছেন। এর প্রমাণ নবম দৃশ্য থেকে শুরু হচ্ছে। ঐ দৃশ্যে পর্দা অন্ধকার। উদাত্ত কণ্ঠে গান ভেসে আসে - 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো / সেই তো তোমার আলো/সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো/সেই তো তোমার ভালো। ' । ৫২

পর্দার এক কোণে পাশাপাশি দুটো নক্ষত্র । গানের সঙ্গে নক্ষত্রদুটো পর্দার মাঝখানে - ক্লোজ - শট - দুটি চোখের তারা , সম্পূর্ন চোখ । আলো ঝাপিয়ে পড়ে পর্দায় । ছেঁড়া গেঞ্জি, আধময়লা লুঙ্গি পরা সুধাব্রতের মুখে সম্রাটের হাসি , গানটি ক্রমশ আস্তে হয় । সুধাব্রত এগিয়ে যায় ঘরের কোণে - ঢাকাচাপানো থালা। সুধাব্রত ঢাকনা তোলে, শূন্য থালা - খাবার নেই। এবার সে পাঞ্জাবীটা পরে নেয়। এখানে পর্দার মাঝখানে যে দুটো চোখ ফাল্গুনী দেখিয়েছেন - সে দুটি কার চোখ ? তারা কি সুধাব্রতেরই দুটি চোখের প্রতিভাস ? নাকি এই চোখ দুটি রবীন্দ্রনাথের ? কীসের ক্ষুধা আলোকিত ও জ্বলন্ত ঐ চোখ দুটিতে ? সৌন্দর্যের নাকি বিশ্বগ্রাসী ভোগবাসনার ? কীসেরই বা তেজদীপ্তি সুধাব্রতের মধ্যে ? কেননা তার মুখে সম্রাটের হাসি!

এরপর ক্যামেরা ঘুরে যায় দশম দৃশ্যে । সেখানে দেখানো হয় অনিন্দিতার ঘর অনিন্দিতা বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে আছে । সেখানে সুধাব্রতের ঠোঁট , মুখ , চোখ হাসি , সম্পূর্ণ শরীর ভেসে ওঠে । দেখানো হয় অনিন্দিতার মুখ ; সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে তারপর বালিশে মুখ গুঁজছে । একাদশ দৃশ্যে আবার সুধাব্রত'র ঘর । সে ঘরে ঢোকে হাতে এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে , খেতে খেতে আবৃত্তি করে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা -

'তুমি মোরে দিয়েছ কামনা / অন্ধকার অমা রাত্রি সম / তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম / মিলাইয়া স্বপ্ন সুধাসম /'৫৩ .

পরে আবৃত্তি থামায়, মুড়ি খায় ঘর থেকে বার হয়ে যায়।ফাঁকা ঘর , দুটো আরশোলা ফড়ফড়িয়ে চলে যায় , সুধাব্রত'র কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত - 'আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন / তোমাতে করিব বাস / দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস ' ।৫৪

গান শেষ হলে সিগারেট ধরায় । এভাবে সুধাব্রত'র প্রেমভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যের রোম্যান্টিক ভাবনাকে মিলিয়ে দেন ফাল্গুনী । দেখান , সুধাব্রত'র মধ্যে প্রেমের ভাববাদী প্রেরণা কিভাবে ক্রিয়াশীল এবং অনিন্দিতার মধ্যে শরীর নির্ভর বাস্তবতার ।

দশম দৃশ্যের নিবিড় পাঠ তো সেরকমই বলে । রবীন্দ্রনাথও তো নারীপুরুষের প্রেম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ জাতীয় একটি ধারনারই সূচনা করেছিলেন । বলেছিলেন , 'পুরুষ প্রেমের আইডিয়া'র সাধনা করে , আর নারী রিয়ালের ।'৫৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশী - কুসমের প্রেমে শশীর মুখ দিয়ে বলিয়ে ছিলেন, 'শরীর , শরীর তোমার মন নাই কুসুম' ? ৫৬.

দ্বাদশ দৃশ্যে অশোকের ঘরে চলে যায় ক্যামেরা । একরাশ ধোঁয়া (সম্ভবত সিগারেটের) ছেড়ে আরাম কেদারা থেকে উঠে পড়ে অশোক । টেবিলে হুইস্কির বোতল , মাংসের বড়া , আলমারি - ঠাসা বই, সোফা কৌচ, বুকশেলফ । ঘড়িতে রাত একটা । আশ্চর্য শূন্য চারপাশ, শূন্য খাট ,শূন্য আরাম কেদারা । বুকশেলফ থেকে সে একটা বই তুলে নেয় । চারিদিক বই বই , সার সার বই , অশোকের চশমা আঁটা শূন্য চোখ - সে পায়চারি করে , বই খসে পড়ে হাত থেকে । একটা বইকে ক্যামেরায় প্রকট করে তোলা হয় (existentialism and humanism : Jean Paul Sartre) বইটা মাড়িয়ে, অনিন্দিতা ডাক দেয় মা - মা - ; বিরাট প্রান্তরে, শাদা রোদ্দুরে উঁচু কালো পাহাড় গুহা থেকে বেরিয়ে আসে স্মৃতিময়ী ও অশোক । বন্য চেহারা দু'জনের, গা ভর্তি লোম অশোকের, মুখভর্তি দাড়ি , আদি মানুষ - মানুষী দু'জন। আলোর ভিতর দাঁড়িয়ে তারা আলিঙ্গন ও চুম্বন করে । এরপর চতুর্দশ দৃশ্যে অশোককেই শুধু দেখানো হয়, তার ঘরে স্মৃতিময়ী ও অশোকের সেই পুরনো সংলাপ শোনান হয় - 'বাব্বা , ডুবে ডুবে এত জল খাওয়া হচ্ছে - কে সে নারীরত্ন শুনি - সে তুমি কিন্তু তুমি নও , তোমার শরীর , তোমার মন কিন্তু তুমি নও । অন্য কেউ ।'৫৭

মন্তাজে আসে স্মৃতিময়ীর হাসি , পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদি । লক্ষণীয় , স্মৃতিময়ী অশোককে তুলে আনছে ছবির ভিতর প্রবেশ করে । তবে বর্তমানের অশোক কি তার কাছে অবান্তর ? আদিমতায় ফিরে যাবার জন্য যে যৌবন দরকার তা কি এখনকার অশোকের মধ্যে অনুপস্থিত ?

সেই জন্যই কি দ্বাদশ দৃশ্যে অশোকের নিঃসঙ্গতা , শূন্যতা ও অসহিষ্ণুতাকে দেখানো হয়েছিল ? নর - নারীর সম্পর্কের সূত্র যে আদিযৌনতা তাই তো এই রচনার প্রতিপাদ্য । কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী প্রৌঢ়ের সেখানেও এক সমস্যা । সে সমস্যা রোম্যান্টিক অতৃপ্তি ও অনুসন্ধিৎসার । তাই অশোক এমন এক নারীর কথা বলে - যে তার স্ত্রী নয় - 'সে তুমি কিন্তু নও, তোমার শরীর তোমার মন। কিন্তু তুমি নও, অন্য কেউ'। আবার ফাল্গুনী এও দেখিয়েছেন যে , স্মৃতিময়ীর ফটোগ্রফের ভিতর প্রবেশ করা একটা ঘোর মাত্র । দুঃস্বপ্নের মতো , চেতনা হারিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীর নরকদর্শনের মতো । ৫৮

কেননা পরের দৃশ্যে অনিন্দিতা বলেছে যে, তার মায়ের সংজ্ঞালোপ ঘটেছিল । যাইহোক , পঞ্চদশ দৃশ্যে আবার সুধাব্রতের ঘর দেখানো হচ্ছে । যেখান থেকে চিত্রনাট্যের শুরু সেখানে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তার পরিসমাপ্তি । সেদিক থেকে এর কাহিনী বিন্যাসকে বৃত্তাকার বলা যায় । এবার সুধাব্রতের ঘরে রেডিও বাজে । সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই কলি -'বল গোলাপ মোরে বল , তুই ফুটবি সখী কবে ?' ৫৯

ঘরে মুখোমুখি সুধাব্রত - অনিন্দিতা। অনিন্দিতা 'বলে জানো, মা কালরাত্তিরে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন'।সুধাব্রত - অনেক রাত অব্দি খাতা দেখেন , সেই জন্য হয়তো ।অনিন্দিতা - 'কী জানি , আজ কীরকম খিটখিটে মেজাজ , বুঝতে পারছি না ।'৬০

এরপর অনিন্দিতা সুধাব্রত'র খুনসুটি ও প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যের সমাপ্তি ঘটে ।চারটি চরিত্রকে নিয়ে 'মানুষমানুষী' চিত্রনাট্যে ফাল্গুনী একটি প্রেমেরই আখ্যান গড়েছেন । প্রবীন প্রজন্মের প্রেমটি সার্থকতা পায়নি , কারণ তাদের সেই বয়স এবং পরিস্থিতি নেই । ফলে প্রবীন অশোক শূন্যতা , নিঃসঙ্গতা ও ক্রোধকেই আঁকড়ে ধরেছে । আর উত্তর - ফাল্গুনী, স্মৃতিময়ী আপন লিবিডোর অচরিতার্থতায় উন্মাদ না হলেও দুঃস্বপ্ন মথিত আতঙ্কে অচৈতন্য হয়ে গেছে । মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে তার।

উল্টোদিকে তরুণ প্রজন্মের সুধাব্রত ও অনিন্দিতার রোম্যান্টিক প্রণয় সার্থকতার দিকে গেছে। বয়সের সুবিধা তারা পেয়েছে। যদিও সুধাব্রত'র বুকে রোম্যান্টিকতার অসুখ বিদ্যমান। সামগ্রিক ভাবে ফাল্গুনীর নাটক বা চিত্রনাট্যের মধ্যে দুটি জিনিস প্রকট । মার্টিন এস্‌লীনের ভাষায় The sense of metaphysical anguish at the absurdity of the human condition ও A similar sense of senselessness of life , of the inevitable devaluation of ideals.৬১

তাছাড়া প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে যেমন চাচাছোঁলা যৌনতার রুক্ষতা আছে , তেমনই রয়েছে প্রতীক ও চিত্রকল্পের কাব্যিকতা । সাধারণ ভাবে মনে হয় , এতে তাঁর নাটকের ভাষা বেপথু ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । আসলে তা নয় । কারণ The plays of the theatre of the Absurd are primarily intended to convey a poetic image or a Complex pattrern of poetic images ; they are above all a political form। ৬২ .

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায়চৌধুরী , ইল্লত , নাটক সমগ্র , কবিতীর্থ প্রকাশনী , কলকাতা , ১৪০৫ পৃ:১৪ ।

২. তদেব পৃ : ১৪ ।

৩. তদেব পৃ : ১৫ ।

৪. তদেব পৃ : ১৬ ।

৫. তদেব পৃ : ১৭ ।

৬. তদেব পৃ : ২২ ।

৭. তদেব পৃ : ২৬ ।

৮. তদেব পৃ : ২৮ ।

৯. তদেব পৃ : ৩৫ ।

১০. তদেব পৃ : ৩৭ ।

১১. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১২. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১৩. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১৪. তদেব পৃ : ৩৮ ।

১৫. তদেব পৃ : ১৭ ।

১৬. তদেব পৃ : ২৮ ।

১৭. মলয় রায়চৌধুরী , হিবাকুষা , নাটকসমগ্র , কবিতীর্থ প্রকাশনী , কলকাতা , ১৪০৫ পৃ : ৬২ ।

১৮. তদেব পৃ : ৬২ ।

১৯. তদেব পৃ : ৬২ ।

২০. তদেব পৃ : ৬৩ ।

২১. তদেব পৃ : ৬৩ - ৬৪ ।

২২. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৩. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৪. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৫. তদেব পৃ : ৬৫ ।

২৬. Allardyce Nicoll , The theory of Drama , Doaba House, London , 1974 , page = 214 ।

২৭ক. Martin Esslin, Arthur Adamov : The curable & measurable / The theatre of Absurd , Pelican Books , Britain , 1968 Page 113 ।

২৭খ. মলয় রায়চৌধুরী , নপুংপং , নাটকসমগ্র , কবিতীর্থ প্রকাশনী , কলকাতা ,
১৪০৫ পৃ : ৭১ ।

২৮. উজ্জল কুমার মজুমদার , সাহিত্যের রূপরীতি , প . ব . রাজ্য পুস্তক পর্ষদ , কলকাতা , ১৯৮৫ , পৃ : ১৫০ ।

২৯. ফাল্গুনী রায় , কালো খ্রীষ্ট / আমার রাইফেল আমার বাইবেল , আলিপুরদুয়ার , জলপাইগুড়ি , মনচাষা , ২০০২ পৃ : ৮৯ ।

৩০. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩১. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩২. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩৩. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩৪. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩৫. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩৬. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩৭. তদেব পৃ : ৯০ ।

৩৮. ফাল্গুনী রায় , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার, ২০০২ ,পৃ :৯৫ ।

৩৯. তদেব পৃ : ৯৬ ।

৪০. তদেব পৃ : ৯৭ - ৯৮ ।

৪১. তদেব পৃ : ৯৯ ।

৪২. ফাল্গুনী রায় , অন্তিম জরায়ু , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার , ২০০২ ,পৃ : ১০৬ ।

৪৩. তদেব পৃ : ১০৭ ।

৪৪. তদেব পৃ : ১০৮ ।

৪৫. তদেব পৃ : ১০৮ ।

৪৬. তদেব পৃ : ১০৯ ।

৪৭. তপোধীর ভট্টাচার্য , উত্তর লেখ / আমার রাইফেল আমার বাইবেল, মনচাষা, আলিপুরদুয়ার, ২০০২ ,পৃ : ১০৯ ।

৪৮. ফাল্গুনী রায়, মানুষ মানুষী, আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা, আলিপুরদুয়ার, ২০০২ ,পৃ : ১০১ ।

৪৯. তদেব পৃ : ১০৪ ।

৫০. তদেব পৃ : ১০৪ ।

৫১. তদেব পৃ : ১০২ ।

৫২. তদেব পৃ : ১০২ ।

৫৩. বুদ্ধদেব বসু , বন্দীর বন্দনা , আধুনিক বাংলা কবিতা , এম . সি . সরকার কলকাতা , ১৯৮০ পৃ : ১৬৬ ।

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / মায়ার খেলা , রবীন্দ্র রচনাবলী , ৪র্থ খন্ড , প . ব . সরকার , ১৯৮৭ পৃ : ১৪৮ ।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / নারীর উক্তি ও পুরুষের উক্তি / রবীন্দ্র রচনাবলী , প . ব . সরকার , ১৯৮০ পৃ : ৩৩৯,৩৪১ ।

৫৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল নাচের ইতিকথা, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১৩৯২ পৃ : ৯৪ ।

৫৭. ফাল্গুনী রায় , মানুষ মানুষী , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার , ২০০২ ,পৃ : ১০৫ ।

৫৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , চন্দ্রশেখর / বঙ্কিম রচনাবলী , পাত্রজ পাবলিকেশন , কলকাতা , ১৯৮৩ , পৃ : ৩৫৬ ।

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / রবীন্দ্র রচনাবলী , চতুর্থখন্ড , প . ব . সরকার , ১৯৮৭ পৃ : ৫২ ।

৬০. ফাল্গুনী রায় , মানুষ মানুষী , আমার রাইফেল আমার বাইবেল , মনচাষা , আলিপুরদুয়ার , ২০০২ ,পৃ : ১০৫ ।

৬১. Martine Easlin , The Theatre of the Absurd , pelican books , Britain , 1968 Page 24 ।

৬২. Martin Esslin , Absurd Drama , Penguin , Britain , 1980 – Page : 13 ।

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বিক মূল্যায়ন ও উত্তর কালের উপর প্রভাব

হাংরি জেনারেশান আন্দোলনের পর কমবেশী ৪৪ বছর পার হয়ে গেছে । ইতিমধ্যেই ঐ আন্দোলনের শরিক অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন । কেউ কেউ লেখা ছেড়ে দিয়েছেন । অনেকেই হাংরি আন্দোলনের নির্মোক ছাড়িয়ে অর্জন করেছেন নিজস্ব ধরনের অভিজ্ঞান । ভিন্ন পত্রিকা ও গোষ্ঠীতেও চলে গেছেন দু'একজন । এক কথায় সংঘ ভেঙে গেছে । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও ইতিমধ্যে নানা বাঁক নিয়েছে । প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা দিয়ে হাংরিরা সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন । কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার রেশ এখন বাংলা সাহিত্য থেকে উঠে গেছে । এখন তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য পত্রেও সব শ্রেণীর , সব অঞ্চলের , সব মতাদর্শের লেখকদের স্থান দেওয়া হয় । উল্টো দিকে , ছোট পত্রিকা বা লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোও পাল্টে গেছে ।কলেবরে, বিষয়বস্তুতে , প্রকাশভঙ্গীতে , লেখক সূচিতে তারা যে কোনো বাণিজ্যিক পত্রিকার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে । সর্বত্র এখন সমন্বয় ।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার যে অভিযোগ একদা হাংরি সাহিত্যের সম্পর্কে প্রবল ছিল - অন্যদের ক্ষেত্রে, আজ যেন তা কোনো ব্যাপারই নয় । যৌনতা নগ্নতা , কুশ্রীতা এখন সাহিত্য , শিল্প , চলচিত্র , সংবাদপত্র ও দৈনন্দিন জীবনে জল হাওয়ার মত সচল । সেদিক থেকে এই মুক্ত বানিজ্য ও মুক্ত সংস্কৃতির খোলা হাওয়ায় অস্পৃশ্য না ভাবারই কথা ।তবে হাংরিদের যৌনতা বাণিজ্যিক নয় । যৌনতা তাঁদের বিষয়ও নয়, শুধুই আক্রমণের একটি অস্ত্র ।

তবু সাধারণ ভাবে আজও হাংরি সাহিত্যের নিন্দার বিষয় এবং প্রদূষণের দায়ে অভিযুক্ত । আসলে , এঁদের রচনাগুলিকে সামগ্রিক ভাবে না পাঠ করার জন্য যেমন এটা হয়েছে , তেমনই আগে থেকে এঁদের লেখা সম্পর্কে একটা সংস্কার লালিত হয়ে আসছে ।

অনেক সময়ই ইতিহাসের চেয়ে মিথকে গুরুত্ব দিই আমরা । তার উপর যদি ঐতিহাসিক তথ্যগুলোর দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে । হাংরিদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে । তাই হাংরি সাহিত্য ও ইতিহাসের পর্যালোচনা দরকার । প্রসঙ্গত বলা যায় যে , ক্ষীণভাবে হলেও এই এই আন্দোলন নানা স্থানে , নানা ভাবে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া শুরু করেছে । যেমন , ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ অষ্টম উজ্জীবনী পাঠমালায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা সভায় সভাপতি ছিলেন তৎকালীন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় , আর বক্তা ছিলেন মলয় রায়চৌধুরী ।

২০০৩ সালের ৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃপক্ষ তাদের সভাঘরে মীর মশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেন । তাতে বিষয় ছিল ‘বাংলা কবিতার পালা বদল কৃত্তিবাস থেকে হাংরি জেনারেশন’। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এই নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা দেন কবি উৎপল কুমার বসু । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকারও সভায় উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া , জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে আকাদেমির মাসিক আলোচনা পত্রিকায় হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলনের রিভিউ করা হয় । আলোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এই আন্দোলনে উত্তর - আধুনিকতার লক্ষণও অনুমান করেন । ৩

পরে এই গ্রন্থটিরই আলোচনা ২০০০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে দেশ পত্রিকায় বার হয় । সেখানে আলোচক সুধীর চক্রবর্তী লেখেন ,- ‘বাংলা সাহিত্য সমাজে হাংরি আন্দোলন একটা ইতিহাসের অংশ অথবা একথাও ঠিক যে , হাংরিদের লক্ষ বা সিদ্ধি যাইহোক , তাঁদের কলম বেশ শক্তিশালী ’। ৪

এসবই যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল্যায়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু মূল্যায়নের সূত্রগুলোর কিছুটা বিস্তার প্রয়োজন । হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল্যায়নে দুটি দিক দেখা দরকার । একটি হচ্ছে এঁদের সাংগঠনিক । অন্যটি হচ্ছে শিল্প দৃষ্টির ব্যাপার । দুটি ক্ষেত্রেই তাঁরা কী করতে চেয়েছিলেন এবং কী করতে পেরেছিলেন তা বিচার্য ।

আন্দোলনের বহুকাল পরে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্যের প্রাণশক্তি আজ কতটা প্রাসঙ্গিক তারও অনুসন্ধান প্রয়োজন । একটা সাহিত্য আন্দোলন কতটা ফলপ্রসূ হয় তার দুটি উদাহরণ 'সবুজ পত্র' ও 'কবিতা' রেখে গেছে । চলিত গদ্যের যে আভিমুখ্য চালিত করেছিল সবুজপত্র সেখান থেকে বাংলা গদ্য আর পিছন ফিরে তাকায় নি । একই ভাবে কবিতা পত্রিকা বাংলা কাব্যে যে আধুনিকতার স্থান করে দিতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই । কুড়ি ও ত্রিশের দশকের অন্যান্য বাংলা কবিতার ধারাগুলো কিন্তু গন্তব্য পায়নি কোনো ।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সম্পর্কেও একটা সাধারণ ধারণা এই যে , তা ছিল একটা সাময়িক আলোড়ন । নেহাৎ তথাকথিত অশ্লীলতা ছড়িয়ে কিংবা পুলিশী ধরপাকড়ের উত্তেজনা হেতুই এই আন্দোলনের অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছিল । কিন্তু সত্যি কি হাংরি জেনারেশন আন্দোলন কয়েকটি বছরের সীমায় পরিকীর্ণ শুধু ? এর কোন উত্তর নেই ? সে উত্তর যাবার আগে, প্রথম আবির্ভাব কালেই হাংরি আন্দোলন সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তার পরিচয় নেওয়া যাক । হাংরি জেনারেশন বুলেটিন প্রকাশিত হবার আগে বাঙালী তরুণ কবি সমাজে 'কৃত্তিবাসে'র প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী । কৃত্তিবাসের শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা উৎপল কুমার বসুরা অল্প কিছুদিনের জন্যে হাংরি জেনারেশন বুলেটিনে লিখেওছিলেন । তারপর নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা ।

একটা কারণ যদি পুলিশের ভয় , তো অন্য কারণ আদর্শগত। ১৯৬৫ সালে কৃত্তিবাসের বিশতম সংকলনে সম্পাদক বলেছিলেন যে, হাংরিদের মতো কোনো আন্দোলনে তাঁরা বিশ্বাস করেন না । তাঁরা বিশ্বাস করেন না । অথচ হাংরিদের প্রভাব কৃত্তিবাসকে ইতিমধ্যেই সংক্রামিত করতে শুরু করেছিল । এ বিষয় এক কৃত্তিবাসীর সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়,-

> অ্যালেনরা আসার পরে ১৯৬৩ তে প্রকাশিত কৃত্তিবাস এর ষোড়শ সংখ্যায় যেন রাতারাতি বদলে গেল বাংলা কবিদের লাজুক চেহারা । ভাষা , প্রকরন , এমনকী লিখন ভঙ্গিমাতেও দেখা দিল এক প্রবল নতুনত্ব ।

স্বভাবনম্র , স্থিতধী প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এনে ফেললেন সঙ্গম, আরশোলা, ইঁদুর, মাকড়সা, এমনকি ফ্রয়েডকেও ।.....বীট কবিদের প্রভাব খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল , যেমন অস্থায়ী হয়েছিল হাংরি জেনারেশনের সাময়িক মত্ততা । (কৃত্তিবাস এবং কৃত্তিবাস , সমবেন্দ্র সেনগুপ্ত)।৫

এখানে বলা দরকার যে ঐ সময় বীট এবং হাংরি জেনারেশনের মধ্যে একটা সম্পর্ক রচিত হয়েছিল । বীট এবং হাংরিকে তখন থেকেই এক ভাববার একটা চলনও গড়ে উঠেছিল । তবে সেটা যে ঠিক নয় তা আমরা পরে আলোচনা করব । আসলে, 'কৃত্তিবাসের ষোড়শ সংখ্যা থেকেই ঐ পত্রিকার অনেক কবির ভাষা পাল্টে যায় । সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন । এরকম আরও আছে । যেমন ,শংকর চট্টোপাধ্যায় । যিনি লিখতেন-

যাত্রা শেষ তোর হল , জনপদে গির্জার গুহায়
হৃদয়ে অতৃপ্ত পাওয়া , অমৃত লগ্নের বেলা যায় - ৬ .

তিনিই লিখলেন -

ঘৃণা বা সমতা দিয়ে খালাসীটোলায় যাই , পারুলের বাড়ি
শেষদান ভুল করে নিজেকে লুকিয়ে আমি হত্যাকারী সাজি।৭

এমনকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত লেখেন , 'আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে / থাকি তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখব বলে।' ৮

হাংরি আন্দোলনের প্রবল বিরোধী এই দুই কবির রচনাতেই যখন অজ্ঞাতসারে হাংরিদের শব্দ ও ভাবানুষঙ্গ এসে গিয়েছিল তখন অনুমান করা যায় বাকিদের রচনায় ব্যাপারটা আরও কত ব্যাপকতা পেয়েছিল ।

আরও একটা ব্যাপার দেখা গেল । এতকাল নতুন কোনো পত্রিকা বার হলে এবং তাতে সাহিত্য নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা থাকলেও আন্দোলন শব্দটিকে বিশেষণ বা অভিপ্রায় হিসাবে জুড়ে দেওয়া হত না । কিন্তু হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সংঘটিত হবার পর 'শ্রুতি' ও 'এই দশক' পত্রিকা তাদের প্রথম সংখ্যাগুলি থেকেই আন্দোলন শব্দটিকে জুড়ে দেয় । মলয় রায় চৌধুরীর অনুসরনে পুষ্কর দাশগুপ্ত 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই কবিতা সম্পর্কে তাঁদের কিছু সূত্র জুড়ে দেন । বক্তব্যে অবশ্য মলয়দের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন তিনি । লেখেন , বর্তমান কালের কবিদের আন্দোলন এবং চরিত্র পৃথিবীর কাব্য ঐতিহ্যের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত । ৯ এখানে আন্দোলন শব্দটি লক্ষণীয়।'শ্রুতির' প্রথম সংখ্যাটি বেরিয়েছিল ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে । ১৯৬৬ সালে মার্চ মাসে বেরোয় 'এই দশক' পত্রিকার পরিবর্তিত নতুন রূপ । সেখানে পত্রিকাটিকে বলা হয়েছে , 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের মুখপত্র এবং সমকালীন সাহিত্য আন্দোলনের দিগদর্শন ।' ১০

পরবর্তী কালে 'শ্রুতি' পত্রিকার সাহিত্য চর্চা 'শ্রুতি আন্দোলন' এবং 'এই দর্শক' পত্রিকার সাহিত্য চর্চা 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' রূপে আখ্যাত হয়েছিল । বলা দরকার , 'শ্রুতি আন্দোলন' কবিতার প্রকরণগত পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই সীমিত ছিল । বিষয়, জীবনবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক তরঙ্গগুলিকে উপেক্ষা করে শুধু কবিতার ছন্দ , আকার ও বস্তুরূপ নির্মাণ করে আন্দোলনের প্রাণ সঞ্চার হয় না । প্রকাশভঙ্গীর একটা বিশেষ ক্ষমতা এতে প্রকাশ পেলেও , জীবনের সংরক্ত উত্তাপ , সংঘর্ষ ও বেদনা তাতে সজীব হয়ে ওঠেনা। বস্তুনির্ভরতা হয়তো জীবনের একটা দিক , কিন্তু ভাবজীবনের দ্বন্দ্বও চাই । জীবনের উদ্বেলতা নিয়েই তো আন্দোলন । সুতরাং 'শ্রুতি আন্দোলন' আজ বিস্মৃতিতে চলে গেছে । শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের ও প্রকৃতি ও পরিণতি একই। উপরন্তু শাস্ত্রবিরোধী লেখকেরা দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, উল্টোরথ পত্রিকায় সমান্তরালভাবে লিখে আন্দোলনের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারেন নি । অতীন্দ্রিয় পাঠকের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য,-

> হাংরিরা যেমন সাহিত্যের বিষয়কেই দুমড়ে মুচড়ে দিতে চেয়েছিল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা

তাঁদের আমদানী করতে হয়েছিল ;'শাস্ত্রবিরোধী ও শ্রুতি'র লেখকেরা কিন্তু বিষয়ের , কোন গুরুত্বই দিতে চাইলো না । আঙ্গিক ও ভাষার চর্চাই ছিল তাঁদের লক্ষ ।১১

হাংরিদের আন্দোলনের সমসূত্রে , হাংরি আন্দোলনের বিভাজন পর্বে ১৯৬৭ সালে 'ধ্বংসকালীন আন্দোলন' নামে আরও একটি সাহিত্য আন্দোলন সূচিত হয় , সাতখানি সংকলনের প্রকাশের পর মাঝপথে 'সাম্প্রতিক' পত্রিকা মেনিফেস্টো ছেপে এরকম একটি আন্দোলনের ঘোষণা করলো । শুধু তাই নয়, ১৯৫৭ সালের আবির্ভূত 'কবিপত্র' পত্রিকাকেও সহযোগী করে নিল তারা । অভিজ্ঞতা , বিশুদ্ধতা ও অকৃত্রিমতাকে কবিতার আদর্শ করা হল । এই আদর্শের মধ্যেই বা নতুনত্ব কী ? বাস্তবে দেখা গেল পবিত্র মুখোপাধ্যায় , প্রভাত চৌধুরী , কানন কুমার ভৌমিকের কবিতার মধ্যে হাংরি কবিদের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । এ ব্যাপারে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণেরই একটি অংশকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যাক -

"ধ্বংসকালীন কবিতা - এই শিরোনামে ক সংখ্যক কবিতা ইবলিশের আত্মদর্শন - পবিত্র মুখোপাধ্যায় । শুরুটাই ছিল -

হাড়ি কাঠে মাথা পেতে খচ্চরের বাচ্চা শুয়ে আছি
তুই শালা যোনিদ্বারে মাথা ঠুকে হাফাচ্ছিস গর্ত থেকে নেমে
আমাকে ইবলিশ বলে সেজদা করিনি অবিশ্বাসী ।

তেরো পৃষ্ঠার কবিতাটিতে কোথাও দাড়ি কমা সেমিকোলন বাক্যের শেষে ব্যবহার করা হয়নি , শুধু প্রশ্নচিহ্ন ছিল । প্রভাত চৌধুরীর খ সংখ্যক কবিতা -

মৃতপ্রায় আলোগুলো গর্জন করছে ভীষন ক্রোধে ফুঁসে উঠেছে
অন্ধকারের কালো ঘাম টিকটিকির জিভে চেটে খাওয়ার সঙ্গে

আমি মেফিস্টোফিলিস শয়তানের দূত
বিছানায় সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটছি .....

গ সংখক কবিতার কানন লিখলো -

সব শেষে অন্ধকার থেকে নেমে এলো
এক গুপ্ত বিদ্যুৎ ঝলক
সমস্ত আকাশ চিরে গেল
নির্জন অপারেশন ঘরে
ঠান্ডা গলানো রক্ত
লিঙ্গ জঠরে ধারণ করলেন সর্বজ্ঞ ....."১২

এসব থেকে বোঝা যায় সমকালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন পূর্ববর্তী ও সমকালীন পত্র পত্রিকার সাহিত্য চর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । কি ভাবে সাহিত্য চর্চা হবে শুধু সেই রূপরেখা রচনা নয় , অন্যদের সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গীকেও হাংরিরা সংক্রামিত করে চলেছিলেন । এটা হাংরিদের একটা বিরাট সাফল্য বলতে হবে । হাংরিরা এটা পেরেছিলেন , কারণ সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক , রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও ভাঙনের ভয়াবহতাগুলোকে হাংরিরা ধারণ করতে পেরেছিলেন । হাংরিদের ইস্তাহারে ও সাহিত্যকর্মে যুগের অভিজ্ঞতা ও অস্থিরতাকে মুদ্রিত করতে পেরেছিলেন । হয়তো এ কারনেই রাষ্ট্রযন্ত্রও সতর্ক হয়েছিল - এঁরা কোনো অতিবিপ্লবী কিনা , পুলিশী অভিযানের কারণও হয়তো সেটাই । বাংলাভাষার আর কোনো সাহিত্য আন্দোলনে এ রকম সর্বাত্নক আগ্রাসী আক্রমণ দেখা যায় নি । একমাত্র হাংরিরাই সাহিত্য থেকে রাজনীতি ধর্ম থেকে অশ্লীলতা , আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে শিরোনাম করে ১ থেকে ১০ পৃষ্ঠার বুলেটিন বিলি করেছেন । যেমন , সাহিত্য কর্মে , তেমনই ঐ বুলেটিন গুলিতে ঐ বিষয় গুলি সহ , প্রেম , রোম্যান্টিকতা , সমাজ , প্রভৃতিকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে ।

তারা নানা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে মুখোশ , চিঠি ইত্যাদি পাঠিয়েও আক্রমণ করেছিলেন । শুধু কলমের আঁচড় নয় , সাহিত্য বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন , একটি সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি । মলয়ের ভাষায় তাঁদের সাহিত্য ও জীবনের লক্ষ 'সর্বগ্রাস'। আবার সাহিত্যকে সমাজের সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করার কথা মার্কসবাদও বলে ।মার্কসীয় সাহিত্য শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ছবি ও দ্বন্দ্ব মেলে । লক্ষণীয় , হাংরি জেনারেশন সাহিত্যেও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের কথা আছে । শৈলেশ্বর লিখেছিলেন ,

> অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান আমরা । অর্থহীন শূন্যতা পরিবেশের সন্তান আমরা । বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের জন্ম । শোষণ হত্যা ও ধর্ষনের মধ্যে আমাদের বৃদ্ধি ।.....দাসত্বের অতীতকে অস্বীকার করবার সময় আজ সুবিধাবাদীদের মুখোশ খুলে দেবার সময় আজ । ভোগ নয় , ত্যাগ করতে শিখেছিল ভারতবর্ষের মানুষ ; শিখেছিল নাচার হয়ে , শেখানো হয়েছিল তাকে । উৎপাদনের চাবিটি যাতে চিরকাল নিজেদের জিম্মায় থাকে নিজেদের ভোগের পথ যেন কাঁটায় ছেয়ে না যায় , তারই জন্য আয়োজন এই ত্যাগব্রতের ।১৩

তিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, বুর্জোয়াদের বিরোধিতা করেছেন । লিখেছেন , 'ভারতবর্ষে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান - বিরোধী নন কর্মাসিয়াল সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে হাংরি জেনারেশন '।১৪

তবে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রতিবাদ, বিশ্লেষণ ও সমাধান এই তিনটি স্তরের যে বিন্যাস থাকে হাংরিদের মধ্যে তা নেই ।

এঁদের সম্পর্কে দেবেশ রায় লিখেছিলেন ,

> আমরা বুঝতে পারিনি স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশক ব্যাপী বঞ্চনা আর মূঢ়তার বিরুদ্ধে অধৈর্যে অস্থির এই লেখাগুলো আঘাত করতে চাইছে এই পুঁজি সমাজের গায়ে ভিতে ..... রাজনীতির নকশালপন্থার সঙ্গে বাসুদেব সুভাষের লেখার (হয়তো সমগ্র হাংরি জেনারেশনের) দার্শনিক মিল আছে । সামাজিক ভাবে এই দুটি আন্দোলনেরই ভিত্তিভূমি নিম্নবিত্ত সমাজের হতাশা , ক্লান্তি আর অধৈর্য । আর কর্মপ্রণালীর দিক থেকে এই দুটো আন্দোলনেরই পদ্ধতি স্বতোপ্রণোদনার ওপর নির্ভর করে প্রচলিত ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এনে ইতিহাসের দিক থেকে নকশাল পন্থা যেমন রাজনীতিতে তেমনই সাহিত্যেও হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া নয় ।১৫

এ কথা খুবই সত্য যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন ক্রিয়া নয় , তা প্রতিক্রিয়া মাত্র । হাংরিরা লক্ষের দিক থেকে শ্রেণীমুক্তির মার্কসীয় আদলটি গ্রহ করেন নি । এখানে স্মরণে আনা প্রয়োজন যে, ছাত্রজীবনে শৈলেশ্বর, বাসুদেব দু'জনেই বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ।

মলয়ও প্রথম যে গ্রন্থটি লিখেছেন বলে জানিয়েছেন , তার নাম - মার্কসবাদের উত্তরাধিকার । হয়তো এসব কারণেই এঁদের হাতে যৌনতাও শেষ পর্যন্ত তীক্ষ্ম প্রতিবাদের সমার্থক হয়ে উঠেছে । হাংরিরা দুটো প্রধান কাজ করেছিলেন । এক - ব্যক্তির অসহিষ্ণু অস্তিত্বের প্রকাশ । দুই - ঐ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । ফলে শ্রেণী সংঘর্ষ বা অর্থনৈতিক রূপান্তরের ছবিটি আসে নি । তবে সাবঅলটার্ন সমাজের ছায়াটি বাংলা সাহিত্য প্রলম্বিত হয়েছে । শৈলেশ্বরের ভাষায় -

> এই সভ্যতার কাছে আমরা উপজাতি, অন্ত্যজ, ও ছোটলোক ।কিন্তু আগামী ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ছোটলোকদের আনন্দ সঙ্গীতই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত থাকবে । ১৬

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মূল্যায়নে এ কারণে বাস্তবতার দিকটিকেই বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। বাস্তবতা এবং প্রত্যাঘাত এই দুটি মেরুর মধ্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন অবস্থিত। মলয় বলেও ছিলেন, 'যুদ্ধ পৃথিবীর মুখ বদলে দেয় না। বদলায় মানুষের মুখ, নিজের ও নিজের চতুর্দিকের ইমেজ তার মধ্যে যেমন ভাবে পুষ্ট হয়'। ১৭

হাংরিরা নিজের ও নিজের চতুর্দিকের ইমেজকেই তাঁদের লেখায় পুষ্টি দিয়েছিলেন। আসলে হাংরিরা কোনো অবক্ষয়ের স্রষ্টা নন, এক বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সন্তান। তাঁরা যতটা না কালের স্রষ্টা, তাঁরও চেয়ে বেশী কালের কণ্ঠস্বর। ভারতবর্ষে তাঁদের আবির্ভাবে পটভূমিটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য কবি, সাহিত্যিকরা কালের যে স্পন্দন অনুভব করতে পারেন নি, হাংরিরা তা পেরেছিলেন। কিংবা অন্যেরা কালচেতনাকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের পটে স্থাপন করেছিলেন, আত্মজৈবনিক রোম্যান্টিকতায় স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হাংরিরা কলুষিত কালের করালগ্রাসে হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খেয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন হাংরিদের আবির্ভাব কালে ভারত বর্ষের স্বাধীনতার বয়স চৌদ্দ বছর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে মলয় ও শৈলেশ্বরের বয়স আট, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তাঁদের বয়স চার।

প্রদীপ চৌধুরী মন্বন্তরের বছরেই জন্মান। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও তার পুনর্গঠণ কালে ভারতের দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট - আমাদের জীবনে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। জন্ম থেকে নবযৌবন প্রাপ্তির কালে হাংরি তরুণ কবি - লেখকরা ঐ সব অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন, দর্শক ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ ও ভারতীয় নেতাদের স্বার্থপরতা, বিকৃতি; নতুন দেশীয় শাসকদের ব্যর্থতা ও হঠকারিতার অনেক অভিজ্ঞতা-ই তখন তাঁদের তরুণ চোখের সামনে। এ সব অভিজ্ঞতার ছবি ত্রিশের কবিদের মধ্যেও ছিল। বিশেষতঃ, জীবনান্দ দাশ ও সমর সেনের কবিতার মধ্যে। জীবনানন্দ সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আদর্শের মর্মরধ্বনি অনুভব করেছিলেন। সমর সেন ডুবে গিয়েছিলেন তীব্র সিনিসিজমের মধ্যে। হাংরিরা আদর্শকে যেমন পরিত্যাজ্য ভেবেছেন তেমনই সিনিক তিক্ততায় নীরব হয়ে যান নি। তাঁরা চীৎকার ও উল্লাসের কলরোলে মেতেছেন। ইয়েটস, এলিয়ট প্রমুখের যে আধুনিকতার ছায়া ত্রিশের প্রভাবশালী কবিদের নির্ভর ছিল - আধুনিকতার সেই আদর্শকেও হাংরিরা মান্য করেন নি। শৈলেশ্বর লিখেছিলেন, 'আধুনিকতার শবদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্যের নামই হাংরি জেনারেশন। হাংরি সাহিত্য হাংরি আন্দোলন'। ১৮

এটা ঠিক যে, আধুনিকতা একটি ঔপনিবেশিক ধারণা হলেও, আমাদের দেশে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্যায়ে তা জাঁকিয়ে বসেছিল - হাংরিরাই প্রথম তা প্রকাশ্যে, সবলে অস্বীকারের ঘোষণা করেন। তাই হাংরিদের সাহিত্য আদ্যন্ত নাগরিক চেতনা বহন করে না। কখনও কখনও তা গ্রাম্যতারই বাহক হয়ে ওঠে। পরিশীলিত রুচিবোধ ও কৌম সমাজের রীতি নীতি মান্য করার ব্যাপারটি হাংরিদের কাছে সেই জন্য নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যগুলিকে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় -

> আধুনিকতার এই বিরোধিতা কি উত্তর আধুনিকতার দিকে যাত্রা' ? অন্যত্রও (শৈলেশ্বর) বলেন,- কোনো রকম আধুনিকতাকে আমি স্বীকার করিনা। এ সময়ের উত্তর আধুনিকের কলরোলে মনে হয় তবে কি সেই ১৯৬০, -

> এর দশকেই এখানে এসে গিয়েছিল আধুনিকের বিসর্জন, উত্তর আধুনিকের সূচনা। ..... কেন্দ্র না থাকা বাস্তববাদের বিপ্রতীপে যাওয়া - এ রকম সব লক্ষণের মধ্যে ইদানীংয়ের পোষ্ট মডার্নকে যদি কেউ পান, তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় না।১৯

আবার কেন্দ্র না থাকা বাস্তবতার ধরণটি হাংরিরা সমকালের প্রেক্ষাপটে থেকেই যেন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। নবলব্ধ স্বাধীন ভারতের প্রশাসন সিভিল সমাজ ও তার অর্থনীতিও ছিল একটি দিশাহীন নৌকোর মতো। দ্বিখন্ডিত ভারতের ত্রিখন্ডিত চেহারা (ভারত-পশ্চিমপাকিস্তান-পূর্বপাকিস্তান) একটি উপমহাদেশের মত। একই দেশ শরীকী জ্ঞাতির মতো পারস্পরিক কলহে মত্ত। তিনটি স্থানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্বাস্তুর স্রোত। তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পতন, বণিক সমাজের উত্থান, দেশীয় ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান একটি কিম্ভূতকিমাকার সমাজের বিন্যাস ঘটায়। সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মিশ্র অর্থনীতির ঘোষণা করেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে যেমন পাকিস্তানের তেমনই ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গান্ধীবাদী নেহেরুকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠণের সংকল্প ঘোষণা করতে হয়। অথচ দেশীয় পুঁজিপতিরা ধনতন্ত্রই জাঁকিয়ে বসায় ফলতঃ শ্রমিক আন্দোলন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ ভারতে নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠে। আমাদের সরকারের কিছু করার থাকে না।

ইতিমধ্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। তাঁরা প্রথম থেকেই ছিল নেহেরু ও কংগ্রেস বিরোধী। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা অংশ নেয় নি। বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন করে সোভিয়েত রাশিয়ার লবিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। তার নাম দিয়েছিল জনযুদ্ধ। তাঁদের স্বপ্ন ও আদর্শ ছিল মার্কর্সবাদ, শোষিত সর্বহারার মুক্তি। সমাজবাদী সোভিয়েত রাশিয়া তাই কম্যুনিষ্টদের চোখে ধ্রুবতারা। কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিও তাদের সমর্থন। কিন্তু ১৯৫৫ সালে সহসা কম্যুনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব সূচিত হল।

সাধারাণ ভারতবাসী, যাঁরা রাজনীতি সচেতন তাঁরা সবাই এবার বিভ্রান্ত। কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব নিয়ে তাঁদের আশাভঙ্গ আগেই শুরু হয়েছিল। এবার আর্ন্তজাতিক কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব নিয়েও তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হতে শুরু করল। এর উপর ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে বসল। সুতরাং অস্থিরতা, নৈরাশ্য, অনাস্থা ছাড়া ভারত বাসীর সামনে আর রইল না কিছুই। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ যেমন একবাস্তবতা, ১৯৬২ সালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অভ্যুদয়ও তেমনই এক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।

১৯৬৪ সালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভাজন দেখিয়ে দিয়েছিল যে আদর্শগত কারণের চেয়েও নেতৃত্বের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সুবিধাবাদিতা একটি সংগঠন ভেঙে যাওয়ার পিছনে অধিক কার্যকরী। ১৯৬৪ সালে পুলিশী মামলার পর হাংরি জেনারেশন আন্দোলনও ক্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে যে, আদর্শগত কারণে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও একে অন্যকে অতিক্রমের দ্বৈরথ ও অহং-ই একটি সাহিত্যিক জোট ও আন্দোলনকে পূর্ণতা পেতে দেয় না। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার কালে আমাদের দেশে প্রবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মন্দা'র সূচনা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে তিন বছরের অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত কাজ (PLANNING) স্থগিত রাখা হয়। শিল্প ক্ষেত্রে তাই ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়। অনেক কলকারখানা লক আউট ঘোষণা করে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ ফুটপাতে এসে দাঁড়ায়। এর উপর দেখা দেয় খরা। সরকার সঠিক খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে পারে না। ভুল খাদ্যনীতির কারণে সারা দেশে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা যায়। খাদ্যের আন্দোলনে মানুষ নানা জায়গায় পথে আন্দোলনে নেমে পড়ে। বসিরহাটে খাদ্য আন্দোলনে ১২ বছরের বালক নুরুল ইসলাম পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আবার ব্যাপক এই খাদ্যাভাবে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ চলে যায় নগরে, মহানগরে। সেখানে ফুটপাতে তারা আশ্রয় পায়। মোট বওয়া, মাদকের চোরাচালান দেওয়া, মেয়েদের নিষিদ্ধ জগতে পা বাড়ানো কোনো বড় ব্যাপার থাকে না আর। মূল্যবোধ, সুস্থতা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেনীতে একটা স্তরে শূন্যতায় নেমে যায়। আশাবাদ যেন হয়ে ওঠে অলীক অভ্রপুষ্প।মলয় রায় চৌধুরী এই পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে, আদর্শের মৃত্যু প্রকৃতির মৃত্যু ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের মৃত্যু, জ্ঞানের মৃত্যু অর্থাৎ কিছুই আর জীবিত থাকছে না।

সবকিছু শেষ। এই সব কিছু শেষের পটভুমিতেই হাংরিদের আবির্ভাব। সুতরাং মার্কসবাদী বাস্তবতার উজ্জীবনী স্তরটিকে তাঁদের সহিত্যে লক্ষ করা যায় নি। হাংরিরা মূলতঃ সমকালের অস্থিরতা ও নৈরাশ্যের ভয়াবহতাকে ক্রোধ ও যৌনতা দিয়ে আঘাত ও অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। আগুনের তাপ ও ছাই গায়ে মেখে নিয়েছিলেন - আগুনকে নয়, আগুনের ছবিকে নয়। তাই খাদ্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই, জঠরের ক্ষুধার প্রকাশ নেই; আছে যৌন ক্ষুধার। কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা, বিহারে গমকলের শ্রমিকদের ধর্মঘট, গুজরাটে দুধ সমাবায়ের দুর্নীতি এবং ঐ সব ক্ষেত্রে পুলিশী দমনের ছবিগুলি এখানে চিত্রায়িত হয় না। নকশাল বাড়ি আন্দোলন হাংরি সাহিত্যে সত্তর দশকেও ছাপ রেখে যায় না কোনো। উত্তাল গণনাট্যের জোয়ারে এতটুকু প্রভাবিত হন না তাঁরা।

সমকালের বস্তুগত উপাদানগুলি তাঁরা এড়িয়ে যান বা অন্য ভাষায় যৌন ক্রোধে রূপান্তরিত করতে চান। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে তাঁরা একমাত্র প্রতিষ্ঠান ও সৌন্দর্যবোধের আদলটি ছাড়া বুর্জোয়াদের কোনো ক্ষতি পারেন নি। আসলে হাংরিরা ফ্রয়েডকে স্বীকারই করে নিয়েছিলেন। তবে ফ্রয়েডিয় যৌনতার সঙ্গে হাংরিরা মিশিয়েছিলেন সমপরিমানে বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আবার আলবেয়র কাম্যুর আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহবোধও তাঁদের প্রভাবিত করেছে। হয়তো এ কারণেই মলয়ের আন্দোলন নামক মেনিফেষ্টোর শুরুতে কাম্যুর একটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। শিল্প এবং বিদ্রোহ সমার্থবাচক ও মানবীয় অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত - পংক্তিটির মমার্থ এরূপই ছিল। (Art and rebellion will only die with the death of last man on earth - Albert Camus) ।

শৈলেশ্বরও তো বলেছিলেন, কবি শব্দই বিদ্রোহবাচক। ফ্রয়েডের অনুসরণ করে অবদমন থেকে যেমন মানবীয় যৌনতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন হাংরিরা, তেমনই যৌনতার মধ্যে রুক্ষতা ও কদর্যতাকেই প্রত্যেক্ষীভূত করে - বুর্জোয়াদের যৌন ব্যবসাকেও মূল্যহীন করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হাংরিদের যৌনতা প্রণয় সম্ভাষন নয়, রুক্ষ গালিগালাজ মাত্র।

নূতন তারুণ্যে বিশৃঙ্খল ভারতবর্ষে চূড়ান্ত অব্যবস্থা এবং অরাজকতার মধ্যে হাংরিরা ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র দুটি ব্যবস্থা থেকেই দূরত্বে অবস্থান করেছিলেন।

আসলে যে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিবাদীদের একটি বর্গীকরণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রের যেমন স্বস্তি ঘটে না, তেমনই সমাজতাত্ত্বিকরাও নিজেদের দায়িত্বে অসম্পূর্ণ মনে করেন। হাংরিদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছিল। তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েও ছিল। যদিও আন্তর্জাতিক নানা চাল, বিচার ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি জনিত কারণে অভিযুক্ত হাংরি কবি লেখকেরা বেঁচে গিয়েছিলেন। টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্টে ও এর পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজতোত্ত্বিকেরা হাংরি নিয়ে কী ভেবেছেন জানা যায় নি। কবি লেখক, বুদ্ধিজীবীদের পর্যালোচনাগুলোও হাংরিদের বিপক্ষেই গেছে। সেগুলির কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কিছু গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ পাওয়া যাবে। তবে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বিচার করতে গিয়ে বীট জেনারেশন আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠেছে। এ যে একটি সরল বর্গীকরণ তাতে সন্দেহ নেই। 'কৃত্তিবাস' এর সম্পাদক, বীট অ্যালেন গীন্সবার্গের বন্ধু ও হাংরি মামলায় মলয় রায় চৌধুরীর পক্ষে সাক্ষী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও বলেছেন,-

> সেবারে কলকাতার, বারানসীতে ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় প্রায় বছরখানেক কাটিয়ে গিয়েছেন, অ্যালেন ও পিটার .... অ্যালেনের প্রভাব ও বীট জেনারেশনের সুত্র ধরে রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় (অর্থাৎ সমীর ও মলয় রায় চৌধুরী) শুরু করে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন; কিছুদিনের জন্য বাংলা সাহিত্যে তা বেশ হই চই তুলে দিয়েছিল।২০

কবি ও সম্পাদক পবিত্র মুখ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন -

> হাংরিদের থেকে 'কবিপত্রে'র লেখকরা সব সময় দূরত্ব রেখেছেন, কারণ হাংরিদের সমস্যা যৌনতার,

উচ্ছৃঙ্খলতার সবটাই আমেরিকার শ্লাম এরিয়া থেকে উঠে আসা গীনসবার্গ ও অর্লেভস্কির মস্তিস্ক প্রসূত ।২১

দুটি মন্তব্যই চটজলদি করা, হাল্কা মন্তব্য মাত্র। নিজেদের উক্তির সমর্থনে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ তাঁরা দেন নি। পবিত্রের বাক্যে 'সবটাই' শব্দটি লক্ষণীয়। প্রকৃত পক্ষে, গীন্সবার্গ তথা বীটদের হাংরি গোষ্ঠী মলয় ও সুবিমল ছাড়া সুনীল গঙ্গোপ্যাধায় ও কৃত্তিবাস গোষ্ঠীরই যোগাযোগ বেশী ছিল। তাছাড়া বীট জেনারেশনের সঙ্গে হাংরি জেনারেশনকে মেলানোও যায় না। বীটদের আবির্ভাব আমেরিকার এক ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে ঘটেছিল। ঐতিহাসিকের ভাষায় -

As social protest the movements for civil rights, integration and black nationalism. Yet as an expression of individual opposition to social conformity, it drew on a long American tradition from the orean and white man to Paul Bowles and Henry Miller. The leading figure of this movement Williams Burroughs (1914), Jack Kerouc (1922-69) and Allen ginsberg (1926 – 97) appalled by the growing regimentation of American Political and cultural life in the late forties and early fifties and the paranoiac suppression of dissent, viewed them selves as outsiders who found avenness of personal and aesthetic realization in exile, drugs and sexual non- conformity. ২২

শুধু সামাজিক অসন্তোষ নয়, এঁদের মধ্যে ধর্মীয় অন্তর্মুখীনতাও দেখা গিয়েছিল। আমেরিকান ভোগবাদী সমাজের উপসর্গ হিসেবেও বীটদের দেখা হয়েছে। আবদুল হাফিজ লিখেছেন,-

> বীটদের নতুন জীবন পদ্ধতি - অর্থাৎ জাজ সঙ্গীতের উন্মত্ত সুরের প্রতি অত্যাসক্তি, ভবঘুরে বৃত্তির সাথে জৈন, বৌদ্ধ ধর্মের মিলন, অবাধ সহমৈথুন, স্বপ্নালোক সৃষ্টির জন্য রাসায়নিক ঔষধপত্র ও অন্যবিধ নেশাদ্রব্যের ব্যবহার, আবর্জনার মধ্যে বাস করবার উদগ্র আগ্রহ, শরীর ও পোষাকের প্রতি সচেতন অবহেলা - সেদিন থেকেই জনসাধারণের আলোচ্য হয়ে উঠল।২৩

হাংরি কবি লেখকদের মধ্যে বীটদের এই সব দৃষ্টিভঙ্গী বা আচরণ কোনোটাই দেখা যায় নি। বীটরা ছিলেন উন্মত্ত। হাংরিরা অস্থির, বীটরা ছিলেন লোলুপ হাংরিরা সিনিক, বীটরা ছিলেন গৃহত্যাগী, হাংরিরা উদ্বাস্তু। সুতরাং দুটি আন্দোলন পরিকল্পনা এক নয়। আর পরিকল্পনা এক নয় বলে সাহিত্যের প্রতিফলনও আলাদা। ১৯৬২ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি' কাগজে লিখেছিলেন,-

> ওদিকে ও দেশে সামাজিক পরিবেশ অ্যাফ্লুয়েন্ট, ওরা বীট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে কোনো রূপ, কোনো রসই এতে বাদ নেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বীটরা এ্যাংরী দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। ২৪

শক্তি ঠিকই লিখেছিলেন। কারণ আমেরিকান প্রভাব নয়, ভারতবর্ষের জটিল একটি আর্থ সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক বৃত্তে হাংরি জেনারেশনের উৎপত্তি। দেশজ কার্যকারণ থেকে। ইংল্যান্ডের অ্যাংরী ইয়ংমেন আন্দোলনের সঙ্গেও তা তুলনীয় নয়।

অ্যাংরী ইয়ংম্যান আন্দোলন পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতাহ্রাসের প্রেক্ষিকায় জন্ম নিয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্যে শিল্পস্থাপন, শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রয়োগ - একদিকে যেমন শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করল, অন্যদিকে তেমনই ঐ শ্রমিকরা যন্ত্রপ্রভাবে রুক্ষ হয়ে উঠল। পরিশ্রম ও এক ঘেঁয়েমিতে তাদের হতা', ক্রোধ, মনোবৈকল্য দেখা গেল। অথচ বাবু সমাজের চেয়ে তাঁরাই নিয়ামক হয়ে উঠল। M.H. Abrams তাই এ যুগকে বলেছেন, 'an area of greatly in-creased upward mobility of the social classes।' ২৫

পাশাপাশি চার্চের পতন শ্রেণী বিভাজনের বিনষ্টি ধ্বংশ করে দিল মধ্যবিত্ত নৈতিকতা। এই নতুন সামাজিক শ্রেণী চরিত্রটিই ইংরাজী সাহিত্যে অ্যাংরী ইয়ংম্যান মুভমেন্টে প্রতিফলিত হয়েছে। কিংসলি অ্যামিস, জন অসবোর্ন প্রভৃতিদের উপন্যাস, নাটকে এই আন্দোলনের রূপায়ন ঘটে। সুতরাং এঁদের সঙ্গেও হাংরিদের তুলনা করে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। স্পষ্টতই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ভাবকল্পটি ছাড়া অ্যাংরি ইয়ংম্যনদের সঙ্গে হাংরিদের সাদৃশ্য নেই। আসলে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আর্থসামাজিক চালচিত্রটিকে বাদ দিয়ে যাঁরা হাংরি আন্দোলনের বিচার করেছিলেন তাঁরাই এরকম নানা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। আমরা সমকালীন বা অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের লেখক কবিদের উপর হাংরি সাহিত্যের প্রভাবের ইঙ্গিত করেছিলাম।

একইভাবে লক্ষ করা যায়, যে, হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সমকালে পূর্ব পাকিস্তানে 'দি স্যাড জেনারেশন' নামে একটি কাব্য গোষ্ঠীর আর্বিভাব হয়েছিল ।১৯৬৪ সালে তাঁদের ম্যানিফেস্টো বার হয়। হাংরি জেনারেশনের মতই তাঁরা ইংরাজীতে ম্যানিফেস্টো বার করেন। প্রথাবদ্ধ জীবনের বিরোধিতা, নৈতিকতার বিরুদ্ধচারণ, যৌন অতিরেক ও জীবনের অর্থহীনতার বোধ তাঁদের দুঃখিত ও বিপন্ন করে তুলেছিল। রফিক আজাদ, প্রশান্ত ঘোষাল, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছিলেন এই গোষ্ঠীর কবি।

দি স্যাড জেনারেশেনের ম্যানিফেষ্টোতে বীট ও অ্যাংরিদের প্রসঙ্গ থাকলেও আশ্চর্য জনক ভাবে হাংরিদের উল্লেখ নেই। এঁদের একটি ম্যানিফেষ্টো এরূপঃ-

The sad Generation

We don't know what we are doing. We are really undone, really helpless. We are poisoning us consciously. Yet we are helpless and helpless. We are guilty. We are bearing dynamites in our blood. We know it. But we are helpless as simply undone. We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION.

Death is our darling, but not those bloody ladies who are loitering before our eyes. We have no friends. We are not friendly with others. We have a faithful friend – CIGARETTE. We hate conventional life. We cannot tolerate the conventional notions of private and public morality. Life is meaningless, we are leaving meaninglessly. We are constantly living in anxieties. We know the intensity of our anxieties to feel and know that we exist, and that this is the root of all our anxieties.

We are every MOMENT, SWIMMING in the ocean of MENTAL and PHYSICAL agitations for which happiness in foreign to us. I should warn the headless conventional gentlemen and the bloody critics in this connection that we are not sex driven youths. We are faithful to ourselves, and to our SADNESS. There should be no doubt in it.

We are not beatniks or Angries, remember. We are 'bipanna'. And that is why we are 'sad'.

We are, for no time, interested in politics and newspapers. Then, what do we want ? NOTHING, NOTHING – We want nothing from our bloody society.

We are exhausted, annoyed, tired and 'SAD'. - vol. 1, 1964 – written by Rafiq Azad. ২৬।

মলয় রায় চৌধুরী যেমন 'শুভা' নামে এক নারীকে তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে করেছেন, তেমনই প্রশান্ত ঘোষাল স্থাপন করেছেন 'চম্পাবতীকে'। রফিক আজাদের কবিতা এরকমঃ

আলস্যে নেশায় বুঁদ - আমি এক বেশ্যার বেড়াল।
সারারাত শুয়ে থাকি অনাবৃত উষ্ণতম পেটে
বিছিয়ে কোমল থাবা -
রিরংসায় কেঁপে ওঠে নারী।
আমি তার সর্বগ্রাসী উন্মুখর উরুর আস্বাদে।

বগুড়া থেকে 'বিপ্রতীক' রাজশাহী থেকে 'সুনিকেত মল্লার' প্রভৃতি পত্রিকাও একই ধরনের ঘোষণা ও কবিতা ছেপেছে। আব্দুল ময়ীদ তালুকদার 'না' নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে কাজি শাহিদ হাসান লিখেছিলেন,

'সবই তাৎপর্যবিহীন এবং
আনন্দে আনন্দ নাই'।
ব্যথায় আনন্দ নাই

কবিতায় আনন্দ নাই
মদ সিগারেটেও না।

কবির সদর্থকতার প্রতি ঠাট্টাটি এরকম : শালা, আমার আত্মা আমাকে আর পছন্দ করে না। আমি মরে যাব। আমার আত্মার স্থির বিশ্বাস। আমার মধ্যে আমি নাই। হাঁ।

মহাদেব সাহা, ফারুক সিদ্দিকী, শাহনুর খান, সাইদ মোস্তাফা কামাল অনেকেই ষাট ও সত্তরের দশকে এ ধরনের কবিতা লিখেছেন। এঁদের মধ্যে রফিক আজাদ ও মহাদেব সাহা পশ্চিমবঙ্গেও খুব পরিচিত নাম। এঁদের এই ধারার কবিতা আজ তাঁদের পরিচয় জ্ঞাপকও নয়। কিন্তু একটা সময়ে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের ভয়াবহ অসুখে তাঁরা যথেষ্ট আক্রান্ত হয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রভাবেই যে এটা ঘটেছিল এমন অনুমান করা যায়। তবে হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে স্যাড জেনারেশনের একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে, হাংরিদের কবিতায় নারী শরীরের প্রতি লুব্ধতা নয় ঘৃণারই প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু স্যাড জেনারেশন' নারীশরীরের প্রতি লোভাতুর। তাছাড়া রফিকদের কবিতায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ব্যাপারো কি প্রকট নয়। হাংরিদের মধ্যে যদি প্রতিবাদ পাই। তো স্যাড জেনারেশনে পাচ্ছি বড় জোর অসন্তোষ। তাই ওরা বিষন্ন, বিপন্ন বলে নিজেদের অনুভব করেছেন। যেখানে হাংরিরা বিষাদকে ঝেড়ে নৈরাজ্যবাদীর ভুমিকায় অবতীর্ণ। স্যাড জেনারেশনের কবিরা শেষ পর্যন্ত রোম্যান্টিকতারই ফসল, হাংরিরা অ্যান্টি - রোম্যান্টিক।

আসলে, পূর্ব পাকিস্তানের কবিরা তাঁদের কাব্যজীবনের ভাঙা গড়ার প্রথম পর্যায়ে, নবীন বয়সে হাংরি জেনারেশনের প্রভাবে একটা পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন। তারপর ব্যক্তিগত কবিপ্রকৃতি অনুযায়ী অন্য ধারায় চলে গেছেন। যৌবনের উন্মাদনা কেটে গেলে যেমন নিজেদের সংযত করেছেন, তেমনই প্রভাবের চেয়েও স্বাধীন ভাবনা চিন্তাকে আশ্রয়যোগ্য বিবেচনা করেছেন।

কিন্তু তাতেও ঐতিহাসিক ভাবে এ সত্য থেকে গেছে যে, তাঁদের কাব্যনুশীলনের একটা পর্যায়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সক্রিয় ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সংঘটিত হবার পর পরই রাজ্যের রাজনৈতিক চালচিত্রটি বদলাতে শুরু করে। সত্তর দশক শুরুর অব্যবহিত পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। বামপন্থীদের সরকার গঠন প্রক্রিয়া বিপ্লব, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা প্রভৃতি মূল্যমাণকে একটি নতুন ধারণা দেয়।

সত্তর দশকে উত্তাল নকশাল বাড়ি আন্দোলনে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আরেকটি নকশা গড়ে উঠে। এর ফলে, সাহিত্যেও কিছু পরিবর্তন ঘটে। কবিতায় অগ্রজ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক বেশী রাজনৈতিক জিগিরকে নিয়ে আসেন। মণিভূষণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ গুপ্ত প্রভৃতি কবিরা এবং তপোবিজয় ঘোষ, শৈবাল মিত্র প্রভৃতি কথাকারেরা তীব্র বামদর্শনকেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে অমিতাভ গুপ্ত ও শৈবাল মিত্রকে বুর্জোয়া সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য পেতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে 'দেশ,' 'অমৃত,' 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে 'কৃত্তিবাস' প্রায় একাত্মা হয়ে গিয়েছে। কৃত্তিবাসের লেখকরা জনপ্রিয় ও মনোরঞ্জক সাহিত্য সৃষ্টিকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আরেকটি নতুন ধারাও গড়ে উঠছিল। যাঁরা ঠিক বাণিজ্যিক লেখকনন , আবার কেতাবী মার্কসবাদেও আশ্রয়প্রার্থী নন । কথাসাহিত্যে ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কবিতায় জয় গোস্বামী, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, মৃদুল দাশগুপ্ত প্রভৃতিরা এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

এ ভাবে বাংলা সাহিত্যে যেন একাধিক ধারার সহাবস্থানকে মেনে নিল। তাই নতুন করে কোনো আন্দোলন গড়ে উঠবার প্রয়োজনীয়তা রইল না। ভগীরথ বা ঝড়েশ্বরের গল্প, উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের অজ্ঞাত ছবি ফুটে উঠল। আরও পরে, অভিজিৎ সেন, নবারুণ ভট্ট াচার্যেরা তাকেই আরও বাস্তববাদী করে তুললেন। জয়ের কবিতায় হাংরির অস্থিরতা রইল কিন্তু আঙ্গিক ও রসের নান্দনিকতাকে তিনি মান্য করলেন।

পার্থপ্রতিম প্রথমে 'ক্ষুধার্ত' আন্দোলনে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে অনেকখানি পাল্টে নিলেন। এতদসত্ত্বেও হাংরিরা যে শব্দের শুচিবায়ুতা ভেঙ্গে দিলেন। বিষয়ের নিষিদ্ধতা বলে কিছু রাখলেন না - তা বাংলা ভাষায় এক গভীর প্রভাব রেখে গেল। ১৯৬২ সালের পর থেকে বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের কাঠামো ও ভাষা ব্যবহার পাল্টে গেল ।

তথ্য সূত্র ঃ

১. মলয় রায় চৌধুরী, একটি পশ্চিমবঙ্গীয় প্রবলেম্যাটিক : হাংরি আন্দোলন / এবং পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৯৩।

২. মলয় রায় চৌধুরী, কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন/কবিতীর্থ/ গ্রীষ্ম-বর্ষা, ১৪১০, কলকাতা, পৃ: ১৩।

৩. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, হাংরি/বাংলা বই, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, জানুয়ারী, পৃ: ১৫।

৪. সুধীর চক্রবর্তী, গ্রন্থ সমালোচনা, দেশ, ১৬/৯/২০০৪ - পৃ: ৮০।

৫. সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কৃত্তিবাস পঞ্চাশ / কৃত্তিবাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১২৮-১২৯।

৬. শংকর চট্টোপ্যাধ্যায়, (প্রথমত) কৃত্তিবাস সংকলন,প্যাপিরাস, ১৩৯১, পৃ: ১৩৮।

৭. শংকর চট্টোপ্যাধায়, (হত্যাকারী), কৃত্তিবাস সংকলন ২, প্যাপিরাস, ১৩৯১, পৃ: ১৩৮।

৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আমি কীরমক ভাবে বেঁচে আছি / কৃত্তিবাস সংকলন, ২ প্যাপিরাস, ১৩৯১, পৃ: ১১৮।

৯. উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা, ২০০২, পৃ: ৬২।

১০. তদেব, পৃ: ৯৬।

১১. অতীন্দ্রিয় পাঠক, ষাটের দশক ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, জিগীষা, ১৯৮৮, পৃ: ২৭।

১২. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, ধ্বংশকালীন আন্দোলন ও কবিপত্র / জিগীষা পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ: ৩৬।

১৩. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আনন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ১।

১৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রতিবাদের সাহিত্য, ধৃতরাষ্ট্র, শিলিগুড়ি, ১৯৮৪, পৃ: ৯৫।

১৫. দেবেশ রায়, বিলম্বিত সওয়াল, ক্ষুধার্ত পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৭২-৭৩ পৃ: উল্লেখ নেই।

১৬. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ: ৩।

১৭. মলয় রায় চৌধুরী, মৃত্যু মেধী শাস্ত্র .. / প্রকাশক লেখক স্বয়ং, পাটনা, ১৯৬৫, পৃ: ১।

১৮. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৫, পৃ: ৪।

১৯. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, হাংরি / বাংলা বই, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ: ১৫।

২০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেশ পত্রিকা, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৯৭ / কলকাতা, পৃ: ৬৯।

২১. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই কবিপত্র/ অমৃতলোক শারদীয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ২৫৯।

২২. Boris Ford, New Pelican guide to American literature, Pelican, Britain, page 345.

২৩. আবদুল হাফিজ, আধুনিক সাহিত্যচর্চা মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৩৮২, পৃ: ১৩।

২৪. শৈলেশ্বর ঘোষ, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৪, পৃ: ১৪।

২৫. M.B. Abrams, A Glossary of Literary Terms, Macmillan, India, 1985, page -10

২৬. আবদুল হাফিজ , আধুনিক সাহিত্যচর্চা মুক্তধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৩৮২, পৃ: ৬৮ - ৬৯।

উপসংহার

যে কোনো আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্য আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । একদিকে তা কিছু সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিফলন ঘটায়, অন্যদিকে সৃজনশীলতার নানা রূপ ফুটিয়ে তোলে । বিষয় ও আঙ্গিক দু'ক্ষেত্রেই আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য । শুধু তাই নয় , বিগত আন্দোলন গুলির কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও এই নবতর সাহিত্য আত্মস্থ করে নেয় ।ফলে ঐতিহ্যের সঙ্গে নবতর আন্দোলনের একটি গ্রহণ ও বর্জনের টানাপোড়েনের সম্পর্ক থাকে । পৃথিবীর নানা সাহিত্য-আন্দোলন গুলির দিকে তাকালে একথা স্পষ্ট হয় ।

বস্তুত, আন্দোলনের তিনটি স্তর থাকে : (ক) প্রতিবাদ , (খ) সৃজনশীলতার স্তর (গ) ক্ষমতা দখল বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা । রাজনৈতিক , সামাজিক ও সাহিত্য - আন্দোলন তিনটি ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য । যাই হোক , সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন একটি নতুন গতিবেগ , সৃষ্টির - ঐশ্বর্য গড়ে তোলে । তাই পৃথিবীর সব ভাষাই নব নব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শরিক হয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে । বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয় । পৃথিবীর এইসব প্রধান প্রধান সাহিত্য-আন্দোলন গুলির স্বরূপ ও গুরুত্ব আমরা গ্রন্থের প্রথম পর্ব , প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ।

পশ্চিমী দেশগুলিতে বিগত শতাব্দীগুলিতে নানা ধরনের সাহিত্য আন্দোলন আমরা লক্ষ করেছি । ইতালির রেনেশাঁস তো শিল্প সংস্কৃতিতে একটা প্রবল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল । উনিশ শতকের বঙ্গদেশেও নবজাগরণের একটা ধাক্কা লেগেছিল । কিছু সামাজিক আন্দোলন লক্ষ করেছিলাম আমরা । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাতে লাভবান হয়েছে । রামমোহন রায় , ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর , মধুসূদন দত্ত , বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সবাই উনিশ শতকের নবজাগরণের সন্তান ।

কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো সাহিত্য আন্দোলন ঐ সময় বঙ্গদেশে হয়নি । হয়তো বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার গঠনপর্বে তা সম্ভবও ছিলনা । কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভূত ঐশ্বর্য মন্ডিত হয়ে উঠেছে । সাহিত্য - আন্দোলন হয়নি , অথচ আন্দোলন -সম্ভব ফসল উঠেছে ।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে , বাংলা ভাষায় একটা আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরী হয় । ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' পত্রিকাটি প্রকাশ পেলে বাংলা ভাষায় একটি আলোড়ন তৈরী হয় । মুক্ত চেতনা ও যৌবনের গতি ধর্ম প্রতিষ্ঠায় পত্রিকাটি একটি দৃপ্ত ভূমিকা নেয় । চলিত গদ্যকে সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম রূপে একান্তভাবে দেখতে চায় 'সবুজ পত্র' । এর সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী শুধু তারুণ্যের জয়গান নয় , চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তি , যুক্তির প্রতিষ্ঠা , তার্কিকতা ও মননশীলতাকে আধুনিক রুচি ও ভাষার বয়নে উপস্থাপিত করেন ।

'সবুজ পত্রে'র পর ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে । 'সবুজ পত্র' বলেছিল মুক্তির কথা , আর 'কল্লোল' উদ্দামতার প্রকাশ ঘটালো । তাছাড়া , সমকালীন যুগের সংকট 'কল্লোল' পত্রিকায় গাঢ় ছায়া ফেলল । একদিকে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙালী শহীদদের আত্মত্যাগ , অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের করাল প্রভাব 'কল্লোলে'র লেখকদের অস্থির করে তুললো । নৈরাশ্য , হতাশা , ক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠল তাঁদের লেখায় । যুদ্ধ জনিত আর্থিক সংকট , খাদ্যাভাব , নৈতিক অধঃপতন , বেকার সমস্যা , নারীদের বিপথগামিতা 'কল্লোল' এর সাহিত্য ক্ষেত্রের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিল । একদিকে এই বাস্তবতার অভিঘাত অন্যদিকে 'কল্লোল' লেখকদের রোম্যান্টিক মনোভঙ্গী - যে ধরনের কবিতা ও কথা সাহিত্য আমাদের সামনে উপস্থিত করল তা অনেকখানি অভিনব । রবীন্দ্র ঐতিহ্য , এমনকি 'সবুজ পত্রে'র বৈদগ্ধ্য যেন 'কল্লোল' দ্বারা আহত হল । সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে নাড়িয়ে দিল 'কল্লোল' তাই বলা যায় , বাংলা ভাষায় স্পষ্টভাবে 'কল্লোল' - প্রথম সাহিত্যআন্দোলনের বার্তাবহ । আন্দোলনের জন্য যে সংগঠন শক্তি দরকার তা-ও 'কল্লোলে'র ছিল ।

তাঁরা শুধু গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সহিত্য রচনা করেন নি , অন্যান্য পত্রিকা গোষ্ঠীকে ও তাঁদের পত্রিকার ছত্রছায়ায় এনেছিলেন ।

'কল্লোল' - এর পরে 'বুদ্ধদেব বসু'র 'কবিতা' পত্রিকা বাংলা সাহিত্য - আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । তবে সে আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল - কবিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ । তাছাড়া , 'কল্লোল' যেমন গোষ্টীবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা করেছিল , 'কবিতা' তা করেনি । একই ধরনের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠাও লক্ষ ছিল না 'কবিতা'র । প্রধানত কবিতার উপস্থাপণ রীতি কেই একটা নতুন আকার দেবার আন্দোলনে সামিল হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকা ।

এই পত্রিকার মধ্যে একধরনের মননশীল আভিজাত্য ছিল । কবিতার পর বাংলা ভাষাকে সচকিত করে তুলেছিল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার আবির্ভাব । এটি কোনো কোনো দিক থেকে কল্লোল - এর সমধর্মী । বিশেষ করে কল্লোলের - সাহিত্যগত ভবঘুরে ব্যাপারটি কৃত্তিবাসের কবি - গোষ্ঠির ব্যক্তি জীবনের মধ্যে এসে পড়েছিল । এঁরা শুধু মধ্যরাতের কলকাতা নয় । সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহারের কিছু কিছু অঞ্চলে দলবদ্ধভাবে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়তেন । এতে একটা ফল হয়েছিল এই যে , সমস্ত বঙ্গে তাঁরা তাঁদের কবিতাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন । নিয়ন্ত্রণ কলকাতায় থাকলেও মফঃস্বলে এমনকি আসামের বরাক অঞ্চলে 'কৃত্তিবাস' - এর অনুগামী ছড়িয়ে পড়েছিলেন ।

তবে কৃত্তিবাস - আন্দোলন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি । কারন ঐ পত্রিকার কবি - লেখকেরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করেছিলেন । সুতরাং আমরা দেখেছি যে , বিশ শতকেই বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত আন্দোলনগুলির সূচনা হয়েছিল । 'সবুজ পত্র' ১৯১৪ সালে , 'কল্লোল' ১৯২৩ সালে , 'কবিতা' ১৯৩৫ সালে এবং 'কৃত্তিবাস' ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাল পরিধি প্রায় চল্লিশ বছরের । এরপর ১৯৬১ - ৬২ সালে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের আবির্ভাব ।

বলা যায় , পিছনে চল্লিশ বছরের আন্দোলন - ঐতিহ্য নিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অভ্যুদয় । যদিও প্রথম আবির্ভাবেই তীব্র ভাষায় হাংরি আন্দোলনকারীরা শুধু ঐ চল্লিশ বছরের ঐতিহ্য নয় , বাংলা ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্যকেই যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলেন । হাংরি আন্দোলনকারীরা প্রথমেই কোনো সাহিত্য পত্রিকা বার করেন নি । প্রথমে তাঁরা বুলেটিন বার করেছিলেন । সেটাও আবার ইংরেজিতে । পরে অবশ্য বাংলাতেও বুলেটিন তাঁরা ছেপেছিলেন । বস্তুত কোনো একটি বিশেষ পত্রিকা ঘিরেই যে তাঁরা সাহিত্যআন্দোলনটি সংগঠিত করেছিলেন তা-ও নয় । 'এষণা,' 'জেব্রা' , 'উপদ্রুত', 'ফু'ঃ 'উন্মার্গ' - 'জিরাফ' - এ রকম অসংখ্য ক্ষুদ্র পত্রিকা ঘিরে হাংরি কবি লেখকরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন । এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যথাক্রমে মলয় রায় চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষ ।

এই আন্দোলনের কতগুলি বিশিষ্টতা ছিল । যেমন , এঁরাই প্রথম কতগুলি মেনিফেস্টোভিত্তিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন । ছন্দ-কে কবিতা থেকে একেবারে বর্জন করেছিলেন । সাহিত্য চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির সর্বপ্রকার আত্ম-উন্মোচনের কথা বলেছিলেন । বলেছিলেন সবরকমের নিষিদ্ধতার আবরণ খুলে ফেলতে । ধর্ম , রাজনীতি , রাষ্ট্র এমনকি শিল্পরীতিকে ভেঙে ফেলার কথা বলেছিলেন হাংরিরা । মধ্যবিত্ত রুচি ও মূল্যবোধ ভেঙে , সামন্ত ও বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করে আন্তিত্বের গহন অন্ধকার এবং অভিজ্ঞতার রুক্ষ্ম বাস্তবতাকে মেলাতে চেয়েছিলেন তাঁরা । যৌনতাকে রোম্যান্টিক ভাবে না ফুটিয়ে , একটি জৈবিক বাস্তবতা হিসেবে সরাসরি সাহিত্যে তাঁরা তুলে এনেছিলেন । হাংরি কবিলেখকদের ভাষা ছিল নিষিদ্ধ শব্দ , অপশব্দ , গালিগালাজ ও যৌনঅনুষঙ্গ বহুল শব্দরাজী দ্বারা পূর্ণ । রাষ্ট্রবিরোধী কথাবার্তা এবং যৌনতার প্রদূষণের দায়ে হাংরি জেনারেশনের কিছু সদস্যকে ভারতীয় দন্ড বিধির ১২০বি এবং ২৯২ ধারায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল । হাংরি জেনারেশন পত্রিকার ১৬ নং সংখ্যার জন্যই এটা হয়েছিল । যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন , তাঁদের মধ্যে মলয় রায় চৌধুরী , শৈলেশ্বর ঘোষ , সুভাষ ঘোষ , সমীর রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, ইত্যাদি অনেকে ছিলেন ।যদিও শেষ পর্যন্ত মলয় রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধেই মামলা চলতে থাকে ।

উচ্চ আদালতে গিয়ে বেকসুর খালাস পান তিনি । এ সমস্ত আলোচনা বিশদভাবে আমরা আগেই করেছি ।

এই আন্দোলন ষাট-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বিশেষ উত্তেজনা তৈরী করেছিল । কিন্তু সেটাই বড় কথা নয় । হাংরি আন্দোলন খুবই পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের সাহিত্য চর্চার লক্ষ নির্ণয় করেছিল । নিছক স্বতস্ফূর্ত প্রেরণার বশে এঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে আসেন নি । ১৯৬১ - ৬৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৮৭ - ৮৮ সাল পর্যন্ত হাংরিরা উল্লেখ যোগ্য সাহিত্যকীর্তি রচনা করেছিলেন । তবে ঐ সময় কালে তাঁদের মধ্যে কিছু বিভাজনও সৃষ্টি হয়েছিল । বিশেষ করে, মলয় রায় চৌধুরী কিছুদিন সাহিত্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক নিঃসঙ্গতাকে আশ্রয় করেছিলেন। তবু আন্দোলন বিস্তারিত হয়েছে । কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ , উত্তরবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় হাংরি মতাদর্শের অনেক কবি , লেখক আমরা পেয়েছি । এমনকি নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত হাংরি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা লক্ষ করা গেছে । অনেক কম বয়সী কবি , লেখকরা হাংরি মতাদর্শের প্রভাবে নিজেদের তৈরী করে নিয়েছেন । আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁদের কথা আছে ।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আশ্রয় করেছিল প্রধানত কবিতাকে । তবে কথা সাহিত্য, নাটক এবং প্রবন্ধ সাহিত্যও তাঁদের স্পর্শ বঞ্চিত হয় নি । হাংরি কবিতার ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যক্তিরা ছিলেন, মলয় রায় চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, ফাল্গুনী রায় প্রমুখ । গৌন কবিরাও ছিলেন । মলয়ের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হল, শয়তানের মুখ (১৯৬৪), জখম (১৯৬৫) আমার অমীমাংসিত শুভা (১৯৬৫) ইত্যাদি । এই কাব্যগুলিতে ব্যক্তি চৈতন্যের এক প্রবল জ্বালার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় । নিরাবেগ , নিস্প্রেম এই কবিতাবলীতে ক্রোধ , চীৎকার , হতাশা , প্রতিবাদ , ক্ষোভ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আগুনের হল্কার মতো ছড়িয়ে পড়েছে । মানুষের প্রবল যৌন তাড়নাও আমরা এখানে দেখতে পাই । আধুনিক সভ্যতার প্রতি কবির বিদ্বেষ লক্ষণীয় । প্রেম , মৃত্যু , বিচ্ছিন্নতার দৃশ্য ও স্তরগুলির মধ্যে এক আধুনিক যুবমানসকে খুঁজে পাওয়া যায় ।

শৈলেশ্বর ঘোষের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল , জন্মনিয়ন্ত্রন (১৯৬৭) অপরাধীদের প্রতি (১৯৭৪) , দরজা খোলা নদী (১৯৮১) , পূর্ণগ্রাস (১৯৮৫) এবং উৎসব (১৯৮৮) । মলয়ের মতই শৈলেশ্বরের কবিতাও প্রতিবাদ । তবে অস্থিরতার চেয়ে আক্রমন বেশী এবং ঐ আক্রমণ শেষে একধরনের নেতিবাচক দর্শনে আশ্রয় গ্রহণ করে । শৈলেশ্বরের কবিতা একদিকে নাগরিক , অন্যদিকে নৈসর্গিক । একদিকে ধূসর অতীত অন্যদিকে বিবর্ন ভবিষ্যতের মধ্যে শৈলেশ্বরের যাতায়াত । ইতিহাস ও মিথকে শৈলেশ্বর আশ্চর্য কৌশলে হাংরি কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করেন । অন্যভাবে বলা যায় , হাংরি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিলে শৈলেশ্বরের কবিতা মূর্ত এবং বিমূর্তের এক আশ্চর্য আলো আঁধারের জগৎ ।

প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা এক ধরনের বৈপরীত্যের গ্রন্থন । ব্যাক্তির সঙ্গে সময় ও সভ্যতার , কলকাতার যান্ত্রিকতার সঙ্গে সমুদ্র ও পর্বতময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেমের আততির সঙ্গে ঘৃণার এক আশ্চর্য টানা পোড়েন দেখা যায় প্রদিপের কবিতার মধ্যে । তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতায় , যৌন অসুস্থতার চিত্রণে এবং আত্ম জৈবনিক উৎকেন্দ্রিকতার প্রক্ষেপণে হাংরি বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর কবিতার ফুটে উঠেছে । ফাল্গুনী রায় হাংরিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগলভ কবি । তাঁর কবিতার বিষয় , প্রকাশ ভঙ্গী সবচেয়ে উচ্চকিত ও স্পষ্টভাষী । সমাজ ও মানবদেহের ক্লেদকে তিনি এক করে দেখেন । নারী ও মাদক শুধু নয় , ফাল্গুনীর কবিতায় চেতনার কী যেন অনির্দেশ্য এক মত্ততাও বিদ্যমান ।

এভাবে হাংরি কবিতার মধ্যে বিভিন্ন কবি ব্যক্তিত্বের আলাদা আলাদা স্বাদ যেন আমরা অনুভব করি । প্রথাবিরোধী , কিছুটা বা অসামাজিক জীবন যাত্রার ছবি ফুটে উঠতে দেখি । কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাসুদেব দাশগুপ্ত ও সুভাষ ঘোষের মধ্যে সম্পর্ণ ভিন্নমুখী কৌশল লক্ষ করা যায় । সুবিমল আবার অন্য গোত্রের । সাধারণ ভাবে ক্ষুধা , নিঃসঙ্গতা , আতঙ্ক , অনিশ্চয়তা , শৃঙ্খলাহীনতা ও ব্যক্তির নৈরাজ্য এঁদের গল্পের বিষয় ।

তবে প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য তিনজনেরই ভিন্ন । বাসুদেবের গল্পের জগৎ রূপক ও রূপকথার । সুভাষের প্রতীক ও কোলাজ - চিত্রলতা নগরজীবনের মাটি ও আকাশকেই আঁকড়ে ধরে । আর সুবিমল ব্যক্তি জীবনের কতকগুলি অনুভূতির বর্ণনা বিস্তার করেন । মাঝে মঝে ঢাকার উপভাষা সুবিমলের গদ্য বা পদ্যের মাধ্যম হয়ে ওঠে । বাসুদেবের গল্পরস , সুভাষের চিত্ররস আর সুবিমলের বাঙাল রসিকতা হাংরি সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ ।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনে মলয় রায় চৌধুরীর ক্ষুদ্র নাটকগুলি এবং ফাল্গুনী রায়ের ক্ষুদ্র চিত্রনাট্য গুলির উল্লেখ করতে হবে । ইল্লত (১৯৬৩) হিবাকুষা (১৯৬৪), নপুংপং (১৯৬৫) নামে তিনখানি নাটক মলয় লিখেছিলেন। তিনটি নাটকই অ্যাবসার্ডধর্মী । আধুনিক সমাজের ছবি , রাষ্ট্রযন্ত্রের একাধিপত্য , ব্যক্তির অসহায়তা ও প্রতিবাদ ইত্যাদি সব কিছুকেই মলয় এখানে নিজস্ব ভঙ্গী ও ভাষায় তুলে ধরেছেন । এ ছাড়া নারীকে মলয়ের নাটকে যন্ত্র , জন্তু ও মানুষের সংমিশ্রণে গড়া হয়েছে । এই নারী এই কালের নানা অসুখে তাড়িত ।

ফাল্গুনী রায়ের নাটকের মধ্যেও অ্যাবসার্ডিটি প্রধান । উপরন্তু সেখানে আছে নগ্নতা , মাদক দ্রব্য ও মধ্যবিত্ত নরনারীর মানসিকতার ছবি । ফাল্গুনীর নাটক বা চিত্র নাট্যগুলি আবার কাব্যধর্মীও । যীশুখ্রীষ্ট, বাইবেল, গীতা, জা পল সার্ত্র থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা - কী নেই ফাল্গুনীর এইসব রচনায় । সে যাই হোক , মলয় বা ফাল্গুনীর এই রচনা গুলি প্রচলিত গোত্রের নয় এবং কিছু কিছু অংশে যে বেশ আকর্ষণীয় তাতে সন্দেহ নেই । ফাল্গুনী রায়ের নাটক ও চিত্রনাট্যগুলি হল (১) কালো খ্রীষ্ট (১৯৬৭) ; চিত্রনাট্য : (২) অন্তিম জরায়ু (১৯৭২) (৩) মানুষ মানুষী (১৯৬৭) । এভাবে কবিতা , গল্প , নাটক রচনার মাধ্যমে হাংরি লেখকরা একদিকে যেমন সৃজনশীল সাহিত্য রচনার ধারাটিকে সচল রেখেছিলেন , অন্যদিকে তেমনই লিফলেট , প্রবন্ধ পুস্তিকা ছেপে তাঁদের জীবনাদর্শ , সাহিত্যাদর্শকে একটি তাত্ত্বিক মান্যতা দেবার চেষ্টা করেছিলেন । সেই সব রচনায় হাংরি সংগঠকদের , প্রধানত মলয় রায়চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষের গভীর মননশীলতা ও জীবনবোধের পরিচয় মেলে । আমাদের গ্রন্থের প্রথমপর্ব তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সব আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে ।

আজ থেকে প্রায় ৪৪ বছর আগে যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আজও তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি - এর অনুসন্ধান খুবই জরুরি । অথবা আন্দোলন চলাকালীনই বা তার কতটুকু ভূমিকা ছিল - এসব বিচার করা দরকার । লক্ষ করা গেছে যে , সে সময় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন পূর্ববর্তী পত্রিকা 'কৃত্তিবাস', সমকালীন পত্রিকা 'শ্রুতি', 'এই দশক', 'কবিপত্র' প্রভৃতিকেও সংক্রামিত করেছিল । এমনকি বাংলাদেশেও 'sad Generation' নামে একটি ক্ষীণজীবী আন্দোলনের সহায়ক হয়ে উঠেছিল ।

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের কবি , কবিতাপত্রকে যেমন হাংরি জেনারেশন আন্দোলন প্রভাবিত করেছিল , তেমনই সত্তর ও আশির অনেক কবি-ই হাংরিদের অনুসরণ করেছেন । পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ প্রভৃতি নানা জায়গায় হাংরি জেনারেশন সাহিত্য আন্দোলন এক ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে । যদিও হাংরিদের বিট জেনারেশন বা অ্যাংরি ইয়ংমেন মুভমেন্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবু দেখা যায় যে , এই আন্দোলনের বীজ ছিল ভারতবর্ষের একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থসামাজিক পটভূমির বিবিধ কার্যকারণের মধ্যে । এই আন্দোলন ছিল স্বকীয়তায় ভরা। তাই বাংলা ভাষাভাষী নানা অঞ্চলে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন এত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে । আমনকি অনেক প্রতিষ্ঠিত কবিকেও হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অস্থিরতা স্পর্শ করতে পেরেছিল । তাঁদের কবিতায় সেই প্রকাশ মিলেছে ।

আসলে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন , বাংলাভাষায় দু ধরনের প্রভাব রেখে গেছে । একটা হচ্ছে আন্দোলনগত ; অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সাহিত্য করবার জন্য যূথবদ্ধ আন্দোলন । অন্যটা হচ্ছে , সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশ ভঙ্গীগত । যার ফলে সমরেশ বসুর মতো লেখক বাসুদেব দাশগুপ্তের বসন্ত - 'উৎসব' গল্পের সাদৃশ্যে রচনা করেন 'বিবর' উপন্যাস । দুটি কাহিনীর নায়িকার নামই শুধু এক নয় , কাহিনী - প্রায় এক । হাংরিদের প্রভাবেই , বাংলা ভাষায় প্রাকৃত অপশব্দ , যৌনাঙ্গ কেন্দ্রিক শব্দ যেন জল চল হয়ে ওঠে । নবারুণ ভট্টাচার্যের, 'ফ্যাতারু' , 'কাঙাল মালসাট' প্রভৃতি উপন্যাস সে কথাই প্রমাণ করে । সাম্প্রতিক কিছু গ্রুপনাটকেও এসব শব্দের ব্যবহার হতে দেখি ।

মধ্যবিত্ত সংস্কার ভেঙে প্রান্তিক মানুষের যে জীবনযাত্রা ও আচরণকে হাংরিরাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন ফ্যাতারু তো তারই প্রতীক। এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হতে পেরেছেন হাংরিরাই। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয় নেবার প্রয়োজন আজ পর্যন্ত তাঁরা বোধ করেন নি । এটাও তাঁদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক । যৌনতাকে সাধারণত বাণিজ্যকভাবে ব্যবহার করা হয় হাংরিরা কিন্তু তা করেন নি । রাজনীতিকে একটি বিশেষ মতবাদের কর্মকান্ড করে তোলা হয় । সে রকম রাজনীতিকেও হাংরিরা আশ্রয় করেন নি । অথচ নানাবিধ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁরা কথা বলেছেন । অনেক সময় যৌন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ করেছেন তাঁরা । কিন্তু লক্ষে তাঁরা মানবতাবাদী হওয়ায় যৌনতা একটি অস্ত্র হয়ে উঠেছে । হাংরিদের মূল্যায়নে এসবও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশিষ্ট

ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ

১ম সংকলন

১৯৮৭

ক্ষুধার্ত

প্রতিরোধ

বাসুদেব দাশগুপ্ত সুভাষ ঘোষ মলয় রায়চৌধুরী

সুবো আচার্য প্রদীপ চৌধুরী শৈলেশ্বর ঘোষ

আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের একটি পত্রিকা

হাংরি জেনারেশন

আচার্য সুবো চৌধুরী প্রদীপ রায় দেবী
বসাক সুবিমল দাশগুপ্ত বাসুদেব ঘোষ
শৈলেশ্বর বসু উৎপলকুমার চট্টোপাধ্যায়
রামানন্দ রায়চৌধুরী মলয় ঘোষ সুভাষ

বাজেয়াপ্ত ১৬ পাতার হাংরি জেনারেশন পত্রিকা

হাংগ্রি জেনারেশন

[illegible]

কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর [illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রথম হাংরি জেনারেশন (বাংলা) বুলেটিন

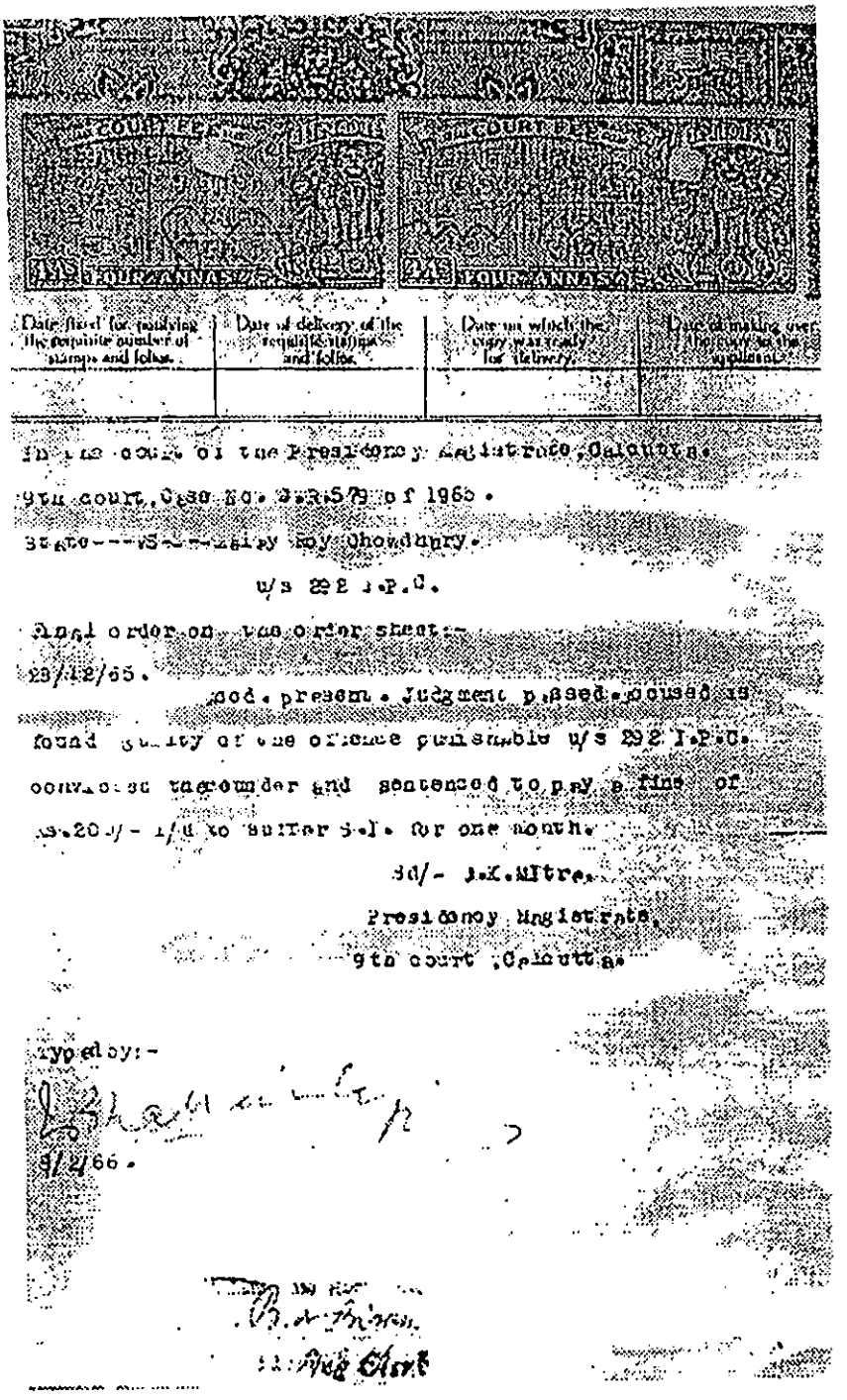

Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.

In the court of the Presidency Magistrate, Calcutta.

9th court, Case No. C.R.579 of 1965.

State --- Vs --- Malay Roy Chowdhury.

u/s 292 I.P.C.

Final order on the order sheet:-

28/12/65.

Accd. present. Judgment passed. Accused is found guilty of the offence punishable u/s 292 I.P.C. convicted thereunder and sentenced to pay a fine of Rs.200/- i/d to suffer S.I. for one month.

Sd/- A.K.Mitra,

Presidency Magistrate,

9th court, Calcutta.

Typed by:-

9/2/66.

Head Clerk

আদালত কর্তৃক মলয় রায়চৌধুরীর দণ্ডাদেশ-পত্র

(Calcutta Note Book) Poet's Pub.

Last Monday was a big day for a score of Calcutta's 'rebel' Poets of the Hungry Generation. It was the birthday of their "Guru and inspirer" Jibanananda Das, with whom, however, they had never come in contact. The celebration was a complete departure from the usual pattern of anniversaries; its organisers planned it so. The venue was not any of the city's cultural sadans but a popular and rambustious Desi (country liquor) Pub in central Calcutta. There was no special invitees. The unseen but pervading spirit of Jibanananda Das was the evening's chief guest.

As soon as the Hungry G'S, as they are affectionately called, occupied a wobbly corner table, the celebration began. It started with minute's memorial silence, which was shattered by the audience's ear splitting cachination. Salieswar Ghosh, a "budding Poet" to his colleagues then followed with a discourse on why this celebration was there "simply because this is the place where Jibanananda was inspired day after day. So we follow suit". The thin bespectacled poet then launched on reading "Janmaniyantran" (Birth control) his latest work dealing with such diverse subjects as creation and culinary art. This time too the audience was unkind. The Poet's voice was drowned in ceaseless din.

Next came another 'Hundry G' Poet who lamented the hardship of his tribe. "We are broke, our work remain unpublished and our comrades are constantly shadowed by Special Branch Men for reasons unknown." Suddenly he erupted, "We damn those poets who think that we can't write. We have freedom. Our mind can think anything." He concluded, "our works will be read by the whole Bengali community one day." Not surprisingly, when the celebration ended, about a dozen bottles and glasses had been shattered.

১৯৬৮-র ২৬শে ফেব্রুয়ারী THE STATESMAN পত্রিকার প্রতিবেদন

India : The Hungry Generation

A thousand years ago, India was the land of Vatsyayana's *Kama Sutra*, the classic volume that so thoroughly detailed the art of love that its translators still usually leave several key words in Sanskrit. Last week, in a land that has become so straitly laced that its movie heroines must burst into song rather than be kissed, five scruffy young poets were hauled into Calcutta's Bankshall Court for publishing works that would have melted even Vatsyayana's pen. The Hungry Generation had arrived.

Born in 1962 with an inspirational assist from visiting U.S. Beatnik Allen Ginsberg, Calcutta's Hungry Generation is a growing band of young Bengalis with tigers in their tanks. Somewhat unoriginally they insist that only in immediate physical pleasure do they find any meaning in life, and they blame modern society for their emptiness. On cheaply printed paper, they pour forth torrent of starkly explicit erotic writings, most of them based on their own exploits ("In The Tajmahal with My Sister") or on dreams. "My theme is me", says Hungry Poet Saileswar Ghose, a school teacher. "I say what I feel, I feel frustration, hunger for love, hunger for food."

Three Widows : To all appearances, their appetites are unlimited. In a short story Bank Clerk Malay Roy Choudhury 25, tells of a starving poet who first devours his finance, then his poetry notebook, then a building and Calcutta's huge Howrah Bridge. A poem by school-teacher Ghose crows that "I impregnated three widows at a time, and now I am lying in bed happy. What next ?"

Absurd as they seem the hungries see themselves as the spokesman of a betrayed miserable people. "Our frustration is not just personal', says a 28 year-old geology lecturer."It comes from the strains, the poverty, the squalor of our society", And in a series of voilent manifestoes, the hungries singled out their enemies, including hypocrites, conventional writers and politicians whose place in society lies "somewhere between the dead body of a harlot and a donkey's tail." To "let loose a creative furore", the hungries last summer sent every-leading Calcutta citizen—from police commissioner to wealthy spinsters—engraved four-letter-worded invitations for a topless bathing suit contest.

Done for world : With that, the entire Calcutta establishment rose up in rage. Newspaper editorials, quoting passages from their works, proved conclusively that they were dangerous and dirty—so much so that Calcutta's reading public began to look for them. Under civic pressure, the police hauled away 6 of the poets for questioning. Five were suspended from their jobs and booked on charges of obscene writing and conspiracy against society.

The evidence got in last week's trial was irrefutable, but meanwhile the Indian government had been approached by sympathetic intellectuals at home and abroad. Looking for a face saving exit, the Calcutta prosecutor temporised, requested a postponement in court. To celebrate their temporary freedom, the hungering beats raided an art gallery, beat up three painters, then walked happily away to resume their pursuit of the Hungry Generation's declared goal—"to undo the done-for world and start afresh from chaos."

১৯৬৪-র ২০শে নভেম্বর TIME পত্রিকার প্রতিবেদন

Howard McCord

NOTE ON THE HUNGRY GENERATION

The Indian cultural establishment has been under attack throughout the sixties by a group of earnest and rowdy poets who call themselves the Hungry Generation. The conflict has been most acrimonious, in Calcutta, traditionally the center of the Indian literary world, but the complacent *littérateurs* of Bombay and New Delhi have been set upon as well. The Indian press believes that the movement's origins can be traced to the 1962 visit of Allen Ginsberg and Peter Orlovsky, the corrupting influence of whom it has reported in outraged and scandalized delight. But however great the effect of the visit of these American poets, and however inspired by foreign writers such as Artaud, Genet, Michaux, Burroughs, Miller, and Céline, the movement is autochthonous and is an indigenous response to the profound dislocations of Indian life, and is built on the strong Bengali avant-garde tradition.

There was little notice of the group in the West until 1963, when *City Lights Journal* No. 1 carried news of them; in 1964 Hungrealist manifestoes appeared in *Kulchur* 15; and *El Corno Emplumado* and *Evergreen Review* printed letters telling of the writers' legal difficulties. For in the autumn of 1964, as many in the US learned from a November issue of *Time*, six poets of the Hungry Generation — Malay Roy Choudhury, Debi Ray, Samir Roy Choudhury, Saileswar Ghose, Subhas Ghose, and Pradip Choudhury — were arrested and charged with conspiring to circulate and distribute an obscene publication in violation of Section 292 of the Indian Penal Code. The publication which had aroused the authorities was a magazine, *Hungry Generation*, and the particularly offending work was 'Prachanda Baidyutik Chhutar,' a poem by Malay Roy Chaudhury which he has translated into English as STARK ELECTRIC JESUS.

At their arrest all were suspended from their jobs, and when I saw them in June 1965, they had been out of work for ten months. After considerable procrastination and maneuvering by the prosecutor, charges were dropped against all but Malay Roy Choudhury later in the summer. On December 28, 1965 he was found guilty by a Calcutta court and sentenced to a fine of 200 Rupees (about $40, or nearly two months' salary for a clerk), or one month's imprisonment. The poem was banned in India and the seized copies were destroyed. Malay Roy Choudhury has never been re-instated in his job, and in the late spring of 1966 was still without work. Life, as

CITY LIGHTS JOURNAL, Number Three (1966)-তে
হাওয়ার্ড ম্যাকোর্ডের হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠা

যুগান্তর ঃ হাংরি-জেনারেশন বা ক্ষুধার্ত প্রজন্ম আখ্যাধারীদের উপর পুলিশী অভিযান শুরু হইয়াছে। তাহারা যে ক্ষুধার ব্যাপারী, তা পেটের ক্ষুধা নয়, তাহার ভৌগলিক সংস্থিতি নাকি অন্যত্র এবং পিশাচসিদ্ধাই কাপালিকদের মতো উক্ত ক্ষুধার সমুদ্র পাড়ি দিয়াই মানুষকে সুধার কিনারে উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া নাকি উচ্চকণ্ঠে তাহারা গদ্যে পদ্যে নতুন দর্শন প্রচার করিতেছে। শুধু প্রচার নয় ইহাদের চলনে বলনেও নাকি এই মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট··· যে দেশে বাৎসায়ন ও কল্যানমল্লের গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া কথিত, গীতগোবিন্দ ধর্মায়তনের ধূপধূনায় সম্মানিত, উড়িষ্যা খজুরাহের শিল্প যে দেশে নিঃসঙ্কোচে রসশৈলীরূপে বিবেচিত আর তন্ত্র-ব্যবস্থিত মোক্ষ সন্ধানের উপায়রূপে বিন্দু সাধনাদি অশেষ মর্যাদায় গৃহীত, সে দেশে এই নাবালকবৃন্দ নূতন কথা এমন কি বলিয়াছে··· **পুরানো ঈশ্বর অদৃষ্ট ও পাপ পূণ্যাশ্রিত জীবন বোধের সঙ্গে বাস্তব লাভালাভ ও জৈব স্বাধিকার মূলক নূতন বিজ্ঞান বোধের যে দ্বন্দ্ব এ কালের মনকে আলোড়িত করিয়াছে তাহারই উৎক্ষিপ্ত ফসল ইহারা** এবং ইহারা কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির মধ্যে হইতে উঠে নাই। সর্বদেশের বিড়ম্বিত চিন্তাসংঘাত ও তিরস্কৃত জীবন যন্ত্রনাই এই শ্রেনীর মূহুত সম্ভোগী পতঙ্গ-দর্শনের অনুপ্রেরনা জোগাইয়াছে। হয়ত নূতন ধ্রুব মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভ্রান্ত যৌবনের পুনর্বসতিই ইহার সত্যকার প্রতিকার।
(সম্পাদকীয় ঃ যে ক্ষুধা জঠরের নয়, ১৯৬৫)

১৯৬৫ সালের হাংরি সাহিত্যিকদের বিষয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয়

Karl E. Zink (Associate Professor of English and departmental Chairman at Indiana University) : SALTED FEATHERS এর বিখ্যাত Hungry সংকলন এর আলোচনা প্রসঙ্গে MAHFIL পত্রিকায় লিখেছেন :— There is entirely too much rant, too much self justification, self pity, self torture, too much cataloguing of suffering and threat of suicide. But for all this one remains downright haunted by the burning society the hysterical, the despair, the fear of and resignation to death , the common conviction that Indian culture is rotten and doomed, the intense dedication to Art. (1967)

Blitz (Erotic lives and loves of 'Hungry Generation') : They held that the highest form of sex should be masturbation, because it is not conditioned by the presence of a second individual and it gives scope to flights of Imagination.

They called themselves 'holy barbarians' holy because they are missionaries rebelling against conformities & inhibition which have come to pass for 'civilization.' They claimed, they are the first Communist of the World. Marx was a product of this civilization and could not get over it. He wanted to bring in class struggle to end in exploitation of man by man and thus to usher in a higher stage of society, poor Marx had limited vision. (1964)

Rajib Saxena (Poetry of alienation) : In recent years voices of protest emerged in those countries (Former colonies of England and America) who dare to speak about their backyard sunder and underworld. **The Hungry Generation group was meanwhile crowned with martyrdom.** In 1964 the stupid Calcutta Police arrested six Calcutta Poets... the event got highlighted by publicity in Time Magazine. But what are these poets upto? The first thing that strikes after reading their incoherent manifestoes is **their complete rejection of the present social order.** They have to heap abuses against it in a most aggressive manner and for this purpose colloquial and the slangs seem to be most handy. **The shocking experiences of the modern reality have to be conveyed in an equally shocking language. That is what looks obscene to the 'cultured' establishment.** (LINK, 1968)

ব্লিৎস (১৯৬৪) ও লিঙ্ক (১৯৬৮) পত্রিকা এবং
কার্ল-ই. জিঙ্কের ১৯৬৭ সালের প্রতিবেদন

কল্লোল যুগের অস্থিরতা যেমন একটা কৃত্রিম ফাঁপানো ভুয়ো ব্যাপার এ যুগের বঙ্গীয় বীট হাংরি জেনারেশনও তাই। বরং তার চেয়েও বেশী। কলকাতার বীট আর হাংরি জেনারেশন এমনই দুটি হুজুগ, পশ্চিমী আন্দোলনের অন্ধ ব্যর্থ অনুকরণ, দাস সুলভ হীনমন্যতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ... জামাকাপড় সাজসজ্জা দাড়ি গোঁফে সে এক অপরূপ রূপবান। তার সঙ্গে মদ, বেশ্যাপল্লী, বস্তি, বিবিধ যৌন অধিকার বিদেশী উত্তরসূরীদেরও টেক্কা দিয়ে চলল। অবশেষে হাংরি বীট দগ্ দগে ঘা হয়ে ফুটে বেরুল গল্পে কবিতায় নিবন্ধে, যাকে এরা মলমূত্রের শামিল বলেই মনে করে যা আসলে মলমূত্রই। (হাংরি জেনারেশনের উৎস সন্ধান, দর্পন, ১৯৬৪)।

জনতা ঃ এদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা নোংরামি দেখে প্রশ্ন জাগে আদৌ 'মানুষ' বলতে যা বুঝায় সে অর্থে ওরা মানুষ কিনা? (কাব্যচর্চ্চার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, ১৯৬৪)।

যুগান্তর ঃ (১৮ জুলাই, ১৯৬৪) ঃ এই কলকাতায় যে তরুণরা "অতিরিক্ত দুঃসাহসের" এবং "অভিভাবক, সমাজ, সাহিত্যিক, শালীনতা এমনকি পুলিশকেও উপেক্ষা করার" আন্দোলন শুরু করেন, নিজেদের তারা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায় নাম দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ নাকি বিশ্বব্যাপী।

সমকালীন দর্পণ, জনতা ও যুগান্তর পত্রিকার প্রতিবেদন

গ্রন্থপঞ্জী

গ্র ন্থ প ঞ্জী

১. গঙ্গোপাধ্যায়,সুনীল, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা,১৯৮০ ।

২ .গোস্বামী,জয়, উন্মাদের পাঠক্রম,প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৮৬।

৩. গুহ,সত্য, একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল,অধুনা, ১৯৭০।

৪. ঘোষ,অরুণেশ, গুহা মানুষের গান,জিরাফ,কোচবিহার, ১৯৮৫।

৫. শব ও সন্ন্যাসী,গল্প কবিতা,কলকাতা, ১৯৮৩

৬. ঘোষ,শঙ্খ, শব্দ আর সত্য,প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৮২।

৭. ঘোষ,শৈলেশ্বর, জন্মনিয়ন্ত্রণ,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৭৪।

৮. অপরাধীদের প্রতি,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ১৯৭৪।

৯. পূর্ণগ্রাস, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ১৯৮৫।

১০. প্রতিবাদের সাহিত্য,ধৃতরাষ্ট্র প্রকাশনী,শিলিগুড়ি, ১৯৮৪

১১. উৎসব ,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৮৮।

১২. দরজা খোলা নদী, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৮৯।

১৩. শ্রেষ্ঠ কবিতা,প্রতিভাস,কলকাতা, ১৯৯৯।

১৪. হাংরি জেনারেশন আন্দোলন,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।কলকাতা, ১৯৯৫।

১৫. ঘোষ,সমীরণ, প্রতিভূমিকা,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।কলকাতা, ১৯৯৫।

১৬. ঘোষ,সমীরণ, রহস্য-বৃষ্টি ,পত্রলেখা,কলকাতা, ১৯৯৬।

১৭. ঘোষ,সুভাষ, আমার চাবি,দন্দশূক প্রকাশনী,চন্দননগর , ১৯৬৫।

১৮. অ্যামবুশ,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৮৩।

১৯. নেশা কলোনী,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৮৩।

২০. গোপালের নয়নতারা,সেমিকোলন,শিলিগুড়ি, ১৯৯৩।

২১. শীর্ষ অভিযান,ক্ষুধার্ত প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৯৭।

২২. চট্টোপাধ্যায়,বঙ্কিম চন্দ্র, রচনাবলী,পাত্রজ পাবলিকেশন,কলকাতা, ১৯৮৬।

২৩. চট্টোপাধ্যায়,সন্দীপন, ক্রীতদাস ক্রীতদাসী,কলামন্দির,কলকাতা, ১৯৭১ ।

২৪. চৌধুরী,প্রদীপ, ৬৪ ভূতের খেয়া,বুকস অ্যান্ড বুকস,কলকাতা, ১৯৭১।

২৫. কালো গর্ত,স্বকাল ফুঃ কলকাতা, ১৯৮৩।

২৬. রচনাবলী(১),প্রকাশক কবি স্বয়ং,কলকতা, ১৯৯৯।

২৭. রচনাবলী(২),প্রকাশক কবি স্বয়ং,কলকাতা,২০০।

২৮ .চৌধুরী, সমীর, হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন,
কথা ও কাহিনী,কলকাতা,২০০০।

২৯. ঠাকুর ,রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী,প.ব.সরকার, ১৯৮০।

৩০. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প.ব.সরকার, ১৯৮৭।

৩১. ত্রিপাঠী,দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৩৮৪।

৩২.দত্ত,অরূপ, জেব্রা রাত,চিদাত্মা প্রকাশনী,ত্রিপুরা, ১৯৮৯।

৩৩. আমি নদী ভালোবাসি, চিদাত্মা প্রকাশনী,ত্রিপুরা, ১৯৯১।

৩৪.দত্ত,কল্যাণ, আমার কমিউনিষ্ট জীবন,পার্ল পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০০।

৩৫. দত্ত,রজনীপাম, আজিকার ভারত,ন্যাশনানাল বুক এজেন্সি,কলকাতা। ১৯৮০।

৩৬.দাস,উত্তম, হাংরি,শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন,মহাদিগন্ত,২০০২।

৩৭.দাস,জীবতোষ, জন্মবৃত্তান্ত ছায়াছবি,রোবট,কোচবিহার, ১৯৮৩।

৩৮.দাশগুপ্ত,অলোকরঞ্জন ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আধুনিক কবিতার ইতিহাস,প্রকাশ ভবন,কলকাতা। ১৯৬০।

৩৯.তদেব, ভিন্ন সংস্করণ,(ভারত বুক এজেন্সি), ১৯৮৩

৪০.তদেব , নব সংস্করণ,২০০৩।

৪১.দাশগুপ্ত,বাসুদেব, রন্ধনশালা,বিদ্যোৎসাহী প্রকাশ,কলকতা, ১৯৮৩।

৪২.বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,৫ম খন্ড,মডার্ণ বুক এজেন্সি,কলকাতা, ১৯৮৫।

৪৩. তদেব বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,৬ষ্ঠ খন্ড ১ম পর্ব,মডার্ণ বুক এজেন্সি,কলকাতা, ১৯৮৯

৪৪. তদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য,মডার্ণ বুক , এজেন্সি,কলকাতা, ১৯৬৩

৪৫.বন্দ্যোপাধ্যায়,মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা,প্রকাশ ভবন,কলকাতা, ১৩৮৩।

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়,মানিক, লেখকের কথা,নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা,১৯৫৭।

৪৭.বন্দ্যোপাধ্যায়,শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,মডার্ণ বুক এজেন্সি,কলকাতা,১৩৬৯।

৪৮.বন্দ্যোপাধ্যায়,সরোজ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা,১৯।

৪৯.বসাক,সুবিমল, হাবিজাবি,জেব্রা বুকস,কলকাতা,১৯৭০।

৫০. বসাক,সুবিমল, গেরিলা আক্রোশ,জেব্রা বুকস,কলকাতা,১৯৭৪।

৫১.বসাক,সুবিমল, আত্মার শান্তি দু 'মিনিট,জেব্রা বুকস,কলকাতা,১৯৮৫।

৫২. বসাক,সুবিমল, বকবকানি,সুমেরীয়,কলকাতা,২০০ ৫৩.বসু,দেব কুমার, কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য,ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স,কলকাতা,১৩৮৭।

৫৪.বসু,বুদ্ধদেব, আধুনিক বাংলা কবিতা,এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স,কলকাতা,১৯৮০।

৫৫.ভট্টাচার্য,দেবীপদ, উপন্যাসের কথা,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা,২০০৩।

৫৬.ভট্টাচার্য,নবারুণ, কাঙাল মালসাট,সপ্তর্ষি প্রকাশন,কলকাতা,২০০৬।

৫৭.ভট্টাচার্য,মণিভূষণ, নির্বাচিত কবিতা,কথাশিল্প,কলকাতা,১৯৮১।

৫৮. মজুমদার,উজ্জ্বল কুমার, সাহিত্যের রূপরীতি,প.ব.রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

৫৯.মিত্র,অরুণ, আরাগঁ,প্রমা প্রকাশনী,কলকাতা, ১৯৯১।

৬০.মুখোপাধ্যায়,তরুণ, বুদ্ধদেব বসু:মননে অন্বেষণে,পুস্তক বিপণি,কলকাতা, ১৯৮৮।

৬১. মুখোপাধ্যায়,পবিত্র, ইবলিশের আত্মদর্শন,তিন সঙ্গী,কলকাতা , ১৯৮০।

৬২. আগুনের বাসিন্দা,কবিপত্র, ১৯৬৭।

৬৩ .মুস্তাফা,সেলিম, ছোরার বদলে একদিন,ক্ষুধার্ত স্বকাল, ১৯৮৪।

৬৪ রায়,দেবী, নির্ব্বাচিত কবিতা,দীপ প্রকাশন,কলকাতা, ১৯৯৮।

৬৫. ভ্রুকুটির বিরুদ্ধে একা,মহাদিগন্ত,কলকাতা,প্রকাশকাল , দেওয়া নেই।

৬৬.রায়।ফাল্গুনী, নষ্ট আত্মার টেলিভিশান,হাংরি জেনারেশন,কলকাতা, ১৯৭৩।

৬৭. আমি অপদার্থ,গ্রাফিত্তি,কলকাতা, ১৯৯৬।

৬৮. আমার রাইফেল,আমার বাইবেল,মনচাষা,আলিপুরদুয়ার,২০০২।

৬৯.রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কথাসাহিত্য,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৯৮৬।

৭০.রায়চৌধুরী,মলয়, শয়তানের মুখ,প্রকা:,সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,কল: ১৯৬৪

৭১. মৃত্যুমেধী শাস্ত্র ওরফে আমার জেনারেশনের

৭২. কাব্যদর্শন,প্রকাশক,লেখক নিজে,পাটনা ১৯৬৫।

৭২. আমার অমীমাংসিত শুভা,প্রকাশক,কবি নিজে,পাটনা, ১৩৭১।

৭৩. ছত্রখান,(২য় সং)কবিতীর্থ,কলকাতা, ১৯৯৫।

৭৪. জখম(২য় সং),কবিতীর্থ,কলকাতা, ১৯৯৮।

৭৫. ইস্তাহার সংকলন,মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা,কলকাতা, ১৯৮৫।

৭৬. হাংরি কিংবদন্তী,পরিবেশক,দে বুক স্টোর,কলকাতা, ১৯৯৪।

৭৭. ত্রিস্তান জারার কবিতা,কালিমাটি প্রকাশনী,জামসেদপুর, ১৯৯৪।

৭৮. মেধার বাতানূকুল ঘুঙুর,মহাদিগন্ত,কলকাতা, ১৯৮৭।

৭৯. হাংরি সাক্ষাৎকারমালা,মহাদিগন্ত,কলকাতা, ১৯৮৭।

৮০. নাটক সমগ্র,কবিতীর্থ,কলকাতা, ১৪০৫।

৮১.সান্যাল ,হিরণ কুমার পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্রণ,প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৭৮।

৮২.সিংহ রায়,জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৯৭৩।

৮৩.সেন,সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,৩য় খন্ড,ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৯৭৩।

৮৪.সেন,সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড,ইষ্টার্ণপাবলিশার্স,কলকাতা, ১৯৭৬।

৮৫.সেনগুপ্ত,অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ,ডি.এম.লাইব্রেরি, ১৩৫৮।

৮৬.সেনগুপ্ত,অমলেন্দু, জোয়ারভাঁটায় ষাট সত্তর,পার্ল পাবলিশার্স,কলকাতা, ১৯৯৯।

৮৭.সেনগুপ্ত,সত্যপ্রসাদ, ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,নিউ বেঙ্গল প্রেস,কলকাতা, ১৯৭৪।

৮৮.হাফিজ,আব্দুল, আধুনিক সাহিত্য চর্চা,মুক্তধারা ,বাংলা দেশ, ১৩৮২।

ENGLISH

৮৯. Abrams,M.H(ed.), Modern Essays in Criticism, Galaxy Book, New York, 1960

৯০.Abrams , M.H, A glossary of literary Terms , Macmillan ,NewDelhi,1985.

৯১.Becket , Samuel ,	.Waiting for Godot , O.U.P, NewDelhi,1989.
৯২.Esslin, Martin,	The Theatre of The Absurd, Pelican Books, London, 1968
৯৩.Esslin, Martin,	Absurd Drama, Penguin Books, London, 1980
৯৪.Ford, Boris,	New' Pelican guide to American literature, Pelican, Britain, 1983
৯৫.Haithcox, John Patrik,	Communism and Nationalism in India, O.U.P, India, 1971
৯৬.Honour, Hugh,	New classicism, Penguin Books, Britain, 1981
৯৭.Jones, Peter,	American Poets, Pan Books, London, 1979
৯৮.Kenner, Hugh,	A reader's guide to Samuel Beket, Thames and Hudson, 1973

৯৯.Kerouac, Jack,	On the Road, Penguin, England, 1972
১০০.Kerouac, Jack,	The Dharma Bums, Penguin, England 2000
১০১.Nicoll, Allardyce,	The Theory of Drama, Doaba trust, London, 1974
১০২.Osborne, John,	Look back in Anger, O.U.P, India, 1999
১০৩.Richardson, Joanna,	Baudelaire, Penguin, Britain, 1980
১০৪.Taylor, John Russell,	Anger and After, Penguin Books, Britain, 1963
১০৫.Trivedi, R. D,	A compendious History of English literature, Vani Educational Books, Delhi, 1983

পত্রপত্রিকা

১. অমৃতলোক৯৯	সম্পাদক	সমীরণ মজুমদার ।
২. আবহকাল-২০০২	।।	রতন বিশ্বাস ।
৩. আস্পর্ধা-২০০০	।।	সোমা ভট্টাচার্য ।
৪. উদ্বাস্তু-১৯৯৯	।।	অশেষ রায় ।
৫. উপদ্রুত-১৯৬৩	।।	পবিত্র বল্লভ ।
৬. এই সহস্রধারা-১৯৯৫	।।	শংকর রায় ।
৭. এই সহস্রধারা-১৯৯৮	।।	তদেব ।
৮. এবং (শারদীয়া ১৯৯১)	।।	ধূর্জটি চন্দ ।
৯. কবিতীর্থ ৫৭ (১৪১০)	।।	উৎপল ভট্টাচার্য ।
১০. কবিতীর্থ অক্টোবর-১৯৯৬	।।	তদেব ।
১১. কবিপত্র অক্টোবর-১৯৮৭	।।	পবিত্র মুখোপাধ্যায় ।

১২. কৃত্তিবাস সংকলন-১ ।। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্যাপিরাস, ১৩৯১।

১৩. কৃত্তিবাস সংকলন-২ ।। তদেব, প্যাপিরাস, ১৩৯২।

১৪. কৃত্তিবাস সুবর্ন জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ২০০৩ - উৎপল কুমার বসু /সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ।

১৫. ক্ষুধার্ত ১ (১৩৭৬) সম্পাদক বাসুদেব দাশগুপ্ত ।

১৬. ক্ষুধার্ত ২ (১৯৭২-৭৩) ।। সুভাষ ঘোষ ।

১৭. ক্ষুধার্ত ৩ (১৯৭৫) ।। প্রদীপ চৌধুরী ।

১৮. ক্ষুধার্ত ৪ (১৯৭৭) ।। শৈলেশ্বর ঘোষ ।

১৯. ক্ষুধার্ত ৫ (১৯৭৮) ।। তদেব ।

২০. ক্ষুধার্ত ৬ (১৯৮১) ।। তদেব ।

২১. ক্ষুধার্ত ৭ (১৯৮৪) ।। তদেব ।

২২. জিগীষা-১৯৮৮ সম্পাদক রাণা চট্টোপাধ্যায় ।

২৩. জিজ্ঞাসা সংকলন ।। শিবনারায়ন রায়,
প্যাপিরাস, ১৯৯২।

২৪. জিরাফ ৬ (১৯৭৪) ।। অরুণেশ ঘোষ ।

২৫. জিরাফ ৭ (১৯৮৫) ।। তদেব ।

২৬. জেব্রা ১ (১৩৭২) ।। মলয় রায়চৌধুরী ।

২৭. জেব্রা ২ (১৩৭৪) ।। তদেব ।

২৮. দন্দশূক ৮ (১৯৮১) ।। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯. দন্দশূক (১৯৮৭) ।। তদেব ।

৩০. দেশ (৩/২/২০০১) ।। সাগরময় ঘোষ

৩১. বর্ণ পরিচয়-১৯৮৬ ।। ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়।

৩২. বাংলা বই-১৯৯১ ।। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা
আকাদেমি ।

৩৩. বিজ্ঞাপন পর্ব অক্টোবর-৮৬ ।। রবিন ঘোষ ।

৩৪. বিজ্ঞাপন পর্ব জুন-৮৭ ।। তদেব ।

৩৫. সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ ১ বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,২০০১।

৩৬. সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ ২ তদেব,২০০২ ।

৩৭. সৃজন-১৯৯৮, সম্পাদক সুমিতেশ ঘোষ,/ মানস দে ।

৩৮. স্বকাল ফুঃ ১৯৮৫ ।। প্রদীপ চৌধুরী ।

৩৯. স্বকাল ফুঃ ১৯৯৭ ।। তদেব ।

৪০. স্বকাল ফুঃ ২০০০ ।। তদেব ।

৪১. হাওয়া ৪৯ (১৪০৮)/ মলয় রায় চৌধুরী সংখ্যা মুর্শিদ এ. এম. সম্পাদিত

৪২. Hungry Generation - Buletin - 4 - 1962

৪৩. City lights Journal - No Three - San Francisco - 1966

NBU, DARJEELING

LIBRARY NBU, DARJEELING